

বৈশাখ, ১৩৩২

দ্বিতীয় খণ্ড | দ্বাদশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

বেদ ও বিজ্ঞান

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

বেদ ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথা বলিয়াছি, আরও দুই-একটা কথা বলিব। প্রথমেই প্রশ্ন এই, দক্ষ প্রজাপতি কে? 'দক্ষ্' ধাতুর মানে বাড়া। বীজ বাড়িয়া যখন গাছ হইতেছে, ভ্রূণ বাড়িয়া যখন জীবদেহ হইতেছে, তখন এই 'দক্ষ্' ধাতুর দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই। সৃষ্টির বেলায় কিরূপ হইবে? সৃষ্টির গোড়ায় যে অখণ্ড বস্তুটি, তাঁহাকে আমরা অদিতি বলিয়া ডাকিয়াছি, কিন্তু তিনি অব্যক্ত। তাঁহাকে বুঝিতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হারি মানেন। সেই অব্যক্ত বস্তুটি ক্রমে ব্যক্ত হইতেছেন,—সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহাই বৈদিক রহস্য। সেই অব্যক্ত বস্তুটিকে যেমন অদিতি বলিয়া ডাকা হইয়াছে, তেমনি আবার তাঁহাকে 'অসৎ', 'রাত্রি' 'বিশ্বব্যাপী জলরাশি' ইত্যাকার নানা প্রতীকের সাহায্যে আমাদের আভাসে চিনাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহারই যে ক্রমশঃ জগৎ রূপে বিকাশ বা বিজ্ঞান, তাহাই হইল দক্ষ প্রজাপতির সৃষ্টি, অথবা সৃষ্টি যজ্ঞ। মূল অব্যক্ত বস্তুটিকে সাংখ্যের প্রধান বা প্রকৃতির মত জড় এবং পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র ভাবিবেন না। যে দেখিতেছে এবং যাহা দেখিতেছে—দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এই দুইটাকে আলাদা করিয়া সরাইয়া লইয়া সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি। এই হিসাবে চেতন ও জড়ের লক্ষণ আর এক দিন বুঝিয়া লইয়াছিলাম কিন্তু অনুভবে (Experienceএ) দ্রষ্টা ও দৃশ্য ঠিক আলাদা নয়। গোড়ায় যে অনুভব হয় তাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ ভাবে জড়িত থাকে। পরে ছুরি চালাইয়া, বিশ্লেষণ করিয়া, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (Subject ও Object) কে আলাদা করিয়া লইতে হয়। আপনারা নিজে নিজে লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, এমন ধারা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ছুরি আমরা প্রায়ই চালাই না। যখন একখানা মেঘের দিকে চাহিয়া আছি, তখন আমার অন্তঃকরণ ঐ মেঘের আকারেই আকারিত হইয়া থাকে। খানিকক্ষণ পরে হয় ত সুপ্তোত্থিতের মত

ভাবি—আমি মেঘমালা দেখিতেছিলাম। কি দেখিতেছ? —এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমায় অবশ্য জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে তফাৎ করিয়াই বলিতে হয়। বলিতে গেলে তফাৎ করিয়া বলিতে হয়, বুঝিতে গেলেও তফাৎ করিয়া দেখিতে হয়; কিন্তু গোড়ায় অনুভবে তাহারা তফাৎ থাকে না। গোড়ায় যে অব্যক্ত, অনির্ব্বচনীয় একটা অনুভব হয়, সেইটাকে ইংরাজিতে বলে Intuition। আমি আমার দার্শনিক লেখাগুলিতে ইহার নামকরণ করিয়াছি Fact। এই Fact is logical, অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয়। ইহাকে ভাবিতে বুঝিতে বলিতে গেলেই কাটিয়া ছাঁটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া লইতে হয়। Fact অদিতি, তাঁহাকে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ইত্যাদি রূপে কাটিয়া দিতিকে পাইতে হয়। ঠিক ফ্যাক্‌ট লইয়া অনুভব চলে, কারবার চলে না, কথা-বার্ত্তা কওয়া চলে না। ফ্যাক্‌টকে কাটিয়া যে সমস্ত টুক্‌রায় আমরা ভাগ করি, সে গুলির নাম আমি দিয়াছি Fact-sections। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, পুরুষ ও প্রকৃতি এইরূপ ফ্যাক্‌ট-সেক্‌সন্‌স—তত্ত্বের ভগ্নাংশ, পূরা তত্ত্ব নহে। পূরা তত্ত্ব যেটি সেটি অনুভবমাত্র, সেটা খণ্ডহীন হইলেই তাহা অদিতি। এই গোড়াকার অনির্ব্বচনীয় অনুভবের বিশ্লেষণ নানা ভাবে হইয়া থাকে। এক রকম দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় (Subject and Object) এই ভাবে। আর এক রকম হইতেছে চিৎ ও শক্তি, এই ভাবে। একটা শক্তি জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে, আর এক চৈতন্য সেই শক্তির খেলাটিকে প্রকাশ করিতেছেন। একজন নৃত্য করিতেছেন, আর একজন তাঁহাকে বুকে ধারণ করিয়া আছেন এবং প্রকাশ করিতেছেন। যিনি প্রকাশ করিতেছেন ও ধারণ করিতেছেন তিনি চিৎ—তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে শুভ্র কলেবর চিৎ করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া শক্তিস্বরূপিণী কালীকে বুকে ধরিয়া রাখিয়াছেন। শিব হইতেছেন চিৎ, প্রকাশক, কাজেই কর্পূরকুন্দেন্দুধবল; নিষ্ক্রিয়, কাজেই শববৎ। কালী শক্তিরূপা, কাজেই চিরচঞ্চলা, নৃত্যোল্লাসবিহ্বলা। শক্তির স্বরূপ অনির্ব্বাচ্য—চৈতন্যের মত ইহা প্রকাশরূপ নহে—কাজেই কালী মহা-মেঘপ্রভা ঘোরা। গোড়াকার মূল তত্ত্বটার এই এক অপরূপ বিশ্লেষণ। বেদান্ত এই মূল তত্ত্বটারই আর এক রকম বিশ্লেষণ করিয়াছেন। একজন পরমেশ্বর, অপরজন মায়া। তন্ত্র ও বেদান্ত কিন্তু একেবারে আলাদা করিয়া ফেলেন নাই। একেরই যে দুইটা দিক্, তাহা ঐ ভাব-বিশ্লেষণের মধ্যে স্পষ্টতই আমরা দেখিতে পাই। আর বেশি দূর ঢুকিয়া পড়ার দরকার নাই,—এইবার দক্ষ-প্রজাপতি কে, তাহা আমরা চিনিতে পারিলাম কি?

যে মূল অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বটিকে আমরা অদিতি বলিয়াছি, তাহারই গর্ভে শিব-শক্তি, পুরুষ-প্রকৃতি, ঈশ্বর-মায়া—এবং-বিধ সকল দ্বৈতই নিহিত রহিয়াছে, এবং সেই গর্ভ হইতেই সকল দ্বৈত প্রসূত হইতেছে, এ কথাটা আমরা আমাদের সাধারণ অনুভবের সাহায্যেই বুঝিবার চেষ্টা করিলাম। বোধ হয় চেষ্টা একবারে নিষ্ফল হয় নাই। এতক্ষণ পরে আবার একবার পূর্ব্বোদ্ধৃত সেই ঋক্‌টি শুনুন—"ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তাহার গর্ভধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তাহা হইতে দেবতাদিগের একমাত্র প্রাণস্বরূপ যিনি, তিনি আবির্ভূত হইলেন। সেই বিশ্বভুবনব্যাপী ভূরি পরিমাণ জলই গোড়া-কার অব্যক্ত অনুভব অথবা অদিতি। সেই আদিম অনুভবের মধ্যে "আমি"টাকে প্রথমে উদ্ধার করিয়া লইলাম। ধরুন, তদ্‌গত চিত্তে ঐ নিমাই সন্ন্যাসের ছবি-খানা দেখিতেছি। খানিকক্ষণ হয় ত ঐ ছবিটার মধ্যেই আত্মহারা হইয়া ডুবিয়া থাকি। ইহাই অব্যক্ত গোড়াকার অনুভব। তার পর মনে হয়—ওহো, আমি যে দেখি-তেছি। "আমি"র কথা মনে জাগিল। অদিতির গর্ভে ইনিই প্রথম প্রসব। বেদ ইঁহাকে বলিতেছেন অগ্নি। সাটে বলিতেছেন জলের গর্ভে অগ্নির উদ্ভব হইল। তার পর? তার পর "আমি" হয় ত ভাবিলেন—ঐ ছবিখানা সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহা ত আমারই জ্ঞান। "আমি" একটা বৃত্তি বা প্রত্যয় বিশেষে অধ্যাস করিলেন। ঐ ছবির দৃষ্টান্তে জগতের ব্যাপারটাও বুঝিয়া লউন। গোড়ায় একটা অনির্ব্বচনীয় অনুভব। ইহা অদিতি। তার পর ইহার মধ্য হইতে একটা "আমি"র জ্ঞান ফুটিয়া উঠিল। তার পর সেই "আমি" ভাবিলেন, এ অনুভব যে আমারই অনুভব, এ জগৎ যে আমারই জগৎ। বিশ্বের উদয়ে "আমি"র এই প্রকার যে অভি-নিবেশ বা অধ্যাস, তাহা হইল ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরপদবী। ইহাই বেদের প্রাজাপত্য। প্রজাপতি দক্ষ তাই অদিতির

গর্ভে জন্মিয়া, তাঁহাকে আবার কন্যারূপে পাইলেন। কন্যারূপে কেন? জগতের মূল উপাদানটি হইতে "আমি", অর্থাৎ দক্ষ, জন্মিয়া ভাবিলেন, এ উপাদানটি আমাদেরই, আমাকে ইহা লইয়া ভাঙ্গিতে গড়িতে হইবে। ইহাই হইল দক্ষের ঈক্ষণ—তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়। তার পর তিনি ঈক্ষণ পূর্ব্বক তেজ সৃষ্টি করিলেন; তার পর অপ্, ইত্যাদি। এই ঈক্ষণের ফলে জগতের মূল বস্তুটি তাঁহারই যেন গড়িয়া-পিটিয়া লওয়ার বস্তু হইল। অর্থাৎ অদিতি তাঁহার কন্যা হইলেন। গোড়ায় অদিতির যা মানে, পরে কিন্তু ঠিক সেই মানে লইলে চলিবে না। গোড়ায় অদিতি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, পরে তিনি যেন হইলেন মায়া বা প্রকৃতি। আরও পরে হয় ত আকাশ ও ঈথার হইলেন। সত্য সত্যই আগে পরে মনে করিবার অধিকার আমাদের আছে কি না, জানি না; তবে সৃষ্টি মানিতে গেলে, এবং সেটাকে বুঝিতে গেলে, আমাদিগকে 'আগে, পরে' এই ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতে হয়। একটা বৈদিক হেঁয়ালির সমাধানের চেষ্টা ত আমরা করিলাম। পুরাণে, তন্ত্রে এই রকম অনেক সব হেঁয়ালি আছে। প্রথমটা তাহা নিতান্তই আজগবি বলিয়াই মনে হয়। শিব শুইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার নাভি হইতে একটা কমল নির্গত হইয়াছে; সেই কমলে বসিয়া শ্যামা শিশু-রূপী শিবকে স্তন্যপান করাইতেছেন। আদিম জলরাশির মধ্যে এক অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডের মধ্য হইতে হিরণ্যগর্ভ প্রাদুর্ভূত হইয়া তাহাকে দুই ভাগ করিয়া ফেলিলেন; উপরে হইল দ্যুলোক, নীচে হইল ভূলোক, মাঝখানে অন্তরীক্ষ। এ ডিম্বকে আপনারা হয়ত অনেকে অণ্ড-ডিম্বই ভাবিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এ জাতীয় কথা-বার্ত্তাগুলি সাঙ্কেতিক (symbolic)। অদিতি ও দক্ষের যে উপাখ্যান আমি আজ আপনাদের শুনাইলাম, তাঁর পর, আশা করি, আপনারা এই সমস্ত তান্ত্রিক ও পৌরাণিক রহস্যগুলিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে হঠকারিতা প্রকাশ করিবেন না। তন্ত্র ও পুরাণের কথা থাকুক, বেদের মধ্যে অনেক স্থলেই হেঁয়ালির ভাষায় কথাবার্ত্তা কহা হইয়াছে। ইহা যেন—"যেবা পার বুঝহ সন্ধান"। কোন কোন স্থলে হেঁয়ালির মর্ম্ম বুঝিতে বেশি বেগ পাইতে হয় না; আবার অনেক স্থলে বুঝিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিতে হয়—আজিকে যেমন। ১।৯৫।৪ বলিতেছেন—"অন্তর্নিহিত অগ্নিকে তোমাদের মধ্যে কে জানে? সে অগ্নি-পুত্র হইয়াও হব্য দ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে জন্মদান করেন। মহৎ অগ্নি জলের গর্ভ স্বরূপ, এবং সমুদ্র হইতে, নির্গত হয়েন। "ক ইমং বো নিণ্যং আ চিকেত" ইত্যাদি। সায়ণ ভাষ্য লিখিতেছেন—"সোঽয়মগ্নির্বৎসঃ মেঘস্থানাং অপাং বৈদ্যুতাগ্নিরূপেণ পুত্রস্থানীয়ঃ মাতৃঃ তস্য মাতৃস্থানীয়ানি বৃষ্ণ্যুদকানি স্বধাভির্হবির্লক্ষণৈ রন্নৈর্জনয়ত উৎপাদয়তি। তথা চ শ্রূয়তে—অগ্নৌ প্রাস্তাহুতি সম্যগাদিত্য-মুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি। অপিচ বহ্বীনাং মেঘস্থানাং অপাং গর্ভঃ বৈদ্যুতরূপেণ গর্ভস্থানীয়ঃ সোঽগ্নিঃ।" ইত্যাদি। মেঘের জল হইতে বিদ্যুৎ হয়, অতএব বৈদ্যুতাগ্নি জলের বৎস। আবার অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া যায়, তাহার সূক্ষ্ম অংশগুলা আদিত্যে গিয়া বৃষ্টির সৃষ্টি করে। অতএব অগ্নি আবার জলকে জন্ম দেন, তিনি বৎস হইয়াও মাতাকে উৎপন্ন করেন। এ হেঁয়ালিটা সায়ণ এইরূপ সোজাসুজি ভাঙ্গিয়া দিলেন। অবশ্য কথাটায় আমাদের সংশয় মিটিল না। মেঘে বিদ্যুৎ দেখিতেই পাই, কিন্তু হয় কিরূপে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আবার, আগুনে আহুতি দিলাম, সে আহুতির অংশগুলি আদিত্যে কেমন করিয়া পৌঁছিল, এবং তার ফলে বৃষ্টি যে কেমন করিয়া হইল তাহা আদপেই বুঝিলাম না। এইখানে নব্য-বিজ্ঞান টীকা লিখিতে বসিবেন। আমরা সে টীকা পরে শুনিব। আপাততঃ আরও দুটো-একটা হেঁয়ালির নমুনা শুনুন। ১।৯৫।১ বলিতেছেন—"বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট দুই কাল বিচরণ করিতেছে; তাহারা পরস্পরে পরস্পরের বৎসকে পালন করে।" "দ্বে, বিরূপে চরতঃ স্বর্গে অন্যান্যা বৎসং উপধাপয়েতে" ইত্যাদি। সায়ণ ভাষ্য লিখিতেছেন—"তে চ অহোরাত্রে অগ্নেঃ সূর্য্যস্য চ জনয়ৌ তত্র রাত্রেঃ পুত্র সূর্য্য সহি গর্ভবদ্ রাত্রৌ অন্তর্হিতঃ সন্ তস্যাশ্চরমভাগাদুৎ-পদ্যতে। অহঃ পুত্রোঽপিতা সহি তত্র বিদ্যমানোপি প্রকাশরাহিত্যেন অসৎকল্পঃ সন্ তস্মাদহ্ন সকাশাদ্নির্মুক্তঃ প্রকাশমানং স্বাত্মানং লভতে। অনয়ো-রেতায়বঃ পুত্রত্বং চ তৈত্তিরীয়ৈ রাম্নায়তে—তয়ো রেতৌ বৎসৌ অগ্নিবাদিত্যশ্চ রাত্রের্বৎস শ্বেত আদিত্যঃ অহ্নোগ্নি-স্তাম্রারুণ ইতি।" রাত্রির গর্ভে অন্তর্হিত থাকিয়া তাহারই

চরমভাগে সূর্য্য প্রকাশিত হন, অতএব শ্বেত সূর্য্য রাত্রির বৎস। আবার, অগ্নি দিবাভাগে নিষ্প্রভ থাকিয়া সন্ধ্যায় তাম্রারুণ রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠেন, অতএব অগ্নি দিবার বৎস। কালো গাইয়ের বাছুরটি সাদা, আর সাদা গাইয়ের বাছুরটি তামাটে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠক হইতে নজির তুলিয়া সায়ণ এ হেঁয়ালি ভাঙ্গিলেন। এ ভাষ্যের উপরও নৃত্ত্ব-বিজ্ঞান যে টীকা লিখিবেন, তাহা আমাদের ক্রমশঃ শুনিতে হইবে। আপাততঃ আমরা এইটুকু দেখিলাম যে, বেদ নানা যায়গাতে হেঁয়ালির ভাষায় যে সব কথা কহিয়াছেন, সে-সব কথা আজগবি বলিয়া হঠাৎ উড়াইয়া দিতে গেলে চলিবে না। সে সব হেঁয়ালির সমাধান করিতে বসিয়া অনেক স্থলে নব-বিজ্ঞানের সূত্র বেশ কাজে লাগিবে; কোন কোন স্থলে আবার আধিভৌতিক ব্যাখ্যায় কুলাইবে না, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে। আজ আমাদের অদিতির রহস্য বুঝিতে গিয়া তাহাই করিতে হইয়াছে। Physicsএ কুলায় নাই; Meta-Physics পর্য্যন্ত উঠিতে হইয়াছে। একেবারে গোড়ার কথা শুধু জড়বিদ্যার সূত্র-নির্দ্দেশ হইতে বুঝিতে যাওয়া চলিবে না। বেদ যে জগতের গোড়ায় চৈতন্যকেই বসাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ করা চলে না। বিলাতী পণ্ডিতেরা বলিতেন যে, সাবেক মন্ত্রগুলিতে সর্ব্বব্যাপী একটা চিৎপদার্থের কোনই সাড়া-শব্দ পাওয়া যায় না; হালের মন্ত্রগুলিতে, বিশেষতঃ দশম-মণ্ডলের কোন কোন সূক্তে, সেই চিৎপদার্থ ইন্দ্ররূপে, প্রজাপতিরূপে, বিশ্বকর্ম্মা-রূপে অথবা হিরণ্যগর্ভরূপে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। গোড়ায় বৈদিক ঋষিদের শিশুর মত সরল দৃষ্টি,—ক্রমশঃ প্রবীণতার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টির গভীরতা ও প্রসার হইয়াছে। এ বিলাতী মতের কোনও জমাট ভিত্তি আমি ত বেদের মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। বরং স্থূল ও স্পষ্ট জিনিসগুলিকে সাম্‌নে ধরিয়া ও প্রতীক্ ভাবে লইয়া সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধান বেদের সকল "স্তরে"ই হইয়াছে বলিয়া ত আমার মনে হয়। বেদের মন্ত্রের যথাযথ ভাবে অর্থ-চৈতন্য করিয়া লইতে পারিলে, তাহাদের মধ্যে ঋষিদের শৈশবের কোনই কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। তবে অবশ্য অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা দশম মণ্ডলে ঠিক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে জগৎটাকে দেখার আয়োজন কিছু বেশী আছে। গোড়ার দিকে আধ্যাত্মিক ভাবের ফল্গু-প্রবাহ প্রবাহিত হইলেও আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ভাবের কথাই স্পষ্টতঃ সাম্‌নে উপস্থিত রহিয়াছে। কাজেই ঠিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বোঝা পড়া এই সব যায়গাতেই হওয়ার সুযোগ বেশি।

অকূলে

অধ্যাপক শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল্

জাগরণে ঘুমের ঘোরে' তোমায় জড়াই নানা ডোরে,
ফক্কা গেরো শুধু;
আকাশ করে ধু-ধু।
আবার ফিরে পাকাই দড়ি; বিশ্ববেড়ো জালটি গড়ি;
আমি বলি বাহা।
শুনি ধ্বনি হা-হা।
নিংড়ে ব্যথা গোটা-গোটা যে জল ফেলি ফোঁটা ফোঁটা
কেউ ভেজে না তাহে;
আমি জ্বলি দাহে।
অবোধ্যকে বলি মায়া,— উদ্‌ভ্রান্ত ভাবের ছায়া;
ঘোচে না তায় জ্বালা,—
দুঃখ-শোকের পালা।
কোন্ সাগরের ঢেউ লাগে রে ও পারে কি কেউ জাগে রে?
চিন্তা কাঁপে শুধু;
অকূল করে ধু-ধু।

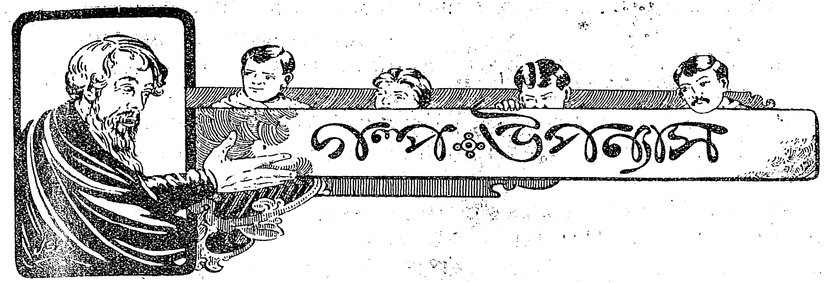

রাজগী।

ডাক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল

(২১)

দ্বিপ্রহর রাত্রে যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন সাবিত্রী খাইবার ঘরের সামনের বারান্দায় একলা বসিয়া,—লণ্ঠনের সম্মুখে বসিয়া সে কি একখানা বই পড়িতেছে। আমি আসিতেই সে বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আমি মুখ হাত ধুইয়া আসিলে, সে আমার খাবার দিল। আমার আসন করা ছিল, রূপার গেলাসে জল ভরিয়া সরপোষ দিয়া ঢাকা ছিল। সে সামনের জায়গায় একটু জল ছিটাইয়া হাত দিয়া মুছিয়া দিল। তার পর ঠাকুরকে ভাত আনিতে বলিল। খাওয়ার সময় বসিয়া সে সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে আমার খাওয়ার তদ্বির করিতে লাগিল।

আমি খাইয়া উঠিলে, সে সেই পাতে খাইতে বসিল। আমি গিয়া আমার ঘরে শুইয়া পড়িলাম।

খানিক পরে সাবিত্রী ঘরে আসিল। বাতিটা কমাইয়া দিয়া সে একটা রূপার গ্লাসে জল গড়াইয়া আমার বিছানার পাশে একটা টিপায়ের উপর রাখিল। গ্লাশটা রাখিবার আগে আঁচল দিয়া টিপায়খানি বেশ করিয়া মুছিয়া রাখিল।

সে দিন রাত্রে ভয়ানক গরম হইয়াছিল। পাখা টানিবার চাকর তখনও আসে নাই; আমি একখানা পাখা লইয়া নিজেকে বাতাস করিতেছিলাম।

সাবিত্রী এক মুহূর্ত্ত আমার দিকে চাহিয়া কি যেন ভাবিল। অর্দ্ধ আলোকে মনে হইল, বুঝি বা তার মুখখানা লজ্জায় একটু লাল হইয়া উঠিল। তার পর সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পাশেই তার শুইবার ঘর, সেখানে আলমারী খোলা ও বন্ধ করার শব্দ পাইলাম।

একটু পরে আবার সে ঘরে আসিল। আমার বিছানার উপর মশারির ভিতর উঠিয়া বসিল। আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। একটু অস্বস্তি বোধ করিলাম। কিন্তু সাবিত্রী সম্পূর্ণ নিশ্চল প্রস্তর মূর্ত্তির মত আমার শিয়রের কাছে বসিয়া একখানা বিচিত্র কারুকার্য্য-খচিত পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

আমি ভয়ানক সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। নিতান্ত অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়া রহিলাম,—সাবিত্রী বসিয়া বাতাসই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "আজ এত রাত্রে যাওয়া হ'য়েছিল কোথায়?"

স্পষ্ট অভিযোগ ও সন্দেহের সুর! সেই চির-পরিচিত সাবিত্রীর বিচারক মূর্ত্তি! সপাং করিয়া পিঠে চাবুক মারিয়া কে যেন আমাকে সম্পূর্ণ সজাগ করিয়া দিল।

আমি তীব্র শ্লেষের স্বরে বলিলাম, "মহাভারতের কথা শুনছিলাম।"

শ্লেষটা সাবিত্রী অবশ্যই বুঝিতে পারিল না। তার মুখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু স্পষ্টই বুঝিলাম যে তার মুখে একটা ভাবান্তর হইয়া গেল।

টানা পাখা একটু পরে নড়িয়া উঠিল। চাকর খাইয়া আসিয়াছে।

সাবিত্রী পাখা রাখিয়া মশারীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া স্থির কণ্ঠে বলিল, "আমার গোটাকয়েক কথা আছে আমি তোমাকে বলেছিলাম। তা' এত দিন তো তোমার শোনবার সুবিধা হ'ল না। আজ অনেক রাত্রি হ'য়েছে; কাল বাইরে যাবার আগে আমার সঙ্গে একবার দেখা করো'—কথা কটা তোমায় বলবো। তার আগে বাহিরে যেও না তুমি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে গর্ব্বিতা নারী দীর্ঘ সুগঠিত দেহে দৃপ্ত শোভার তরঙ্গ তুলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি রুষ্ট-দৃষ্টিতে সেই দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। তার পর ছাদের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিশ্চল ভাবে পড়িয়া রহিলাম।

পাশফিরিয়া শুইতে হাত পড়িল সেই পাখাখানার উপর। পাখাখানা হাতে করিয়া তুলিয়া দেখিলাম। অপূর্ব্ব সুন্দর সে পাখা। তার ভিতর অতি সূক্ষ্ম ছুঁচের কাজ করা—সাবিত্রী যে এত সুন্দর শিল্পকার্য্য জানে, তাহা আমি জানিতাম না। পাখাখানা দেখিয়া আমার মনটা ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিল।

এই পরিত্যক্তা নারী যে আজিকার এই অবসরের প্রতীক্ষায়ই এই পাখাখানা তার সকল কলাকুশলতা ঢালিয়া বুনিয়া সোনার হাতল বাঁধাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ রহিল না। তাই মনটা বিচলিত হইয়া উঠিল। আমি এখানে আসিবার পর হইতে সে যে নিপুণ নিষ্ঠার সহিত আমার সেবা করিতেছে, তাহা আমি লক্ষ্য না করিয়া পারি নাই। সে সেবায় আমাকে কুণ্ঠিত লজ্জিত করিয়াছে, আমি আপনাকে কতকটা হীন বোধ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতে আমার অন্তর এত দিন এত বিচলিত করিতে পারে নাই। আজ এই পাখাখানার হঠাৎ আবির্ভাবে আমার স্পষ্ট মনে হইল যে, এই সেবা ও নিষ্ঠা সাবিত্রীর কেবল একটা সাময়িক খেয়াল নয়, ইহা তার দীর্ঘ সাধনার বস্তু। বিধুর লাঞ্ছনার পর হইতে এই বোধ হয় তার সঙ্গে দীর্ঘ সহবাস। এত দিন তার কাছে আমি আসি নাই, তার সঙ্গে একটা কথাও কই নাই, তার নিয়মিত পত্র আমি নিয়মিত রূপে আগুনে পুড়াইয়াছি। এত দিন তার এমন আশা করিবার কোনও কারণ হয় নাই যে, আমি আবার ফিরিয়া তার কাছে আসিব, আবার সে আমার সেবার অবসর পাইবে। তবু সে যে আশা করিয়াছে এবং এই অবসরের জন্য আকুল ভাবে প্রতীক্ষা করিয়াছে,—সে আমাকে কামনা করিয়াছে।

মনটা ভারি অস্থির হইয়া উঠিল। আমায় নিজেকে ভারী অপরাধী মনে হইল। এই পতিপ্রাণা সাধ্বীকে আমি এই দীর্ঘ কয় বৎসর কঠোর লাঞ্ছনা করিয়াছি ভাবিয়া, আমার মন অনুতাপে ভরিয়া উঠিল। মনে মনে তার নিঃসঙ্গ জীবনের স্নেহহীন, আশ্রয়হীন বেদনার কথা ধ্যান করিলাম। এত ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে বসিয়া সে তার ভালবাসা ও তার সেবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া কি ব্যাকুল ভাবে এ দীর্ঘ কয় বৎসর কাটাইয়াছে! ভাবিতে তার উপর সমবেদনায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল।

আমি উঠিয়া বসিলাম। তার পর বিছানা হইতে উঠিয়া ঘরে পায়চারী করিতে লাগিলাম। মনটা ভারি বিষণ্ণ, অনুতাপদিগ্ধ হইয়া উঠিল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য্য পুলকে শরীর মন স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। এত দিন আমি নারী-প্রসঙ্গে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু পতিপ্রাণা সাধ্বীর প্রেম লাভ যে কি সৌভাগ্য, কি আনন্দ—তাহা কোনও দিনই বুঝি নাই। আজ সেই সৌভাগ্য কল্পনা করিতে হৃদয়ে আনন্দের মন্দাকিনী বহিয়া গেল। সাবিত্রীর গৌরবময়ী মূর্ত্তিখানি, তার এই মাসাধিক কালব্যাপী স্নিগ্ধ-নিপুণ সেবা আমার সমস্ত হৃদয়-মন আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

আমার মনে হইল—কি মূর্খ আমি! দশ বছর আগে চটুলা বুদ্ধিহীনা বালিকা কি কথা বলিয়াছিল, কি করিয়াছিল, তাই স্মরণ করিয়া আমি তার জীবনভরা শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলাম! ইহার মধ্যে একটিবার তাকে তার মনের কথা বলিবার অবসর দেই নাই। হয় তো সে কত অনুতাপ-ভরা পত্র লিখিয়াছে, হয় তো কত

স্নেহের সম্ভাষণ সে করিয়াছে! না জানি, কত আকুল ক্রন্দন সে করিয়াছে তার সেই সব পত্রে, যা আমি একেবারে না পড়িয়া অগ্নিতে বিসর্জ্জন করিয়াছি! এক একবার চিঠিগুলি পড়িয়া দেখিলে আমার কোনও ক্ষতি ছিল না। কোনও দিন তার চিঠির উত্তর সে পায় নাই; তবু চিঠি বরাবরই সে লিখিয়াছে। বরাবরই সে হয় তো তার হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া আমার কাছে ধরিয়া আসিয়াছে—আমি দয়া করিয়া তাহা পড়িবার অবসর পাই নাই। যদি দেখিতাম, তবে হয় তো জীবনের অর্দ্ধেক ভুল করিতাম না। তবে হয় তো সময় থাকিতে ফিরিতে পারিতাম। আজ আমার সম্পদ খোয়াইয়া চরিত্র ও প্রতিষ্ঠা সব হারাইয়া, প্রহৃত কুক্কুরের মত তার কাছে ফিরিতে হইত না। রাণী হইয়া সে জন্মিয়াছে, রাণী হইয়া সে আমার ঘরে আসিয়াছে। চিরদিন আমি তাকে রাণী করিয়া রাখিতে পারিতাম, নিজের সৌভাগ্য দু হাতে কুড়াইতে পারিতাম! কিন্তু আজ! আজ তো আর তাকে রাণী করিয়া রাখিবার শক্তি আমার নাই। এখন যে আমার সম্পত্তি যায়-যায়। কে জানে আমায় পথের ভিখারী হইতে হইবে কি না?

আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া সামনের বারান্দায় গেলাম। কে যেন আমাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আমি চলিলাম সাবিত্রীর ঘরের দিকে।

বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অন্দরের সব ঘর স্তব্ধ, এদিকে লোকের সাড়া মাত্র নাই। পাখাওয়ালা ছোকরা নীচতলায় বসিয়া পাখা টানিতেছে। তবু আমি সচকিত-দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া পা টিপিয়া অগ্রসর হইলাম। কোনও অপকার্য্য করিতে কোনও দিন এত সঙ্কুচিত হই নাই। ভদ্র পরনারীর আপন শয়নকক্ষে যাইতেও আমি কখনও এত কম্পিত হই নাই। আমার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি অতি কুণ্ঠিত-চিত্তে সাবিত্রীর দরজার সামনে আসিলাম। দেখিলাম দুয়ার বন্ধ, খিল দেওয়া।

আমি থমকিয়া গেলাম। ভয়ানক আকাঙ্ক্ষা হইল, ছুটিয়া পলাই; আবার তীব্র ইচ্ছা হইল, দুয়ারে ঘা দেই। শেষে ধীরে ধীরে দুয়ারে ঘা দিয়া ডাকিলাম "সাবিত্রী!" কোনও উত্তর পাইলাম না। এত শীঘ্র সে কখনও ঘুমায় নাই। দরজার ফাঁক দিয়া এইটুকু দেখিলাম যে, তার ঘরে আলো উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতেছে। এত উজ্জ্বল করিয়া আলো জ্বালিয়া সাবিত্রী নিশ্চয় ঘুমায় না। আমি আবার আস্তে ডাকিলাম। সাড়া পাইলাম না। আর ডাকিতে সাহস হইল না। মনে হইল, আমি ভয়ানক স্পর্দ্ধার কাজ করিতেছি,—সাবিত্রী সাধ্বী, ধর্ম্মপরায়ণা,—আমি পাপিষ্ঠ। সে আমাকে স্বামী বলিয়া সেবা করিতে পারে, পূজা করিতে পারে,—তাই বলিয়া সে যে আমার মত নীচ-চরিত্রকে স্বামীর পরিপূর্ণ অধিকার দিবে, ইহা সম্ভব নয়। যাহা পাইয়াছি, তাই আমার যথেষ্ট। এর বেশী আমার আশা করা উচিত নয়। আমি তো সাবিত্রীর যোগ্য নই।

তাই আর ডাকিতে সাহস হইল না, ফিরিলাম। ফিরিবার সময় সাবিত্রীর ঘরে শব্দ শুনিলাম। তাহাতে বুঝিলাম, সে এখনো জাগিয়া আছে। তবে সে ইচ্ছা করিয়াই আমার ডাকে সাড়া দেয় নাই,—আমার মন বুঝিয়া সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এ কথা ভাবিতে একটু রাগ হইল; কিন্তু অপরাধ-কাতর চিত্তে রাগ বেশীক্ষণ থাকিল না! তার কোনও দোষ আমি দিতে পারিলাম না। মনটা বিষণ্ণ হইল; তবু তার উপর রাগ করিবার অধিকার আমার নাই, তাহা বুঝিলাম।

কিন্তু সাবিত্রীর উপর যে প্রীতি এতক্ষণ আমার অন্তরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা দমিয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম যে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সাবিত্রীর কথার ঝাঁঝ কমিয়াছে, ব্যবহার সংযত হইয়াছে; কিন্তু তার অন্তর ঠিক আগের মত ক্ষমাশূন্য বিচারপরায়ণ হইয়াই আছে। সে আমার সেবা যতই করুক, ভাল সে আমায় বাসে না। আমি তার হয় তো একটা পূজার প্রতীক, স্বামিত্বের একটা বিগ্রহ মাত্র,—তার সেবা তার ধর্ম্মের অঙ্গ, অন্তরের প্রীতির প্রকাশ নয়।

রাধাচরণের কাহিনীতে আমার অন্তর ভয়ানক দমিয়া গিয়াছিল। সাবিত্রীর প্রেমের কল্পনা আমার সে অবসাদ সম্পূর্ণ দূর করিয়া আমার ভিতর জীবনের আশা জাগাইয়া তুলিয়াছিল। সে আশা এই চিন্তায় একদম মুশড়াইয়া গেল। দ্বিগুণ অবসাদে আমি শুইয়া শুইয়া ভাবিতে

লাগিলাম, আমার ভবিষ্যতের কথা, আমার আর্থিক ব্যবস্থার কথা, গোবিন্দের শয়তানির কথা, সাবিত্রীর কথা, আমার প্রেম-পিপাসিত বঞ্চিত অন্তরের কথা, বিধুর কথা, তার মৃত্যুর কথা। আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিয়া ভাবিলাম। মাথার ভিতর দপ্ দপ্ করিতে লাগিল, শরীর উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এমনি করিয়া রাত্রি প্রভাত হইলে, আমি উঠিয়া খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইলাম। ঊষার স্নিগ্ধ বাতাস লাগিয়া মাথাটা অনেক ঠাণ্ডা হইল। স্নানের ঘরে জল ছিল, আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিয়া কতকটা সুস্থ হইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

(২২)

স্নানের পর কাপড় চোপড় পরিয়া আমি সাবিত্রীর ঘরে গেলাম। বেশ একটু শক্ত হইয়াই গেলাম। সে রক্ত-মাংসে-গঠিত আমাকে তো চায় না, সে চায় আমাকে পাথরের মূর্ত্তির মত পূজা করিতে। আমি পাথরের মত শক্ত হইয়াই তার কাছে গেলাম।

আমি বাহিরে চা খাই, কিন্তু আজ চাকরকে বলিয়া দিলাম সাবিত্রীর ঘরে চা দিতে।

সাবিত্রীর ঘর খোলাই ছিল। এ ঘরে এত দিন প্রবেশ করি নাই,—আজ ঢুকিতে ভয়ানক নূতন নূতন বোধ হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, নূতন ঠেকিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

রাণীমা থাকিতে ঘরের যে সজ্জা ছিল, তার খুব কম জিনিসই আছে। একধারে একটা দামী বেভেল-করা কাঁচের বড় ড্রেসিং টেবিল আছে। ঘরের মাঝখানে একখানা খাট, দুটি বড় বড় আলমারি, একটা বড় লোহার আলমারী। তা ছাড়া আর কিছুই নাই।

দেখিতে পাইলাম, খাটের উপর বিছানা নাই। খাটের এক পাশে মাটিতে একখানা পুরু শামলা বিছান আছে, তার উপর চাদর পাতা, এবং তার একধারে একটা বালিস। বুঝিলাম, ইহাই সাবিত্রীর বিছানা।

সাবিত্রী আমার আসার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, তাহা বুঝিলাম। আমার ঘরেই সে আমার সঙ্গে কথা কহিতে চাহিয়াছিল। সেও অনেকক্ষণ হইল উঠিয়াছে। স্নান করিয়া একখানা মুগার শাড়ী পরিয়া সে ঘরের এক কোণে পূজায় বসিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সে ভয়ানক অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া উঠিল। তার সমস্ত মুখ গোলাপ ফুলের মত টুকটুকে হইয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানি একটু সলজ্জ হাস্যে বিস্তৃত হইয়া গেল।

আমি দেখিলাম পাষাণ-মূর্ত্তিতে প্রাণ-সঞ্চার হইয়াছে। তার এই পূত-শুদ্ধ মূর্ত্তি মুগার শাড়ীতে বেষ্টিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। তার গায় জামা নাই, অঙ্গের স্বাভাবিক সৌষ্ঠব চারিদিকে কাপড়ের ভিতর দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মাথায় তার কাপড় নাই, সদ্যঃস্নাত দীর্ঘ কেশরাশি তরঙ্গায়িত হইয়া সমস্ত পিঠ ছাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়াছে।

সে অঞ্জলি ভরিয়া ফুল তুলিয়া মন্ত্র পড়িতেছিল,—পূজায় সে তন্ময় হইতে পারে নাই। আমি যে পাশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, তাহা অনুভব করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে ছিল, তাহা দেখিতে পাইলাম। সে লজ্জা খুব বেদনাময় বলিয়া আমার মনে হইল না। আমি তন্ময় হইয়া তার এই পবিত্র রূপরাশি দেখিতে লাগিলাম। নারীর রূপ অনেক দেখিয়াছি,—কখনও এমনটি দেখি নাই। আর, কখনও এমন পবিত্র শুদ্ধ চিত্তে নারীর সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারি নাই। আমার সমস্ত অন্তর একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত হইল।

তার দিক হইতে চক্ষু সহসা ফিরাইতে পারিলাম না। যখন পারিলাম, তখন তার সম্মুখে পূজার আয়োজনের দিকে চাহিলাম। দেখিতে পাইলাম, টাটের উপর পাথরের শিব একেবারে ফুল বেলপাতায় ঢাকিয়া গিয়াছে। তার ওধারে দেখিলাম—আমারই একখানা ফটোগ্রাফ। সাবিত্রীর শিবপূজা হইয়া গিয়াছে, সে পুষ্পাঞ্জলি সঙ্কল্প করিয়া দিতেছিল আমারই ছবির পায়!

হঠাৎ সাবিত্রী ফিরিয়া সে পুষ্পাঞ্জলি আমার পায় দিয়া, গলায় আঁচল জড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিল। তার সমস্ত মুখ এমন লজ্জায় রঞ্জিন হইয়া উঠিয়াছিল যে, আমি তার সেই শোভা হইতে চক্ষু ফিরাইতে পারিলাম না।

সাবিত্রীর ঘরে চেয়ারের বালাই ছিল না। সে তাড়াতাড়ি একখানা গালিচা টানিয়া খাটের উপর ফেলিয়া

আমাকে বসিতে বলিল, এবং নিজে একখানা জলচৌকী টানিয়া লইয়া পায়ের কাছে বসিল।

আমি যে রকম কাঠখোট্টা ভাবে কথা আরম্ভ করিব স্থির করিয়াছিলাম, তাহার কিছুই হইল না। সাবিত্রীর এই পূজা আমার মনটা এত নরম করিয়া দিয়াছিল যে, আমি কোনও কথাই বলিতে পারিলাম না। তার দিকে চাহিয়া এমন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাব হইল, যাহা আমি পূর্ব্বে আর কখনও অনুভব করি নাই। প্রীতিতে আমার হৃদয় অভিষিক্ত হইল; কিন্তু এমন মনে হইল না যে, সাবিত্রীকে সাপটিয়া কোলে জড়াইয়া ধরি। তাকে এতটা জীবন্ত দেবীর মত মনে হইতেছিল যে, তাহাকে আলিঙ্গন করা যেন একটা দারুণ অপরাধ হইবে বলিয়া মনে হইল। শ্রদ্ধা আমার প্রীতিকে অভিভূত করিল।

সাবিত্রীরও কথা কহিতে স্পষ্টই সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। তার পূজার মহামুহূর্ত্তেই যে সে এমন করিয়া ধরা পড়িয়া গেল, সেই লজ্জায় যেন তার কথাবার্ত্তা একেবারে শুকাইয়া গেল। সে কেবল মাটির দিকে চাহিয়া লজ্জিত ভাবে হাতে নখ খুঁটিতে লাগিল।

আমরা দুজনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম।

একটি ঝি একখানা ট্রে'তে করিয়া আমার চা লইয়া আসিল। আমি চাকরকে বলিয়াছিলাম,—জানিতাম না যে, এ ঘরে চাকরের প্রবেশ নিষেধ। ঝি চা আনিতেই, সাবিত্রী তার হাত হইতে সেটা লইয়াই, তাহাকে ধমক দিয়া উঠিল। ঝি এ কাজে অভ্যস্ত নয়,—ট্রে বহিয়া আনিতে সে আমার খাবারের ভিতর অন্যমনস্ক ভাবে একটু চা ফেলিয়া দিয়াছে।

সাবিত্রী ট্রেটা মাটীতে নামাইয়া রাখিয়া, একখানা চাদর গায় জড়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে একখানা রূপার রেকাবীতে সুন্দর করিয়া খাবার সাজাইয়া আনিল; এবং চায়ের বাটী ফরসা কাপড় দিয়া খুব করিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে এক পেয়ালা চা তৈয়ার করিয়া আমার সামনে রাখিল।

সাবিত্রীর সেবা-নৈপুণ্যে আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

চা খাওয়া হইলে আমি বলিলাম, "কি কথা বলতে চেয়েছিলে সাবিত্রী?"

সাবিত্রী একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "কথাটা বড় গুরুতর—হয় তো অপ্রিয়ও। কিন্তু রাগ করো না। বলতে চেয়েছিলাম, তোমার সম্পত্তির ব্যবস্থার কথা। তোমার যেমন খরচ-পত্র, তাতে সম্পত্তি থাকাই কঠিন। দেওয়ানজী তো—আমি টাকা চাইলেই বলেন যে, তোমার টাকাই তিনি দিয়ে উঠতে পারছেন না। এতে আমার ভয়ানক অসুবিধা হ'চ্ছে। আমি কয়েকটা সামান্য কাজ হাতে নিয়েছি; সদা সর্ব্বদাই আমার টাকার দরকার হয়। তাই বলছিলাম কি, যে, তুমি আমাকে কতকটা সম্পত্তি লিখে দেও,—অন্ততঃ তার উপস্বত্বটা দিয়ে দেও, যাতে আমি ইচ্ছামত ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'রতে পারি।"

কথাটা আমার বর্ত্তমান মেজাজে অত্যন্ত বেসুরা ঠেকিল। এটা যেন ভয়ানক স্বার্থপরের মত বোধ হইল। এমনও একটু সন্দেহ হইল যে, বুঝি-বা আমার সেবা পূজার এত আড়ম্বর আমাকে ভুলাইয়া এই সম্পত্তিটুকু আদায় করিবার জন্যই। এ কথাও একটু মনে হইল যে, এমনও হইতে পারে যে, এই স্বামী-পূজাটা একটা তুক-তাকের অঙ্গ, যাহাতে স্বামীকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়া তাহার কাছে এই সম্পত্তি আদায় করা যায়। কিন্তু আমি ঠিক চটিলাম না।

ধীর ভাবেই আমি বলিলাম, "আচ্ছা, সে কথা আমি বিবেচনা করে' দেখবো। কিন্তু এই সম্পর্কে আমার তোমাকে একটা কথা বলা দরকার। তুমি হয় তো জান না, আমি কি রকম দেনায় জড়িত হ'য়ে পড়েছি। আর আমার সন্দেহ হয় যে, দেওয়ান আর নায়েবগুলো মিলে আমার অনেকটা লোকসান করে' ফেলেছে।"

মাথা খাড়া করিয়া সাবিত্রী বলিল, "আমি জানি না? আমি তো তোমাকে তিন বৎসর আগে সব কথা জানিয়েছিলাম। বাবাকে এনে সব দেখতে শুনতে ব'লেছিলাম। তিনি বল্লেন যে, তুমি না বল্লে তিনি ভার নিতে পারেন না। তাই তোমাকে সব কথা জানিয়ে বাবাকে লিখতে ব'লেছিলাম। তা' তুমি তো সে কথা গ্রাহ্য করনি। সে চিঠির জবাবই দেওনি। কোন্ চিঠিরই বা জবাব দিয়েছ?"

সাবিত্রী একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম, "যা'ক, সে সব

কথা তুলে' আর কি হবে? যা ব'লছিলাম,—আমার বিষয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ বোধ হ'চ্ছে। এখন আমরা খুব ব্যয় সংক্ষেপ করে' না চালালে, আর আমাদের উদ্ধারের আশা নেই। আমি শুনলাম, তোমার খরচপত্র ভয়ানক বেশী। তোমার খরচের হাতটা একটু না কমালে তো চলে না, সাবিত্রী!"

সাবিত্রীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, তার কপালের শিরা ঈষৎ স্ফীত হইল। সে একটু উঁচু গলায় বলিল, "বেশ, বেশ, আমার খরচ বেশী! এই কথা বলবে বই কি! আমার খরচ বেশী ব'লে তোমার মনোহর সার কাছে দেনা হ'য়েছে, না? তা বেশ, শুনি কি শুনেছ তুমি? আমার কোন্ খরচটা বেশী? আমার কাপড় চোপড়, গয়না, না আসবাব, না মোটর বোট? কি দেখছো বেশী খরচের?"

মোটর বোটের কথার মধ্যে বেশ একটু খোঁচা ছিল। সে খোঁচাটা আমার মনে বিষের হুলের মত বিঁধিল। আমিও একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিলাম, "এই ধর না, তুমি প্রায় তিন চার শো ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পঁচিশ টাকা করে' বার্ষিক দিয়ে ব'সেছ। এটা অপব্যয়। প্রথমতঃ যে দানটা ক'রছো সেটা অপাত্রে প'ড়ছে; কেন না, এই চারশো ব্রাহ্মণের বাড়ী খুঁজে দেখলে, চারটা টোলও বেরুবে কি না সন্দেহ। তা ছাড়া, যত বড়ই সৎপাত্র এরা হ'ক না কেন, এখন আমাদের যা আয়, তাতে বছরে আট দশ হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে বার্ষিক দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

সাবিত্রীর চোখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "হুঁ, বুঝলাম। তার পর আর কি খরচ শুনি?"

"তা ছাড়া, তোমার মহোৎসবের খরচ, ব্রতনিয়মের খরচ আবশ্যকের অনেকটা অতিরিক্ত। হ'তে পারে যে আমাদের অবস্থা যখন এর চেয়ে ভাল ছিল, তখন তোমার এ-সব খরচ পোষাত। কিন্তু এখনকার অবস্থায় তা চলে না।"

উদ্যত রোষ যে সাবিত্রী কষ্টে আংশিকভাবে মাত্র দমন করিল, তাহা স্পষ্টই বোঝা গেল। সে বলিল, "আচ্ছা, হিসাব করে দেখেছ—এই সব বাজে খরচে কত টাকা গিয়েছে? সব নিয়ে এখানে বোধ হয় বিশ বাইশ হাজার টাকার বেশী আমি বছরে খরচ করি নি। তার হিসাব ক'রেছ কি—তুমি ক'লকাতায় বসে' কত টাকা খরচ ক'রেছ কেবল মদ আর মেয়েমানষের পেছনে? গেল বছর তুমি তিন লক্ষ টাকা খরচ ক'রেছ, অথচ তোমার সম্পত্তির আয় এখন লক্ষ টাকাও হয় না।"

কথাটা সত্য। এ কথা স্মরণ করিয়া আমি কাল সমস্ত রাত্রি অশান্তি ভোগ করিয়াছি। কিন্তু এমনি ভাবে এ কথাটা সাবিত্রীর মুখে শুনিয়া আমার অন্তরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আমি খুব কড়া কথা বলিতে গিয়া থামিয়া গেলাম। বলিলাম,

"সে সব তো যা'হোক হ'য়ে ব'য়ে গিয়েছে। যা হ'য়েছে তার তো আর চারা নেই। এখন অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে কি, তাই ভেবে দেখতে হ'বে। দেখে শুনে তোমার আমার দুজনেরই হাত টেনে খরচ ক'রতে হ'বে, না হ'লে একেবারে ডুববো। এই যে তুমি বল্লে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র খরচ করেছো, সেও ঠিক নয়। তুমি গোবিন্দ ঠাকুরকে যে বাড়ী করে দিচ্ছ, তার দরুণই পঁচিশ হাজার টাকা তাঁকে দিতে হ'বে। এ টাকাটা বর্ত্তমান অবস্থায় তোমার নেহাৎই অপব্যয়।"

"হাঁ—অপব্যয় নয়? অপব্যয় বই কি? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বার্ষিক দেওয়া অপব্যয়, দেবতা ব্রাহ্মণকে দেওয়া অপব্যয়। গুরুদেব ইষ্টদেবতা, যিনি পৃথিবীতে জাগ্রত ভগবান, তাঁকে কুঁড়ে ঘরে রেখে নিজে প্রাসাদে বাস না করলে সেটা অপব্যয়। এ সবই অপব্যয়। আর একটা বেশ্যার স্মৃতিমন্দিরে দশ হাজার টাকা খরচ বোধ হয় খুব সদ্ব্যয়!"

এই কথাটা তীক্ষ্ণ শলাকার মত, আমার ব্যথা যেখানে সব চেয়ে বেশী, ঠিক সেইখানে গিয়া বিঁধিল। এ ইঙ্গিতের অর্থ ছিল। আমি এখানে আসিয়াই, বিধুর যেখানে বাড়ী ছিল, সে স্থানটা খাস করিয়া লইয়াছিলাম, এবং সেখানে একটা সুন্দর বাড়ী ফাঁদিয়া বসিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, এখানে আমি ধর্ম্মশালা করিব, কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প ছিল যে, এখানে অনাথ শিশুদের জন্য একটা ছোটখাট আশ্রম করিব। মন্দিরটি কলিকাতার শ্রেষ্ঠ শিল্পীকে দিয়া নকসা করাইয়া করিতেছিলাম,—তার খরচ দশ হাজার টাকার বেশী বই কম হইবে না।

বলা বাহুল্য যে, এ মন্দির বিধুরই স্মৃতিমন্দির, যদিও সে কথা আমি কাহাকেও খুলিয়া বলি নাই।

যখন আমি মন্দিরের পত্তন করিয়াছিলাম, তখন পর্য্যন্ত আমি আমার আর্থিক দুরবস্থার কথা ঠিক জানি নাই। রাধাচরণ বলিবার আগে কেহই আমাকে এ কথা বুঝাইয়া বলে নাই, আমারও অবিকার করিবার অবসর ঘটে নাই। কাল রাত্রে রাধাচরণের কথা শুনিয়াই আমার মনে হইয়াছিল যে, বিধুর স্মৃতিমন্দির তবে আমায় ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভাবিতে বড় কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু মন স্থির করিয়াছিলাম,—যদি কখনও অবস্থা ফেরে, তবেই ইহা সম্পূর্ণ করিব; আপাততঃ ইহা স্থগিত থাকিবে।

সাবিত্রী যে কথাটা ঠিক আঁচ করিয়াছে, তাহাতে আমি বিস্মিত হইলাম না। কিন্তু বিধুর স্মৃতির এমনি অপমান আমার অন্তরে এত জ্বালা ধরাইয়া দিল যে, আমি আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া আমি বলিলাম, "দেখ, যা'খুশী তাই বলো না। আমার টাকা আমি যেমন করে' ইচ্ছা খরচ করবো, তাতে তোমার কিছু বলবার নেই। তোমার যদি তেমনি বেপরোয়া হ'য়ে খরচ করবার ইচ্ছা থাকে, তবে বাপের বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে এসো।"

সাবিত্রীও উঠিয়া সমান তেজে উত্তর করিল, "অতখানি তেজ করে আমার সঙ্গে কথা কয়ো না। শাস্ত্র খুলে দেখ গিয়ে, তোমার সম্পত্তিতে আমার অর্দ্ধেক অধিকার! তোমার চোখ রাঙানিতে আমি আমার ধর্ম্মের অধিকার ছাড়বো না।"

"তোমার অধিকার নিয়ে তুমি চুলোয় যাও" বলিয়া আমি উঠিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে চলিয়া গেলাম।

ক্রোধের আবেগ কাটিয়া গেলে মনটা ভয়ানক অপ্রসন্ন হইয়া গেল। আজ সকালের এমন মধুর আরম্ভটা এমন করিয়া খাক হইয়া গেল, ভাবিতে প্রাণটা কাঁদিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

জয়দেব

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

(কবি এবং কাব্য)

কবি কে, এবং কাব্য কি, কোন্ কবি বড়, মাঝারি অথবা ছোট, কোন্ কাব্য ভাল, মন্দের ভাল, কিম্বা মন্দ—পণ্ডিতগণ তাহার বিচার করেন। কবি জয়দেব এবং তাঁহার গীত-গোবিন্দ কাব্য লইয়া এইরূপ বিচারের অভাব নাই। স্বদেশের এবং বিদেশের প্রাচীন ও আধুনিক অনেকেই এই বিচারে যোগদান করিয়াছেন। কিন্তু বিচারে মতবিরোধ ঘটিয়াছে বড় বিষম,—দুই দলে একেবারে আকাশ-পাতাল ব্যবধান! এক পক্ষ বলেন,—(ইহাঁরা প্রাচীন, অথবা প্রাচীনপন্থী আধুনিক) জয়দেব মহাকবি, তাঁহার গীত-গোবিন্দ কাব্য সর্ব্ব রসের আকর, মাধুর্য্যের অফুরন্ত নির্ঝর, প্রেমভক্তির পীযূষ-প্রস্রবণ,—পবিত্রতায় শ্রীমদ্ভাগবতের সমতুল্য। অপর পক্ষ বলেন,—(আধুনিক শিক্ষিত দলের অনেকেই এই পক্ষের অন্তর্ভুক্ত)—জয়দেবকে বিশেষ বড় কবি বলিতে পারা যায় না; যেহেতু, তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যখানা অত্যন্ত অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, এবং অতি নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার কথা লইয়া রচিত, ভদ্র-সমাজের অপাঠ্য! উভয় দলেই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আছেন; কিন্তু এক পক্ষ দেখেন ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে, অপর পক্ষ দেখেন সাধারণ ভাবে। প্রথম পক্ষ বলেন,—সকলকেই যে সব কিছু জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে, অথবা সব পুঁথিই পড়িতে হইবে, এমন কি কথা আছে? কবি জয়দেব তো তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে মুখবন্ধ করিয়া গিয়াছেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্" ॥

"যদি হরি স্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, যদি তাঁহার বিলাস-কলা জানিতে তোমার কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে জয়দেব সরস্বতীর মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী শ্রবণ কর।" অন্যথায় কি করা কর্ত্তব্য, জয়দেব তাহা না বলিয়া দিলেও,

দ্বিতীয় পক্ষ তাহা হাতে কলমে করিয়া দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষ এই অধিকারবাদ মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন হরিস্মরণে মনকে সরস করিবার জন্য ঐ অশ্লীল কাব্য ঘাঁটাঘাঁটি করিবার আবশ্যকতা কি? তাহার তো অন্যবিধ অনেক উপায় আছে। এতদ্ভিন্ন হরিস্মরণের ইচ্ছা না থাকিলে যে গীতগোবিন্দ পড়িতে পাইব না, তাহারই বা অর্থ কি? গীতগোবিন্দ যখন একখানা কাব্য, তখন তাহা লইয়া বিচার করিবার অধিকার সকলেরই আছে।

যত গোল বাধিয়াছে ঐখানে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায়—গীতগোবিন্দ অশ্লীল, তাহা হইলেও কবিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, জাতির জীবনে যে সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হয়, সেই সঙ্গীতে কণ্ঠ মিলাইয়া এক উচ্চতর গ্রামে সুর বাঁধিয়া দেওয়াও কবির কার্য্য। যে কবি সাময়িক ভাবের উপর কাব্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজকে উচ্চতম আদর্শ দান করেন,—লোকশিক্ষক, লোকগুরু হিসাবে তিনিও পূজা পাইবার যোগ্য। "সেখশুভোদয়া" প্রভৃতিতে সেকালের যে চিত্র অঙ্কিত আছে—নদীয়ার রাজপথ যখন প্রকাশ্য দিবালোকে বারাঙ্গনাগণের নূপুর-নিক্কণে ধ্বনিত হইত, সুরধুনীর পুলিন-পরিসর যখন নায়ক-নায়িকাগণের কাম-কথা সংলাপে মুখরিত থাকিত,তখনকার দিনে, সে চিত্রের রূপান্তর সাধনে শ্রীগীতগোবিন্দের মত কাব্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। যে রিপুর বিশ্বগ্রাসী লালসা দুষ্পূরণীয়, উপভোগে যাহা "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" দিগ্দাহী দাবানলের মত বাড়িয়াই চলে, সে ক্ষুধাহরণের একমাত্র সুধা প্রেম, তাহার নির্ব্বাপনের শান্তিজল আছে শুধু ত্যাগে। তাই শ্রীগীতগোবিন্দে দেখিতে পাই—

"শ্রীজয়দেব ভনিত মিদ মুদয়তি হরিচরণ স্মৃতিসারং।
সরস বসন্ত সময় বন বর্ণন মনুগত মদন বিকারং"॥

কবি সরস বসন্তের বনানী-সৌন্দর্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন, অনুগত মদন-বিকারের কথাও বিস্মৃত হন নাই; কিন্তু সে সমস্তই "উদয়তি হরিচরণ স্মৃতি সারং"—তাঁহাকেই স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য,—যিনি বিশ্ব-শরণ। অখিলের নিখিল সৌন্দর্য্য যাঁহার অঙ্গদ্যুতি, প্রকৃতির রূপে যদি তাঁহারই স্মৃতি জাগ্রত করিয়া না দিবে, বিশ্বের মাঝে বিশ্বেশ্বরের অনুভূতি জাগাইয়া না তুলিবে, তবে আর সে সৌন্দর্য্যের সার্থকতা কোথায়? সৌন্দর্য্যে হৃদয় উল্লসিত হইয়াছে, প্রিয়জনের জন্য মন চঞ্চল হইয়াছে, ইহাকে বিকার বলিতে পার,—ভাব মাত্রেই তো বিকার—"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাঃ প্রথম বিক্রিয়া"—কিন্তু এ বিকার তাঁহারই জন্য যিনি "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ"। কামনা বটে—তবে রূপে রসে গানে গন্ধে বিশ্বে-বিলসিত বিশ্বপতির সেবা করিবার কামনা। ইহাই রসস্বরূপের উপাসনা, আনন্দময়ের সাধনা, ভাবগ্রাহীর ভাবনা।

জয়দেবে এই ভাব আছে বলিয়াই,—মূলতঃ শ্রীমদ্ভাগবত প্রতিষ্ঠাভূমি হইলেও,—গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রধানতঃ শ্রীগীতগোবিন্দের ভিত্তির উপরেই রচিত হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেব এই কাব্যের ভাবের উচ্চতায় বিমুগ্ধ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের তথা প্রেমসূত্রের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ইহার প্রতি যে সমাদর দেখাইয়া গিয়াছেন, দাক্ষিণাত্যের গোদাবরীতীরে "সাধ্য সাধন" নির্ণয়ে পাণ্ডিত্য ও দার্শনিকতার, রসতত্ত্বজ্ঞতা ও ভাবুকতার অপূর্ব্ব নিকষে ইহার যে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, জয়দেবের প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে আমরা তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করি। ধর্ম্ম কখনো মিথ্যাকে ধরিয়া গড়িয়া উঠে না, প্রকৃত ধর্ম্মই সত্যোপেত। সে সত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে জয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গীকে, তাহার শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিলে চলে না। সত্য যাহা,—তাহা চিরন্তন, তাহা বিশ্বজনীন; কিন্তু দেশ কাল পাত্রভেদে তাহার বিকাশের ধারা, প্রকাশের ভঙ্গী, সর্ব্বত্রই প্রায় বৈচিত্র্যপূর্ণ ও রহস্যময়। সে রহস্যের মর্ম্মোদ্ধার করিতে হইলে তত্ত্বান্বেষীকে সম্প্রদায়ের ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এই বিশ্বাসেই আমরা এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি। কয়েকটী ধারাবাহিক প্রবন্ধে আমরা এই ভাবেই কবি জয়দেব ও তাঁহার কাব্যখানিকে বুঝিবার চেষ্টা করিব। পরে প্রয়োজন হইলে প্রাচীন ও আধুনিক উভয় পক্ষের মতবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

কাব্যের সম্বন্ধে সন্দেহ উঠিয়াছে, সে কথা পরে বলিতেছি। পাছে "অজয়" ও "জয়দেব" নাম দেখিয়া এইরূপ কোনো সন্দেহ উঠে, তজ্জন্য কবির সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা আবশ্যক। বলা বাহুল্য যে সংস্কৃত সাহিত্যে জয়দেব কবির অভাব নাই। "শৃঙ্গার মাধবীয় চম্পূ" প্রণেতা একজন কবির নাম জয়দেব, ইহাঁর উপনাম কৃষ্ণদাস। আর একজন জয়দেব ছিলেন, তাঁহার উপাধি "পীযূষবর্ষ"। তিনি "চন্দ্রালোক অলঙ্কার" ও "প্রসন্ন রাঘব নাটক" প্রণয়ন করেন। কৌণ্ডিল্যগোত্র-সম্ভূত এই কবির পিতার নাম মহাদেব, মাতার নাম সুমিত্রা। "চন্দ্রালোক অলঙ্কারে অভিধা স্বরূপাভিধানো নাম দশম ময়ূখে" উল্লিখিত আছে—

"পীযূষবর্ষ প্রভবং চন্দ্রালোক মনোহরং।
সধা নিধান মাসাদ্য শ্রদ্ধয়াং বিবুধামুদং॥
জয়তি যাজক শ্রীমন্মহাদেবাঙ্গ জন্মনঃ।
সুকৃ পীযূষ বর্ষস্য জয়দেব কবের্গিরঃ॥

শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডি-লিট্ মহাশয় খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শুরু অর্জ্জুন সংকলিত গ্রন্থসাহেব হইতে দুইটী কবিতা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেও কোনো জয়দেব কবির ভণিতা আছে।

(১)

পরমাদি পুরুষ মনোপি মংসতি আদি ভাবরতং।
পরমং কৃতং পরকৃতি পরং যদি চিংন্তি সর্ব্বগতং॥
কেবল রাম নাম মনোরমম্।
বদি অমৃত তত্ত্বময়ং॥
নদনোতি জস মরণেন জন্ম জরাধি মরণ ভয়ম্॥
ইচ্ছনি রমাদি পরাভয়ং বশ স্বস্তি সুকৃত কৃতং।:
ভবভূত ভাব সমবৃয়ং পরমং প্রসন্ন মিদং॥
লোভাদি দৃষ্টি পরগৃহং যদি বিদ্ধি আচরণং।
ত্যজি সকল দুহকৃত দুর্ম্মতী ভজু চক্রধর শরণং
হরি ভগত নিজ নিহ কেবলারিদ্ কর্ম্মণা বচসা।
যোগেন কিং যজ্ঞেন কিং দানেন কিং তপসা॥
গোবিন্দ গোবিং দে তিজপিনরস কল সিদ্ধিপদং।
জয়দেব আই উতস স্ফুটং ভবভূত সর্ব্ব গতং॥

(২)

চংদ সত ভেদি যানাদ সত পূরিয়া সুর সত
ষোড়সাদত্ত কীয়া।
অবলবল তোড়িয়া অচল চল থপ্পিয়া
অধড় ধড়িয়া তহা আপি উচ্চীয়া॥
মন আদি গুণ আদি বখানিয়া।
তেরীহু বিধাদৃষ্টি সম্মানিয়া॥
অন্ধকো অরধিয়া সরধিকো সরধিয়া
সলল কৌসল লি সম্মানি আয়া।
বদতি জয়দেব কৌ রম্মিয়া ব্রহ্ম নির্ব্বাণ
লিবলী নপায়া॥

কথা উঠিয়াছে—সম্পূর্ণ কাব্যখানি জয়দেবের রচিত নহে। পদাবলীর আরম্ভে ও শেষে যে সমস্ত কবিতা আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত,—গীতগোবিন্দকে কাব্যের আকারে গড়িয়া তুলিবার জন্য পরবর্ত্তী কালে কেহ সেগুলি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। এরূপ সন্দেহ করিবার হেতু এই যে, গীতগোবিন্দে যে চব্বিশটী পদ আছে—তাহা যেরূপ মধুর-কোমল-কান্ত, অপর শ্লোকগুলি সেরূপ নহে। জয়দেব কিন্তু মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর কথাই সূচনায় বলিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন শ্লোকগুলি না থাকিলেও পদাবলীর কোনো ক্ষতি হইত না, ইত্যাদি। আমাদের মনে হয়, এরূপ সন্দেহ নিতান্তই ভিত্তিহীন। জয়দেব যেমন আপন মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীর কথা বলিয়াছেন, তেমনই সন্দর্ভশুদ্ধির কথাও বলিয়াছেন। এই সন্দর্ভশুদ্ধির উদাহরণ স্বরূপ তিনি যে ঐ শ্লোকগুলি রচনা করেন নাই, তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, ভাষায় এবং ছন্দে শ্লোকগুলি যেরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ, তাহাতে বরং ইহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, যে, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, শরণ এবং ধোয়ীর রচনায় যে গুণ পৃথক পৃথক ভাবে বর্ত্তমান ছিল, জয়দেবের রচনায় একাধারে তাহা বর্ত্তমান আছে,—ইহা দেখাইবার জন্যই তিনি পদাবলী ও শ্লোকগুলির একত্র সমাবেশ করিয়াছিলেন। শ্লোকগুলি না থাকিলে পদাবলীর অর্থবোধে কোনো ব্যাঘাত ঘটিত কি না,—ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর তাহা নির্ভর করে না। সেকালে হয় ত এইরূপই রীতি ছিল; অথবা এইরূপ শ্লোক না থাকিলে সেকালে গীতিকাব্যের অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটিত, এমনও হইতে পারে। আমাদের এরূপ অনুমানের কারণ, জয়দেবের সময়ের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এবং দেড়শত বৎসরের মধ্যে গীতগোবিন্দের যে দুইখানি টীকা রচিত হইয়াছে, তাহাতে পদাবলী ও শ্লোকগুলি সহ সম্পূর্ণ কাব্যেরই ব্যাখ্যা আছে। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একখানি কাব্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক প্রবেশলাভ করিয়াছে—ইহা

কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ পর্য্যন্ত গীত-গোবিন্দের যে কয়েকখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে, কাহারো কাহারো মতে, "নারদীপিকা" টীকা সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার রচয়িতার নাম "জগৎহরি"। মেবারের রাণা কুম্ভ রচিত "রসিক প্রিয়া" টীকা—জয়দেবের দেড়শত বৎসর পরে রচিত। এতদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্র কৃত "রসিক মঞ্জরী", পূজারী গোস্বামী-রচিত "বালবোধিনী", কৃষ্ণদাস প্রণীত "গঙ্গা" এবং নারায়ণ কবিরাজ-বিরচিত "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী" টীকাও নিতান্ত আধুনিক নহে। ইহার সকল গুলিতেই বর্ত্তমানে প্রচলিত গীত-গোবিন্দের সমস্ত শ্লোকই (গান ও কবিতা) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তবে "রসিক প্রিয়ার" সঙ্গে "বালবোধিনীর" কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে; টীকাকার পূজারী গোস্বামী

"ভজন্ত্যা স্তল্পান্তং * *
* * * * *
* * * * *
* * * দূর মৃগদৃশঃ"

একাদশ সর্গের শেষ ভাগে এই যে দ্বিতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "রসিক প্রিয়া"কার তাহার পরে—

সানন্দং নন্দ সূনু দিশতুমিতিং পরং সংমদং মন্দ মন্দং।
রাধামাধায় বাহ্বোর্ব্বিবর মনুদৃঢ়ং পীড়য়ন্ প্রীতিযোগাৎ।
তুঙ্গৌ তস্যা উরোজা বতনু বরতনো নির্গতো মাস্মভূতাং
পৃষ্ঠ নিভিন্ন তস্মাদ্ধরিতি বলিত গ্রীব মালোকয়ন্ বঃ॥

এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা দিয়াছেন। পূজারী গোস্বামীর একাদশ সর্গ শেষ হইয়াছে—

"জয়শ্রী বিনতৈঃ * *
* * *
* * *
* * * * ভুজদণ্ডো সুরজিতঃ"

এই তৃতীয় শ্লোকটীর ব্যাখ্যায়; রসিকপ্রিয়াকার তাহার পর এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন.—

সৌন্দর্য্যৈক নিধেরনঙ্গ ললনা লাবন্য লীলা পুষো,
রাধায়া হৃদি পল্লবে মনসিতা ক্রীড়ৈক রঙ্গস্থলে।
রম্যোরোজ সরোজ খেলন রসিত্যাদাত্মনঃ খ্যাপয়ন্।
ধ্যাতুর্মানস রাজহংস নিভৃতাং দেয়াম্মুকুন্দোমুদং॥

দ্বাদশ সর্গের—সর্গ সমাপ্তি সূচক—

"ত্বামপ্রাপ্য * * * *
* * * *
* * * *
* * * * হরিঃ পাতু বঃ॥"

এই তৃতীয় শ্লোকটী বালবোধিনীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, কিন্তু মেবারপতি এই শ্লোকটী গ্রহণ করেন নাই। কাব্য শেষে "শ্রীভোজদেব প্রভবস্য" শ্লোকের ব্যাখ্যায় যেখানে পূজারী গোস্বামী সর্গ শেষ করিয়াছেন, রাণা কুম্ভ তাহার পরেও—

"ইথং কেলী ততী বিহৃত্য যমুনাকুলে সমং রাধয়া,
তদ্রোমাবলী মৌক্তিকাবলী যুগে বেণীভ্রমং বিভ্রতী।
তত্রাহ্লাদী কুচ প্রয়াগ ফলয়োর্লিপ্সা যতোর্হন্যয়ো,
ব্যাপারাঃ পুরুষোত্তমস্য দদতু স্ফীতামুদাং সম্পদং॥

এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবশ্য ইহা হইতে এমন প্রমাণিত হয় না যে, গীতগোবিন্দের সংগীত ভিন্ন অপর সমস্ত শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত! তবে রসিক-প্রিয়াকার তাঁহার ব্যাখ্যাত ঐ "বারটী চরণ" কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন, সে বিষয়ে একটা অনুসন্ধান হওয়া উচিত। আশা করি, বৈষ্ণব-শাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

জয়দেব-চরিত্র-প্রণেতা বনমালী দাস একটী গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার সহিত এ বিষয়টীর কোনো সম্বন্ধ আছে কি না, তাহাও বিচার্য্য। বনমালী দাস লিখিয়াছেন—শ্রীগীতগোবিন্দের প্রসিদ্ধি দেখিয়া শ্রীক্ষেত্রের তদানীন্তন অধীশ্বরের মনে এইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রণয়নের বাসনা বলবতী হয়। তিনি একখানি অভিনব গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বত্র তাহা গীত হইবার আদেশ দান করেন। পাত্রমিত্রগণ ইহাতে আপত্তি করিলে পরীক্ষা মানসে দুইখানি গীতগোবিন্দই প্রভু-সান্নিধ্যে রাখিয়া শ্রীমন্দির বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখা গেল, শ্রীজগন্নাথদেব কবিরাজ-প্রণীত গ্রন্থ বক্ষে ধারণ করিয়া, পুরীরাজ-প্রণীত গ্রন্থ পদতলে রাখিয়া দিয়াছেন। অভিমানী পুরীরাজ এজন্য আত্মহত্যার কামনা করিলে—দৈববাণী হইল—

"জয়দেব কৃত গ্রন্থ দ্বাদশ যে সর্গে
তব কৃত বার শ্লোক থাকিবেক অগ্রে"

কেহ কেহ বলেন, রসিক-প্রিয়ায় গৃহীত উক্ত তিনটী শ্লোকের বারটী চরণ উপরি উদ্ধৃত প্রবাদের সমর্থন করিতেছে। বনমালী দাসের পয়ার দুইটীর অর্থ ঠিক্ বুঝা যায় না। "জয়দেবের দ্বাদশ সর্গে বিভক্ত কাব্যে তোমার কৃত বার শ্লোক অগ্রে থাকিবে, অথবা দ্বাদশ সর্গেই বারশ্লোক অগ্রে থাকিবে? এই অগ্র শব্দের অর্থ শেষ না প্রথম?" সমস্তই রহস্য জড়িত, এবং এই পয়ার দুইটীর উপর নির্ভর করিয়া প্রক্ষিপ্ত শ্লোক নির্ব্বাচন করিতে যাওয়া আমরা পণ্ডশ্রম বলিয়াই মনে করি। আমাদের বিশ্বাস, সংগীত ও শ্লোকসহ সমস্ত গ্রন্থখানিই জয়দেবের রচিত, এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত সংস্করণখানিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য; কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ পুনঃ পুনঃ আলোচিত হইয়াছিল। বালবোধিনী টীকা তাহার অনতিকাল পরেই রচিত। পূজারী গোস্বামী শ্রীধাম বৃন্দাবনে পূজ্যপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতির সান্নিধ্যে এই টীকা রচনা করিয়াছিলেন। পূজারী গোস্বামীর পরিচয় পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

দ্বন্দ্ব

শ্রীসরোজকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায়

(৯)

অরুণের ডায়েরী হইতে—

প্রবল ঝড়ের পরে বিক্ষোভিত মথিত উন্মত্ত বিশ্ব-প্রকৃতি যেমন আবার ধীরে ধীরে শান্ত স্থির হয়ে আসে, সেদিনের সেই প্রচণ্ড অন্তর্বিপ্লবের পরে আজ দারুণ অবসাদে আমার এ উন্মত্ত বিদ্রোহী হৃদয় যেন ছিন্নমূল তরুর মত মাটিতে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। যতক্ষণ সংসারে মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষার কণামাত্রও অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ তার সবই থাকে। সেই ক্ষীণ আশার রেখাটুকুই তাকে তার সব সর্ব্বনাশের পরেও বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু যার সেই শেষ রেখাটুকুও মুছে গেছে, যার আর কোন দিকে কোন অবলম্বন না থাকে, সে আর সংসারে কোন্ সুখে কোন্ আশায় বেঁচে থাকবে? আমার আজ ঠিক সেই অবস্থা। সংসারে আজ আমাকে কারও প্রয়োজন নেই, আমারো ভবের হাটে এবারের মত সব দেনা-পাওনা শেষ হয়ে গেছে। আজ আমার জীবনে আশা নেই, মরণে সুখ নেই, তবু আশ্চর্য্যের কথা এই—এখনো আমি আছি। বাঁচবার কোন দরকার ছিল না, তবু বেঁচে আছি। শুধু তাই নয়—এখনো বসে বসে সুখ-দুঃখের বিশ্লেষণ করছি!

নিজের কথা ভাবতে গেলে, থেকে-থেকে কেবল সেই ভীষণ দিনটার কথাই আমার মনে হয়! সে-দিনকার সে যুদ্ধের কথা কোন দিন ভোলবার নয়! প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের জয়ের আশা সন্নিকটবর্ত্তী হয়ে আসছে, জগতে চির-পদদলিত অধম বাঙ্গালীর বীরত্বে, শৌর্য্যে-বীর্য্যে অপরাজেয় জার্ম্মাণ সৈন্য অধীর চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা যত পিছনে হটছে, আমাদের উৎসাহ, শক্তি ও সাহস তত যেন দুর্জ্জয় হয়ে উঠছে! সেদিন আমার কোন জ্ঞান চৈতন্য ছিল না; মনে হচ্ছিল—আজ নিজেদের রক্ত ও জীবন দিয়ে এই রণক্ষেত্রে বাঙালীর ভীরুতার চির-অপবাদ ক্ষালন করবো! এগিয়ে চল! এগিয়ে চল! কোন দিক দেখবার দরকার নেই, কিছু ভাববার নেই—এগোও! কেবল এগোও! সেদিন সে কি অপূর্ব্ব উন্মাদনা! প্রাণ দেবার সে কি তীব্র বিপুল আনন্দ!

সেই বিচিত্র উত্তেজনার মধ্যে আমার নিজের রেজিমেণ্ট নিয়ে আমি কতদূর এগিয়ে গেছি, তা আমি নিজেই জানি না—অকস্মাৎ পিছন থেকে একটা তীব্র মধুর স্বর শুনতে পেলুম,—লেফটেন্যাণ্ট্! লেফটেন্যাণ্ট্ ঘোষাল!

তখন আর ফিরে দেখবার সময় ছিল না; কিন্তু আর বেশী দূর যেতেও হলো না। ভীষণ বজ্রনাদের মত ভয়াবহ শব্দে সামনেই একটা কামানের গোলা ফেটে চারিদিকে

ছড়িয়ে পড়ল,—আমার চারিদিকে হত-আহতদের তীব্র আর্ত্তনাদে সহসা দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ হয়ে উঠলো,—মাথার ভিতর একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগে সেইখানে আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

যখন আমার জ্ঞান হলো, দেখলুম, আমার মাথা থেকে চোখ পর্য্যন্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা,—কিছু বুঝতে পারলুম না। ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে পারলুম না,—সর্ব্ব-শরীরে দারুণ বেদনা। কি করব ভাবছি—এমন সময়ে আমার পাশ থেকে কে বল্লে,—এই যে! তুমি জেগেছ দেখছি! কিন্তু এখন নড়বার চেষ্টা কোর না—স্থির হয়ে থাক।

সে স্বর আমার পরিচিত। আমি বল্লুম,—কে? লিজি না কি?—হাঁ! আমি! কিন্তু তুমি বেশি কথা বলো না, ডাক্তার বারণ করেছেন।—আমি বল্লুম, আমার কি হয়েছে? তোমরা আমায় হাসপাতালে এনেছ না কি?—লিজি বল্লে, তুমি বড় আহত হয়েছ, তোমার মাথায় ও চোখের স্নায়ুতে গোলার 'শক' লেগেছে। ডাক্তার বলেছেন, এখন কিছু দিন তোমায় খুব সাবধানে ও স্থিরভাবে থাকতে হবে। আমি তোমার কাছে কাছেই আছি। কিন্তু তুমি আর কথা না বলে ঘুমোও।

ওঃ! আমি তা হলে আহত! মনটা কেমন মুষড়ে গেল—কত দিন এখন জড়পদার্থের মত এখানে পড়ে থাকতে হবে! আমি একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লুম, তা হলে এখন আমি কিছুদিনের মত তোমার চার্জে এই হাসপাতালে পড়ে থাকবো, কেমন?

"আবার? তুমি ত বড় অবাধ্য রোগী দেখছি! কি বল্লুম—এতক্ষণ ধরে?" এলিজাবেথ শাসন ছলে এই কথা বলে তার ফুলের মত নরম হাতখানি আমার মুখের ওপর চেপে ধরলে।

আমি তার হাতটা সরিয়ে বুকের ওপর চেপে রাখলুম। বল্লুম, আর একটি কথা লিজি! সেই কথাটা হয়ে গেলেই আমি চুপ করে ঘুমিয়ে পড়বো, সত্যি বলছি। আমি শুধু জানতে চাই, সেদিনকার যুদ্ধের ফলটা কি হলো?

—"ওঃ! সেদিন তোমাদেরি জিত হয়েছে! জার্ম্মানরা সে যায়গাটা ছেড়ে পালিয়েছে। সে স্থান এখন আমাদের হাতে। কিন্তু সেদিন অনেক লোক মারা গিয়েছে,—আহতের সংখ্যাও অত্যন্ত বেশি।"

বুকটা যেন আনন্দে ফুলে উঠলো! সেদিনকার সব পরিশ্রম সার্থক হয়েছে তা হলে? আমি বল্লুম, ধন্যবাদ! এই খবরটা জেনে মন বড় সুস্থ হল। ভাল কথা, আমার এখন মনে হচ্ছে, সেদিন আমি আহত হবার আগে, আমার কে পিছন থেকে সাবধান করে দিচ্ছিল—সে কি তুমি? তুমি সেখানে কি করছিলে তখন? লিজি বল্লে, আমরা ত ঠিক তোমাদের পিছনেই ছিলুম! বলেছি ত—সেদিন হতাহতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হয়েছিল, কাজেই আমাদের কাজও বড় বেড়ে গিয়েছিল। তুমি আগে লক্ষ্য কর নি, কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম, গোলাটা কাছাকাছি এসে পড়েছে। সাবধান হবার কোন উপায় নেই তা বুঝি—তবু দারুণ আতঙ্কে অভিভূত হয়ে, আমি হঠাৎ তোমার নাম ধরে, চীৎকার করে উঠলুম! ওঃ! কি ভয় আমি সেদিন পেয়েছি যে! আমার মনে হচ্ছিল, বুঝি তোমায় একবারেই হারিয়েছি! শেষ যখন ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লে তুমি শুধু আহত হয়েছ, তখন আমি নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। —লিজি তার কথা শেষ করে দুই হাতে আমার ডান হাতটা জড়িয়ে ধরলে।

তার অন্তরের এই নিঃস্বার্থ ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে আমি বল্লুম,—লিজি! আমার প্রতি তোমার এ পবিত্র স্নেহের কোথাও তুলনা নেই।

লিজির হাতের সুকোমল আবেষ্টনটিতে আমি তার অন্তরের নিবিড় স্নেহের স্পর্শ অনুভব করতে করতে সেদিন ঘুমিয়ে পড়লুম।

দেশে থাকতে যে ছোট গণ্ডীটুকুর মধ্যে বাস করতুম, তার সীমার বাইরে উদার উন্মুক্ত জগতের মাঝে এসে যেদিন দাঁড়ালুম, সেদিন সহসা যেন চোখের ওপর থেকে একটা পর্দ্দা খসে গেছে—এই রকম মনে হল।

নতুন জীবন—নতুন দৃষ্টি—অফুরন্ত প্রাণ! চারিদিকে যা দেখছি—সে সবও যেন অতীতের কঙ্কালের ওপর নব নব রূপ পরিগ্রহ করে চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে! সে সব আমার আগেকার সীমাবদ্ধ জ্ঞান, সংস্কার ও জড়তার অন্ধ ধারণার সঙ্গে কোথাও খাপ খায় না।

মনে হত—চারিদিকে অবাধ উন্মুক্ত জীবনের স্রোত উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে—কর্ম্ম, জ্ঞান, শক্তির অনন্ত

প্রবাহ—সকলে চঞ্চল—ব্যস্ত—নিজের নিজের কাজে—অবিরাম ছুটেছে!

এই কর্ম্মমুখর জীব-জগতের পাশে কল্পনায় আমাদের সনাতন ভারতবর্ষকে আমার মনে হত, যেন সে বহু দিনের প্রাচীন অহিফেন-সেবীর মত নেশায় জড় হয়ে ঝিমোচ্ছে, ও এক-একবার মাথা তুলে—'ব্রহ্ম সত্য—জগৎ মিথ্যা' "কা তব কান্তা" জপ করছে—আবার নেশার ঘোরে তার মাথা ঝিমিয়ে পড়ছে।

আমার এই নতুন জগতে সবই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সুন্দর, কিন্তু সব চেয়ে যে বস্তু আমার চোখে অপূর্ব্ব মহিমায়, গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে আমায় মুগ্ধ করে তুলেছিল—সে হচ্ছে—সে দেশের নারী।

নারী যে কত বড় হতে পারে,—শিক্ষায়, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে নারী যে কত উৎকর্ষ লাভ করে, ঠিক পুরুষের মতই কর্ম্মক্ষেত্রে তার পাশে দাঁড়িয়ে তার সাহস ও শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে,—এ আমি এদের দেখে মর্ম্মে-মর্ম্মে বুঝেছি—ও সেই সঙ্গে নিজেদের দেশের মেয়েদের জন্য অনুভব করে' মন আমার লজ্জা ও ধিক্কারে ভরে গেছে! পুঁথি-পত্রে, রচনায়, শাস্ত্রে তাদের গৌরবের অন্ত নেই—কিন্তু যথার্থ জীবন থেকে তারা আজ কত দূরে!

এখানে যেসব মেয়েদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে—তাঁরা সকলেই ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা—ইংরাজ, ফরাসী, আর্কিন, রুষিয়ান্—সব দেশীয়া নারীই আছেন। দেশে থাকতে শুনতে পেতুম—ও দেশের মেয়েরা অত্যন্ত অলস ও বিলাসিনী,—তারা ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়,—শুধু প্রজাপতির মত আমোদ-আহ্লাদ, বিলাস-ব্যসন নিয়েই তারা ব্যস্ত,—বাস্তব জীবনের দুঃখ-কষ্টের ভিতর না কি এই প্রজাপতির দল ভিড়তে চায় না। এখানে এসে আমার এত দিনের সে ধারণা একেবারে বদলে গেছে।

যে দিন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে ডাক পড়লো, সে দিন তাদের সুখশান্তি-পূর্ণ, নিশ্চিন্ত-আরামে-ভরা ঘর ছেড়ে এই সব মেয়েরা এই ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের মতই সহজে হাসি-মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এখানকার জীবনের নানা অসুবিধা, অভাব, অস্বাচ্ছন্দ্য কিছুই তাদের এ কর্ত্তব্যের আহ্বান থেকে দূরে রাখতে পারেনি। তারা জানে—শুধু অন্তঃপুরই নারীর কর্ম্মক্ষেত্র নয়, জগতের কাজেও পুরুষের মতই তারও প্রয়োজন আছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণতা—চারিদিকের মৃত্যুযন্ত্রণাপূর্ণ আর্ত্তনাদ—অবিরল বারুদ ও ধূমে আচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় স্থানে প্রাণের ভয় অগ্রাহ্য করে, এরা পরম যত্নে আহতদের তুলে নিয়ে আসছে। তার পর সে কি সেবা—কি মমতা—এই সব দুর্ভাগ্য আহতদের না দেখলে শুধু কথায় বোঝান যায় না! এদের কাজ, এদের প্রকৃতি যতই আমি দেখেছি—ততই আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে গেছে।

আমার সহকারী সেন বলে একটি ছেলের সেবার পায়ের ভিতর গুলি ঢুকে গিয়েছিল। তার পা অস্ত্র করে সে গুলি বের করবার ফলে তাকে বেশ কিছু দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। আমি যখন তাকে দেখতে যেতুম, সেই সময় লিজির সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে সেই পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতায় পরিণত হয়।

সেন যেদিন হাসপাতালে যায়, তার পরে দু'তিন দিন আমি নানা কাযে ব্যস্ত থাকায়, তাকে দেখতে যাবার সময় করতে পারিনি। যে দিন প্রথম তার কাছে গেলুম, তখন সে একটু ভাল আছে,—তার মাথার কাছে একটা চৌকি পেতে লিজি বসে তার সঙ্গে গল্প করছিল।

সেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিতে, সে প্রথমে তার সুনীল চোখের বিস্মিত দৃষ্টি আমার মুখের উপর তুলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তার পরে একটু মধুর হেসে, হাত বাড়িয়ে বল্লে, সেনের সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। তার বন্ধুরা সকলেই নির্ব্বিচারে আমার বন্ধু।

আমি তার করমর্দ্দন করে বসলুম। তিনজনে অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজব করা গেল। লিজি তার অন্যান্য রোগীদের দেখতে উঠে গেলে আমি সেনকে বল্লুম, এখানে কেমন আছ? সেবা-যত্ন রীতিমত হচ্ছে ত? না—যেমন হাসপাতালে গোলে-হরিবোল কাণ্ড হয়ে থাকে, তেমনি?

সেন একটু হেসে বল্লে, নিজেদের দেশের হাসপাতাল দেখে-দেখে আমাদের এমনিই ধারণা হয়েছে বটে। এখানে সে রকম কিছু নয়। কোন কষ্ট বা অভাব নেই—আর সেবার কথা আর কি বলবো! এখানকার নর্সদের কাছে যে রকম সেবা পাচ্ছি, বোধ হয় নিজের মা বোন থাকলে এমন সেবা হয় না। বিশেষ ঐ যে মেয়েটি এখান থেকে

উঠে গেল, ও যে কি মমতাময়ী—কি করে বল্লে যে ওর সব কথা ঠিক বোঝান যায়—তা আমি ভেবেই পাই না। ও এ কয় দিন আমায় এত যত্ন করছে—

আমি হেসে বল্লুম, তুই যে একেবারে নর্সের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলি! দেখিস্—যুদ্ধ করতে এসে যেন কিছু গোলযোগ বাধাস নি!

সেন গম্ভীর মুখে বল্লে, না ভাই অরুণ! ওদের সম্বন্ধে ও রকম কথা বলা চলবে না; সত্যি, কি উঁচু এদের মন! আর যাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই, সেই সব ভিন্নদেশী ভিন্নভাষী মানুষের জন্য এদের কি বুকভরা মমতা! আমি যখন যন্ত্রণায় গোঙাতুম,—ওর চোখে মুখে এমন তীব্র বেদনার চিহ্ন জেগে উঠতো,—আমি দেখে অবাক্ হয়ে যেতুম! খুব তীব্র ভাবে অনুভব না করলে, মানুষের এমন রূপান্তর হতে পারে না। আমাদের পোড়া দেশে নারীর দেবত্ব, মমতা, ভালবাসা সবই পুঁথিগত হয়ে রইলো,—জগৎ তার কোন সন্ধানই পেলে না। তাই বলছি—এদের ভালবাসবার কথা আমার মনেই ওঠে না—এরা তার চেয়ে অনেক উচ্চে! আমি শুধু ওদের শ্রদ্ধা করতে পারি—ভক্তি করতে পারি! তার পর থেকে আমি সময় পেলে সেনকে দেখতে যেতুম। লিজির সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

ক্রমে সেন সুস্থ হয়ে আবার কাজে যোগ দিলে; কিন্তু লিজি সময় পেলে আমার সঙ্গে দেখা করতো। আমরা দু'জনে সন্ধ্যাটা প্রায়ই একসঙ্গে কাটাতুম। তার সঙ্গ—তার সাহচর্য্য আমার স্বল্প অবসরটুকু রমণীয় করে তুলতো।

ক্রমশঃ আমার মনে একটা সন্দেহের ছায়া জেগে উঠতে লাগলো। কিছু দিন থেকে আমার মনে হচ্ছিল,—লিজি যেন আমার সম্বন্ধে সাধারণ বন্ধুত্বের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বীণার চিন্তায় আমার সমস্ত চিত্ত ভরে আছে,—তার রূপ সর্ব্বক্ষণ আমার অন্তরে বাহিরে জাগ্রত রয়েছে,—আমার মনে আর কারো জন্যে তিলমাত্র স্থান ছিল না,—আমি লিজির জন্য চিন্তিত হয়ে পড়লুম।

লিজির মত মেয়ের ভালবাসা পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা—সে আমি বুঝি। বীণার চেয়ে তুলনায় সে অনেকাংশে হয় ত উচ্চও হতে পারে—কিন্তু তাতে কি? যোগ্য অযোগ্য বিচার করে ত মানুষ ভালবাসতে পারে না। যাকে তার ভাল লাগে, সে তাকেই ভালবাসে। আমার মন বীণার প্রেমে মুগ্ধ,—আত্মহারা। লিজির জন্যে আমার মনের কোথাও স্থান নেই। তাই সময় সময় আমার মনে হত,—যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তবে লিজি বেচারা অনর্থক কি দুঃখ পাবে।

এক দিন আমরা দু'জনে একটা হ্রদের ধারে বসে ছিলুম। এ বায়গাটার কাছে একবার যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে,—স্থানটা এখন ফরাসীদের হাতে। আশে পাশে ধ্বংসের মূর্ত্তিমান চিহ্ন তখনো বেশ পরিস্ফুট,—চারিদিকের বাড়ী-ঘর দোর ভেঙ্গে চুরে স্তূপের মত এখানে ওখানে জড় হয়ে আছে। সুন্দর বিস্তৃত প্রান্তর ধূ ধূ করছে—জনমানবের বসতির চিহ্ন মাত্রও নেই। এক সময় যেখানে কলরবময় মানুষের আবাস ছিল, এখন সে স্থান শূন্য শ্মশানের মত পড়ে আছে। যত দূর দৃষ্টি যায়—নির্জ্জন—নিস্তব্ধ। হ্রদের স্থির জলে তীরের একটা অর্দ্ধভগ্ন গীর্জ্জার ছায়া পড়ে, মৃদু বাতাসে জলের বুকে নানা ছন্দে নানা রেখার জাল বুনছিলো।

লিজি অনেকক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। থেকে থেকে সে বল্লে, তোমাকে দেখলে কিন্তু ইণ্ডিয়ান্ বলে মনে হয় না।

আমি সকৌতুকে হেসে বল্লুম, কেন—বল ত? হঠাৎ এ কথাটা যে মনে উঠলো?

সে তার সুনীল সাগরজলের মত স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপর স্থির রেখে বল্লে, হঠাৎ নয়—এ কথাটা প্রায়ই আমার মনে হয়। তোমার হয় ত মনে থাকতে পারে, প্রথম আমি যেদিন তোমায় দেখি—সেদিন তোমার তার দেশের লোক ও বন্ধু বলে পরিচয় করে দিতে, আমি অবাক হয়ে চেয়ে ছিলুম! তুমি দেখতে বড়ই সুন্দর তাদের চেয়ে, সত্যিই বলছি—ভারি সুন্দর তুমি! তার চোখে মুখে কি মনোহর একটা আলো জ্যোতির মত তখন ফুটে উঠেছিল—আমি হঠাৎ কি বোলবো বুঝতে পারলুম না। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে গেল।

সে আমার সামনে বসে ছিল। বেশভূষার কোন আড়ম্বর ছিল না। একটি পরিচ্ছন্ন সাদা পোষাক। সোণালি চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে অনাবৃত তুষার-শুভ্র কাঁধের ওপর থেকে পিঠে লতিয়ে পড়েছে। পশ্চিম আকাশ থেকে একটি রক্তিম রশ্মি তার মুখে পড়েছিল—কি অপূর্ব্ব সুন্দরী

স! আমি মুগ্ধনেত্রে তাকে দেখতে দেখতে বল্লুম, সে কথা বরং তোমার সম্বন্ধেই বলা যেতে পারে! তোমার মত এত সুন্দর আমি আর কোথাও দেখি নি!

আমি এ কথা বলতেই, তার সমস্ত মুখ ঘোর আরক্ত হয়ে উঠলো। আর কোন দিন আমি এমন আত্মবিস্মৃত হয়ে তার রূপের প্রশংসা করি নি। সে আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলে না। তার অন্তরের অগাধ প্রেমে ও ভালবাসায় পূর্ণ চোখ দুটি তুলে—সে মৃদুস্বরে বল্লে, এ কি সত্যি কথা—ঘোষাল? সত্যিই কি—আমাকে তোমার এত সুন্দর বলে মনে হয়? কথা শেষ করেই সে আমার হাতটা আবেগভরে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলে। ব্যাপার দেখে আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলুম। কিন্তু এ যে কত বড় অন্যায় হচ্ছে, সে কথা মনে হতে আমি তখনি নিজেকে সামলে নিয়ে খুব সহজ ভাবেই বল্লুম, সত্যিই বলছি—লিজি! আমি তোমার মত এত সুন্দর আর কোথাও দেখি নি—অবশ্য—একজন ছাড়া—আমার বাগ্দত্তা পত্নী—তার কথা তোমায় বলি নি—বোধ হয়—সেও ঠিক এমনিই সুন্দর দেখতে!

লিজির মুখ হঠাৎ মড়ার মত সাদা হয়ে গেল। অত্যন্ত চমকে উঠে, আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে বলে উঠলো, তোমার বাগ্দত্তা পত্নী? তুমি এন্‌গেজড্ তা হলে? এ কথা এত দিন ত বল নি?

আমি অপরাধীর মত নিস্তব্ধ হয়ে রইলুম। সেও মুখ ফিরিয়ে জান্লা গীর্জাটার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বহুক্ষণ নিস্পন্দ বসে রইলো। আমি যে তাকে কত বড় আঘাত দিয়েছি, আর সে যে নিঃশব্দে কি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করছে, সে সবই আমি নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারছিলুম,—তাকে কিছু বলবার আমার সাহস ছিল না।

দিনের স্বল্পাবশেষ আলোটুকু মিলিয়ে ক্রমে সন্ধ্যার আঁধারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে এলো। আকাশে দু' একটি তারা ফুটে উঠে, স্তিমিত দৃষ্টিতে হ্রদের তটে উপবিষ্ট এই দুই স্তব্ধ প্রাণীর দিকে চেয়ে রইলো। আমরা দুজনেই তেম্নিই বসে রইলুম।

বহুক্ষণ পরে এলিজাবেথ একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে মুখ ফিরালে। আমি চেয়ে দেখলুম, সে মুখ তখন পূর্ব্বের মতই স্থির ও গম্ভীর,—মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রেম ও অনুরাগের প্রবল উচ্ছ্বাসে যে মুখ পুলকাবেশে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, এখন আর তার কোন চিহ্ন ছিল না।

সে স্থির কণ্ঠে বল্লে, তোমার সঙ্গে আলাপ হবার পর থেকে তোমাকে আমি অত্যন্ত ভালবেসেছিলুম—এ কথা আর অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এর পরে আর কোন কথা চলতে পারে না। যাক্—আমি সে জন্যে দুঃখিত নই। মানুষের জীবনে নানা দিক আছে। এক দিক রুদ্ধ হলেও, অন্যান্য দিক থেকেও সে সার্থকতা লাভ করতে পারে। তোমার স্ত্রী নিশ্চয়ই সব দিক থেকে তোমার উপযুক্ত হবেন? তুমি কিছু মনে করো না, আমি বন্ধু ভাবে জিজ্ঞেস করছি। আমরা এখান থেকে শুনি কি না—তোমাদের দেশের মেয়েরা অত্যন্ত পিছিয়ে আছে?

আমি বল্লুম, তিনি সেখানকার হাইকোর্টের জজের মেয়ে। লণ্ডনে সাত আট বছর থেকে, আধুনিক সর্ব্ব রকম শিক্ষায় শিক্ষিত হ'য়ে, সম্প্রতি দেশে ফিরে গেছেন।

লিজি শুনে বল্লে, আমি বড় সুখী হলুম। প্রার্থনা করি, তোমাদের বিবাহিত জীবন সুখের হোক। যখন তুমি দেশে ফিরে যাবে, আমার কথা তাঁকে বোলো—আমার শুভ ইচ্ছা তাঁকে জানিও। তার পর সে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে, আর আমরা দুজনে ঠিক আগের মতই পরস্পরের বন্ধু—কেমন?

আমি সাগ্রহে প্রসারিত হাতখানি ধরে বল্লুম, অন্তর্যামী জানেন—এর চেয়ে সুখের বিষয় আমার আর কিছু নেই।

তার পর থেকে তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ আগের চেয়ে কমে এসেছিল। তবু মাঝে মাঝে অনেক অপরাহ্ণ আমরা একত্র কাটাতুম। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই আমি আহত হয়ে হাসপাতালে এলুম।

আমার চিকিৎসা বেশ ভাল ভাবেই চলছিল। সুচিকিৎসা ও লিজির সেবার গুণে শীঘ্রই আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম—আমার দুর্ব্বলতা ও শরীরের গ্লানি সবই সেরে গেল। শুধু আমার চোখের ব্যাণ্ডেজ তখনো খোলা হল না।

লিজি প্রাণ ঢেলে দিয়ে আমার সেবা করত। তার সমস্ত অবসর সময়টুকু সে বিশ্রাম না করে আমার কাছেই কাটাত। গল্প করে, সেবা করে, বই পড়ে শুনিয়ে আমায় প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করতো। কিন্তু তবু আমার

যেন মনে হত, সে বুঝি সর্ব্বক্ষণ কি একটা প্রচ্ছন্ন বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে,—কথা বলতে বলতে সে কেমন যেন ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে! আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে, যেন অশ্রু সম্বরণ করতে উঠে যায়! আমি তার এ ভাবান্তরের কারণ কিছু বুঝতে পারতুম না।

এমনি করে প্রায় তিন হপ্তা কেটে গেল। সুস্থ সবল শরীরে এমন করে পড়ে থাকতে ক্রমেই আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলুম। প্রতি দিনই এ জন্যে ডাক্তারকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতুম। কত দিন যে বীণাকে চিঠি লেখা হয় নি—সে হয় ত এত দেরি দেখে উদ্বেগে আশঙ্কায় আকুল হয়ে উঠেছে। রোগ-শয্যায় পড়ে পড়ে আরো বেশি করে কেবল তার কথাই আমার মনে হতো। সন্ধ্যার সময়ে আমি মনে মনে সুদূর পাটনা নগরের এক প্রান্তে মিঃ রায়ের সুরম্য বাসভবনটি প্রায়ই কল্পনায় দেখতে পেতুম। সেখানকার বিস্তৃত টেনিস্ ক্ষেত্রে বীণা, কিরণ, নির্ম্মলা, চৌধুরী সবাই মিলে খেলা করছে! বীণার মুখ ঈষৎ ম্লান, বিষণ্ণ,—সে যে কত দিন আমার কোন সংবাদ পায় নি! এই দারুণ জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষেত্রে যে তার প্রিয়কে ছেড়ে দিয়ে, একটু পত্রের আশায় পথের দিকে উন্মুখ হয়ে চেয়ে থাকে, তার পক্ষে এত বিলম্ব যে কতখানি উদ্বেগ, কত আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে, সেটা উপলব্ধি করে আমি একেবারে অধীর চঞ্চল হয়ে উঠতুম,—মন আমার উধাও হয়ে সেই দূর সমুদ্র পার হয়ে বীণার পাশে ছুটে আসবার জন্যে পাগল হয়ে উঠতো,—ফরাসী-দেশের শত সেবা-যত্ন, লিজির প্রাণঢালা নিঃস্বার্থ ভালবাসা, কিছুই আমায় সেখানে বাঁধতে পারতো না,—আমি তখন কেবল অধীর হয়ে ভাবতুম, কত দিনে এরা আমায় মুক্তি দেবে?

যা হোক, সংসারে সব জিনিসেরই শেষ আছে, আমারও এক দিন মুক্তির আদেশ এলো। কিন্তু সে একেবারে অতর্কিত বজ্রাঘাতের মত!

সে দিন সকালে ডাক্তার এসে যথারীতি পরীক্ষাদির পর বল্লেন, লেফটেন্যানট্ ঘোষাল! তোমাকে আজ বলবার একটা বিষয় আছে। তুমি এখান থেকে যাবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। আমি এখন দেখছি, আর তোমাকে এখানে আঁটকে রাখবার কোন দরকার নেই। কাল তুমি এখান থেকে মুক্তি পাবে।

আমি মুক্তির আশায় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলুম। এত দিন পরে তবে আবার সেই আগেকার মুক্ত আনন্দময় জীবন! বলুন, ধন্যবাদ! শত শত ধন্যবাদ আপনাকে! এই মুক্তিটুকু পাবার জন্যে আমি যে কত দিন থেকে ব্যাকুল হয়ে রয়েছি—তা আপনি বুঝতে পারবেন না। চোখটা এত দিনে সেরে গেছে তা হলে? আজ কি তা হলে আমার ব্যাণ্ডেজটা খুলে দেবেন?

ডাক্তার একটু চুপ করে থেকে বল্লেন, ব্যাণ্ডেজটা রাখবার আর দরকার নেই,—তোমার নস কে বলে যাচ্ছি, সেই ওটা খুলে দেবে। তবে হাঁ—চোখের কথা! তা ঐখানে একটু গোলযোগ হয়েছে—কিন্তু সেফ্‌টেন্যাণ্ট্! কথাটা তোমাকে খুলে বলাই ভাল,—তুমি বীর সৈনিক পুরুষ,—আশা করি, সৈনিকের মতই এ আঘাতটা গ্রহণ করবে!

আমি চমকে উঠলুম! এত ভূমিকা কিসের—আমার হয়েছে কি? আতঙ্কে রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলুম, ডাক্তার! এ কি বোলছো তুমি? আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না! স্পষ্ট করে বল—আমার হয়েছে কি?

ডাক্তার বল্লেন, অর্থাৎ তোমার মাথায় সেই যে গোলার 'শক্' লেগেছিল,—মনে আছে ত? তাতেই—চোখের যে দৃষ্টি-বহা স্নায়ু—যার জন্যে আমরা সব জিনিস দেখতে পাই—সেইটা আক্রান্ত হয়েছে। আমাদের যতদূর সাধ্য, আমরা চেষ্টা করে দেখলুম—বিশেষ ফল হল না। চোখের কোন স্পেশ্যাল চিকিৎসার ব্যবস্থাও নেই এখানে। তাই আমরা স্থির করেছি—তুমি কাল বম্বে চলে যাও। সেখানে সব রকম ব্যবস্থা আছে। সেখানকার বড় মেডিকেল বোর্ড—তোমার সম্বন্ধে যা করা দরকার—সবই করবেন। আমরা এখান থেকে সে ব্যবস্থা করেছি। এখানে অনর্থক দেরি করবার কোন দরকার নেই,—কালই বেরিয়ে পড়ো। তোমার সঙ্গে যাবার লোকেরও আমরা ব্যবস্থা করেছি। আমি বড় দুঃখিত হচ্ছি ঘোষাল—তোমার জন্যে কিছু করতে পারলুম না—যদিও চেষ্টা যতদূর করবার সবই করা গেল। আচ্ছা—এখন তবে বিদায়!

মস্ মস্ করে জুতোর শব্দ হল। বুঝলুম—ডাক্তার চলে গেল। কি যে সব বলে গেল—ঠিক মর্ম্ম বুঝতে পারলুম না—সভয়ে ডাকলুম, লিজি!

সে কাছেই ছিল—আমি বল্লুম, ডাক্তার কি বলে গেল? আমি কি আর দেখতে পাব না? আমার চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে?

লিজি বোধ হয় নিঃশব্দে কাঁদছিল, সে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বল্লে, ওঁরা তাই সন্দেহ করছেন।

আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। মনে হতে লাগলো—একটা বিরাট সূচীভেদ্য অন্ধকার ধীরে ধীরে আমার চোখের ওপর নেমে আসছে। আজ এক মাস হতে গেল—আমি আহত হয়ে হাসপাতালে চোখ-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি। এক দিনের জন্যও আমার মনে কোন চিন্তা বা আতঙ্ক আসে নি। মনে যথেষ্ট ভরসা ছিল,—আমি আবার সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কাজে যোগ দিতে পারবো। কিন্তু আজ এরা এ কি বলছে? আমি অন্ধ! আমার চোখের দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে! এ কি কখনো সম্ভব? এমনি করে আমার এত সাধের,—আশায় উৎসাহে ভরা জীবন এক কথায় ব্যর্থ হয়ে যাবে? অসম্ভব!

উদ্বেগ ও হতাশায় আমি পাগলের মত চীৎকার করে বল্লুম, লিজি! লিজি! আমার চোখের বাঁধনটা খুলে দাও! আমি নিজে একবার দেখতে চাই! আমি কি সত্যই একেবারে অন্ধ হয়ে গেছি?

এলিজাবেথ এগিয়ে এসে ধীরে ধীরে ব্যাণ্ডেজটা খুলতে লাগলো! সমস্তটা খুলতে যেটুকু সময় লাগলো, তাতেই আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠছিলুম। শেষ পাকটা খোলা হতেই, আমি সজোরে তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে, প্রাণপণে চোখ খুলে চেয়ে দেখলাম—অন্ধকার! সব ঘোর অন্ধকার! তবু বিশ্বাস হলো না। মনে হলো—বহু দিন চোখ বাঁধা ছিল বলে হয় ত—পাতা ভাল করে খোলে নি—দুই হাতে পাতাগুলো জোর করে খুলে আবার ব্যাকুল নেত্রে চাইলুম—অন্ধকার, সামনে পিছনে আশে পাশে বিরাট অন্ধকার!

তবে সবই সত্য! সত্যই আমি অন্ধ! শরীর অবসন্ন হয়ে এলো! আর কিছু ভাবতে পারলুম না। পৃথিবীর আলো আমার চোখের ওপর নিভে গেছে! আজ থেকে তবে জীবনের সমস্ত আশা, সুখ, আনন্দ—সবই শেষ! আজ আমার জীবনের অবসান হলো!

ভীত কম্পিত কণ্ঠে ডাকলুম, লিজি! তুমি কোথায়? আমার কাছে এসো! বড় ভয় করছে!

আমার সেই অসহায় ভীত মুখের ভাব দেখে, সে স্নেহময়ী মাতার মত ছুটে এসে, আমার মাথাটা তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলে। বল্লে, ভয় কি? আমি ত তোমার কাছে কাছে সর্ব্বদা রয়েছি। তার পরে সে তার চোখের জল মুছে বল্লে, যে দিন ওরা প্রথম থেকেই তোমায় পরীক্ষা করে এ কথা বল্লে—সে দিন থেকে কি মর্ম্মান্তিক যাতনাই যে আমি ভোগ করছি, সে আর কি বোলবো! এত দিন তবু আমার কাছে ছিলে,—এইটুকু আমার সান্ত্বনা ছিল,—আজ থেকে তাও গেল। আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ওরা আজ তোমায় এই অসহায় অবস্থায় কোথায় কত দূরে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

আমাদের রেজিমেণ্টের আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না,—কাজেই বিদায়ের আয়োজন আরম্ভ হল। এক দিন আমি এখান থেকে মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলুম,—কিন্তু যখন সত্যই সে মুহূর্ত্ত উপস্থিত হলো, তখন আর তেমন আগ্রহে তাকে গ্রহণ করতে পারলুম না। তখন বুঝলুম, এলিজাবেথ কত দিক থেকে, কত রকমে, কত মধুময় বন্ধনে আমায় বেঁধে রেখেছে।

বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে আমরা দু'জনে নিস্তব্ধ হয়ে বসে ছিলুম। আমাদের প্রথম পরিচয়ের পর থেকে সমস্ত ঘটনা এক এক করে তখন মনে হচ্ছিল। কত দিনের কত মধুর সন্ধ্যা, কত আলাপ, কত আমোদ-প্রমোদ—যেন ছবির মত চোখের সামনে ভেসে উঠছিল,—আজ সে সবেরি শেষ! গভীর বিষাদের ভারে দু'জনেরি মন তখন এমন ম্রিয়মাণ—কোন কথা তখন বলা যায় না। অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে থেকে এলিজাবেথ শেষে বলে উঠলো, দেখ! মানুষ আশাতেই বেঁচে থাকে,—আমরাই বা শেষ আশাটুকু ছাড়বো কেন? যদি বম্বের মেডিকেল বোর্ডের ব্যবস্থানুযায়ী চিকিৎসায় তুমি সেরে ওঠো, তা হলে আর কখনো কি এদিকে আসবে না?

তার স্নেহকাতর, সেবা-পরায়ণ নারী-প্রকৃতি যে আমায় দূরে ছেড়ে দিতে কত ব্যাকুল হয়ে উঠছে—আমি তার এ কথায় তা বুঝলুম। তাকে মিথ্যা আশা দিতে আমার প্রবৃত্তি হলো না; কারণ, আমার মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিল,—আবার সুস্থ হবো, এ আশা তখন আমি আর

করতে পারছিলুম না। আমি ব্যথিত চিত্তে বল্লুম, বম্বেতে আমার সম্বন্ধে ভাল মন্দ যে কোন ফলই হোক—এখানকার রেজিমেণ্টে সে খবর আসবে। সুতরাং তুমি খোঁজ করলেই সে খবর পাবে। ভাল যদি হই, তা হলে নিশ্চয়ই আবার আসবো, সে তুমি ঠিক জেনো। আর তা যদি না হই—তা হলে দেখা আর আমাদের মধ্যে হবে না,—চিঠি-পত্র দিয়ে খোঁজ নেওয়াও হয় ত আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। কিন্তু লিজি! আমি কোন দিন জীবনে তোমায় ভুলতে পারবো না। এই তিন মাস তুমি একাধারে কত কত রূপে যে আমার জীবন পূর্ণ করে রেখেছিলে, তা আজ বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি। আমার জীবনের সকল অভাব ভরিয়ে রেখেছিলে তুমি! সুখের দিনে তোমায় ঘনিষ্ট বন্ধুর মত আমার পাশে পেয়েছিলুম! দুঃখের দিনে তুমি মায়ের স্নেহ বুকে নিয়ে এই দুর্ভাগ্য অসহায় অন্ধের অক্লান্ত পরিচর্য্যা করেছ! আর কি বেশি বোলবো,—আমার মনের ভিতর তোমার স্মৃতি জীবনদাত্রী দেবীর মত চিরজাগ্রত হয়ে থাকবে!

আমার হাত ধরে লিজি বল্লে, ও রকম করে কথা বোল না তুমি! আমার বড় কষ্ট হয়! তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে যাচ্ছ,—তাঁদের সঙ্গে, তাঁদের স্নেহে যতটা সম্ভব শান্তি পাবে। তা ছাড়া তোমার স্ত্রী আছেন,—তোমার সেবা করবার তাঁরই অধিকার। আমার কোন কথা বলবার অধিকার নেই,—বলা উচিতও নয়। তবু আজ এই বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে বলছি,—তোমার পাশে থেকে যাবজ্জীবন তোমার সেবা করা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু কাম্য নেই।

অজস্র অশ্রুজলে ভাসতে ভাসতে এলিজাবেথ আমায় জাহাজে তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। সে চলে যাবার পর আমি যেমন নিজেকে অসহায় বোধ করতে লাগলুম, জীবনে কোন দিন এমন মনে হয় নি। তিন মাস পূর্ব্বে এক দিন দেশ থেকে অদম্য আশা ও উৎসাহপূর্ণ চিত্তে, স্ফীতবক্ষে ফ্রান্সের উপকূলে এসে নেমেছিলুম,—সে দিন মনে কি দুর্জ্জয় সাহস! কি অজেয় শক্তি! নবলব্ধ অধিকার পেয়ে তখন আমরা কি করে যে বাঙালীর পরাক্রম জগৎকে দেখিয়ে সকলকে মুগ্ধ ও চকিত করে তুলবো,—নিশিদিন সেই চিন্তায় আত্মহারা! আজও আমার মনে সে দিনের সেই উৎসাহ, সেই সাহস, সেই অজেয় শক্তি—সবই বিদ্যমান! কিন্তু মানুষের ভাগ্যের কি পরিবর্ত্তন! আজ আমি সেই উপকূল থেকে জীর্ণ, ভগ্ন হৃদয়ে, দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে, নিতান্ত দীন-হীনের মত আবার দেশে ফিরে চলেছি! আজ আর সংসারে আমার আশা বা আকাঙ্ক্ষা করবার কিছুই রইলো না!

বাস্তবিক, আমার এই অন্ধত্বটা আমার কাছে বিধাতার অত্যন্ত অবিচার ও অত্যাচার বলে মনে হয়! জাহাজের সুদীর্ঘ পথ আমি শুধু শূন্য-মনে এই কথাটাই এক মনে ভাবতুম,—যুদ্ধে অন্য কত লোকের মত আমার প্রাণ গেলেও ত যেতে পারত? তা হলে আজ অভিযোগ করবার ত কিছুই থাকতো না! কিন্তু তা হলো না! কত লোকের হাত পা উড়ে গেছে! তারা কতক কষ্ট পেয়েছে বটে, তবু বিজ্ঞানের কৃপায় মানুষ তাদের জোড়া-তাড়া দিয়ে কোন রকমে আবার খাড়া করিয়ে দিয়েছে! আমার সে রকমও কিছু হলো না! আমি অন্ধ! সবল সুস্থ,—অটুট স্বাস্থ্যে, যৌবনের শক্তিতে ভরপুর হয়েও আমি অক্ষম অসহায়! আমার আর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবই পূর্ণ কার্য্যক্ষম থাকা সত্ত্বেও আমি অন্ধ! তাই আমার সব শক্তি থেকেও কিছু নেই! সব থেকে শুধু আমার চোখ দুটিই নষ্ট হয়ে গেল—যার আর প্রতিকার করবার কোন উপায় নেই! আশ্চর্য্য!

এক এক সময় একটা রুদ্ধ রোষে ও আক্রোশে আমার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতো! কার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ,—কাকেই বা এর জন্যে শাস্তি দিতে চাই,—তা জানি না,—তবু মনের ভিতর একটা অশান্ত বিদ্রোহ জেগে উঠে, আমায় চঞ্চল করে তুলতো। আবার এক এক সময় একটা দারুণ নিরাশা ও অবসাদে সমস্ত মন মুহ্যমান হয়ে ভেঙে পড়তো। আমি অন্ধ! জগতের সকল সুখ-সাধে বঞ্চিত! আমার জীবনে কোন দিক থেকে আর কোন সুখের আশা নেই! কেন তবে এ দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বয়ে মরা! একটি গুলিতে ত এই দুঃখময় জীবনের সব দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ করতে পারি? ক্ষোভে নিরাশায় যখন সত্যই আত্মহত্যা করবার ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠতো, তখন আমার এই দগ্ধ হৃদয়-পটে ধীরে ধীরে একখানি মধুর মুখ জেগে উঠে, আমার সকল জ্বালা জুড়িয়ে দিত।

সে মুখ আমার বীণার! বিদায়ের দিনের সেই কাতর অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখ! আমার মন বলতো, সে তোমার আশায় সেখানে পথ চেয়ে বসে আছে, আর তোমার এই আচরণ? একটি বিশ্বস্ত প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে তোমার লজ্জা হয় না? সেই মুখ মনে করে তখন আমার সব দুঃখ, সব গ্লানি ভুলে যেতে সাধ হতো। ভাবতুম, আমার সব গেলেও এখনো আমার বীণা আছে,—সে আমার পাশে থাকলে আমি জীবন-ভোর এ দুঃখ হাসিমুখে সহ্য করতে পারি!

আশা মায়াবিনী! কখনো বা সে তার কুহকজাল রচনা করে একটি মনোহর চিত্র আমার মনের উপর ধরতো! তখন ভাবতুম, আর যদিই বা বম্বের হাসপাতালে চিকিৎসিত হয়ে আবার আমার চোখ ভাল হয়ে ওঠে? ডাক্তার ত বলেই ছিল—সেখানে চোখের চিকিৎসার স্বতন্ত্র কোন ব্যবস্থা নেই। ভাল রকম চিকিৎসা হলে হয় ত আমার চোখ সুস্থ হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে!

মানুষ সহজে এতটুকু আশাও ছাড়তে চায় না। এই ক্ষীণ আশার সূত্রটুকু ধরে আমিও অনেক সময় একটু শান্তি পাবার চেষ্টা করতুম।

প্রথম প্রথম এলিজাবেথের ভারি অভাব বোধ করতুম। এই আত্মীয়-স্বজন-শূন্য প্রদেশে, কঠোর সৈনিক-জীবনে, স্নেহের প্রতিমার মত সে আমায় কি অসীম যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল! আমি অযাচিত ভাবে কেবলই তার কাছ থেকে অপরিমেয় ভালবাসা পেয়ে এসেছি, প্রতিদানে তাকে কিছুই দিতে পারি নি, কিন্তু তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে তার অভাবের তীব্র বেদনা আমায় জর্জ্জরিত করে তুলছিল।

জাহাজের অন্যান্য আরোহী ও আরোহিনীর দল সকলেই নিজের নিজের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে খেলায়, গল্পে, আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত,—আমিই শুধু একা তাদের আনন্দ-কলরবের মধ্যে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতুম। অন্ধের এই নিরানন্দ বৈচিত্র্যহীন জীবন! তার দিকে কারো মনোযোগ আকৃষ্ট হতো না। আমার সহচর সন্ধ্যায় আমায় ডেকের উপর চৌকি পেতে বসিয়ে দিয়ে যেত। আমি একা বসে বসে কল্পনা-নেত্রে দেখতুম,—নক্ষত্র খচিত, মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ,—জোছনার রজত ধারায় চারিদিক প্লাবিত,—তারি মাঝে সুনীল অনন্ত-প্রসারিত সাগরের বারিরাশি মথিত করে আমাদের জাহাজ ছুটে চলেছে। সমুদ্র-তরঙ্গের অবিরাম গর্জ্জন আমার কাণে বাজতো। আশ পাশ থেকে মাঝে মাঝে গল্পের মধ্য থেকে কথার টুকরো বা হাসির শব্দ কাণে ভেসে আসতো। কখনো বা কোন প্রণয়ীযুগলের মৃদু উচ্ছ্বাসপূর্ণ আলাপ,—কোথাও বা কোন দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষ তান!

ধীরে ধীরে আমার মনে অতীত জীবনের কত উজ্জ্বল দিনের মধুর স্মৃতি জেগে উঠতো,—আমিও তো এমনি করে জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণ করে কত দিন এ সংসারের সমস্ত আনন্দ, রস, সৌন্দর্য্য পিপাসা মিটিয়ে পান করেছি! সেই আমি আজো বর্ত্তমান,—অপরিতৃপ্ত মনের তৃষ্ণা তেমনি অব্যাহত রয়েছে,—কিন্তু সে দিন আজ কোথায়? কোন্ পাপে, কার অভিশাপে আমার জীবনের সমস্ত সুখের আশা নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল?

হতাশায়, অভিমানে কত সময় আমার চোখ জলে ভরে আসতো। আবার তখনি মনে হত,—আজ আর আমার পাশে স্নেহময়ী এলিজাবেথ নেই,—যে আমায় এতটুকু কাতর দেখলে, তখনি ছুটে এসে, তার অন্তরের সমস্ত মাধুর্য্য ঢেলে দিয়ে, আমার মনের বেদনা মুছে দেবার চেষ্টা করবে! আজ সে আমার কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে! নিজের ব্যথায় নিজেই কেঁদে কেঁদে অবসন্ন হয়ে পড়ে নিজেই নিরস্ত হতুম।

আশা ও নিরাশার মধ্যে এমনি করে দোল খেতে খেতে অবশেষে এক দিন বোম্বাইয়ের উপকূলে জাহাজ এসে থামলো।

আবার আমি বোম্বাইয়ের হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। যথারীতি আমার পরীক্ষা এবং চিকিৎসা চলতে লাগলো। যখন আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে সেখানকার হাসপাতালে ছিলুম, তখন আমার কোন আশঙ্কা ছিল না। আমার যে দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট হতে পারে, এ সম্ভাবনা পর্য্যন্ত কখনো আমার মনে আসে নি। সেই জন্য মন বেশ সুস্থ সবল ছিল। কিন্তু এখানে দিন দিন আমার মনের উদ্বেগ যেন অসহ্য হয়ে উঠছিল। এরা যে কোন্ দিন কি বলবে,

সর্ব্বক্ষণ সেই উৎকণ্ঠায় আমার মন এমনি উদ্বিগ্ন হয়ে থাকতো, যেন সেই একটি কথার উপর আমার সমস্ত জীবন মরণ নির্ভর করছে!

বম্বে এসে পর্য্যন্ত আর একটি কারণে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। আমার এ চাঞ্চল্যের কারণ—বীণা! যত দিন আমি তার কাছ থেকে অনেক দূরে ছিলুম, যখন ইচ্ছা করলেই ছুটে চলে আসবার কোন উপায় ছিল না, তখন বাধ্য হয়ে মনও বেশ সংযত ছিল। কিন্তু এখন এত কাছে এসে তার কাছ থেকে এত দূরে থাকা,—এ যেন আমার পক্ষে একেবারে অসহ্য বলে মনে হচ্ছিল। বম্বে থেকে পাটনা—এইটুকু সামান্য ব্যবধান! এক এক সময় মনে হোত—সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে,—এদের চিকিৎসার এই যে বন্ধন, এ সব ছিঁড়ে ফেলে, ছুটে তার কাছে চলে যাই! অন্তরের মধ্যে যার চিন্তা এত তীব্র ভাবে সদা জাগ্রত রয়েছে, তাকে বাইরে থেকে পাওয়া কি এতই কঠিন?

বম্বের মেডিকেল বোর্ড প্রায় এক মাস আমার চোখের চিকিৎসা ও নানাবিধ পরীক্ষা করে দেখে, অবশেষে এক দিন তাঁদের সকলের মত প্রকাশ করলেন—চিকিৎসা-শাস্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী তাঁদের বিশ্বাস—আমার দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে পাওয়া যাবে না! দৃষ্টিবহা স্নায়ু একবারে অবশ হয়ে গেছে,—তার কার্য্যকরী শক্তি আবার ফিরিয়ে আনা তাঁদের শক্তির বাহিরে। সুতরাং এক কথায় আমার ভাগ্য নির্ণয় হয়ে গেল!

সে দিন—তখন সন্ধ্যা,—আমি একা আমার ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে ছিলুম,—অন্তরের মধ্যে তখন তুমুল ঝড় চলছিল। চারিদিকের সমস্ত বন্ধন থেকে বিযুক্ত হয়ে, আমি যেন একটা আশ্রয়হীন মহাশূন্যের মধ্যে এসে পড়েছি, আমার জীবনের যে এইখানেই পরিসমাপ্তি তা যেন বুঝছি,—কিন্তু কেন? কিসের জন্য? সংসারে আর সকলে ঠিক আগেকার মতই সুখে আনন্দে তাদের জীবন-তরণী বেয়ে চলেছে,—আর আমিই শুধু এই ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়ে অতলে তলিয়ে যাবো? কোন্ অপরাধে আমার এ শাস্তি? এ অত্যাচার, এ অবিচারের কি কোন প্রতিবিধান নেই? মানুষের কি এমন কোন শক্তি নেই যে, সে এই অদৃশ্য শক্তির প্রতিরোধ করে' এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে পারে? আমার মনে তখন ঠিক যে কোন্ ভাবের উদয় হচ্ছিল,—কি যে তখন আমি ঠিক ভাবছিলাম,—তা আমি নিজেই ঠিক জানি না। কেবল একটা উৎকট প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের তীব্র বাসনায় আমার সমস্ত মন বিদ্রোহী হয়ে গর্জ্জে গর্জ্জে উঠছিল! কার জন্যে আমার জীবন এমন ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেল!

বাইরে যখন ঝড় উঠে, সে তার প্রবল বিক্রমে প্রকৃতিকে বিপর্য্যস্ত মথিত করে' ধ্বংসের চিহ্ন রেখে যায়। তার সে ভীম পরাক্রমের প্রতিরোধ করতে জগতের কোন শক্তিই তখন তার সামনে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে যে দুর্জ্জয় বিপ্লব চলতে থাকে, বাইরে তার কোন প্রকাশ নেই। একটা উন্মাদ বাসনায় আমার তখন কেবল মনে হচ্ছিল—প্রলয়ের একটা তাণ্ডব সংহার-লীলার মধ্যে জগৎটা ভেঙে-চুরে গুঁড়ো হয়ে যাক্; ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক,—চন্দ্র সূর্য্য তারা নিবে যাক্,—গ্রহ উপগ্রহের ভীষণ সংঘাতে উল্কাপাতে সমস্ত সৃষ্টি রসাতলে যাক্! কিন্তু হায়, মানুষ কোন এক অদৃশ্য শক্তির হাতের ক্রীড়নক মাত্র! তার জীবনের সব শুভাশুভ, সুখ-দুঃখ সেই শক্তির ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে! তার নিজের কোথাও কোন শক্তি নেই! তার বুকফাটা অভিশাপে বাহ্য জগতের কোনই ক্ষতি হয় না,—শুধু সে নিজের নিষ্ফল আক্রোশে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরে!

সেদিন সন্ধ্যা থেকে সমস্ত রাত্রি টেবিলের ধারে চৌকির ওপর বসে বসেই কেটে গেল। শেষ রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে যখন উত্তপ্ত মস্তিষ্ক ও অবসন্ন দেহ একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে এল, তখন টেবিলের ওপরেই মাথাটা রেখে অর্দ্ধ-মূর্চ্ছিতের মত লুটিয়ে পড়লুম।

যতক্ষণ মানুষের মাথার ওপর কোন একটা আসন্ন বিপদের ছায়া উদ্যত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তার জন্যে কত আশঙ্কা, কত উৎকণ্ঠা তাকে সব সময় উদ্বিগ্ন ও কাতর করে রাখে। কিন্তু যখন সে আর দূরে না থেকে একেবারে তার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ে—তখন দেখা যায় যে, কষ্ট আছে বটে, তবে তার সঙ্গে সঙ্গে যে শান্তিটুকু অযাচিত ভাবে পাওয়া যায়, তার মূল্যও বড় কম নয়।

পরের দিন যখন আমি জাগলুম, তখন আমার মনের ঠিক তেমনি অবস্থা। দু'মাস ধরে যে আশা ও নিরাশা,

আনন্দ ও উদ্বেগ আমার সারা চিত্ত ভরে থেকে জীবনটা একবারে অশান্তিময় করে তুলেছিল, আজ সে সবের অবসান হয়েছে। ভাগ্য আমার আজ নিশ্চিত ভাবে নিরূপিত হয়ে গেছে; সুতরাং কি হবে, এ কথা ভাববার আর কোন প্রয়োজন নেই। সুখের আশা ও দুঃখের আশঙ্কা দুইই তখন আমার মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে;—মন তখন একটা নির্ব্বিকার শান্ত বৈরাগ্যের ভাবে ভরপুর!

সেই সম্পূর্ণ আশাহত, উদাসীন চিত্তে সর্ব্বপ্রথম আমার বীণার কথা মনে হল। আজ দু'মাস ধরে নিয়ত যার নাম জপ করে, যার রূপ ধ্যান করে নিশিদিন অধীর আকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে কাটিয়েছি, তার কথা মনে করে আজ আর আমি কোন আনন্দ পেলুম না। বরং মনে হল, আমার এ দুর্ভাগ্য অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে তার তরুণ সুকুমার জীবন জড়িত করে তাকে তার জীবনের সকল আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রাখবার আমার কি অধিকার আছে? এমন অদ্ভুত ও অসঙ্গত বাসনা কি করে এত দিন আমার মাথায় ঢুকেছিল,—আজ আমি তা ভেবে পেলুম না।

তাকে মুক্তি দিতে হবে! হয় ত দু'দিন তার একটু কষ্ট হতে পারে, তার পরে সে এ সব কথা ভুলে গিয়ে আবার জীবনে সুখী হবে! মাত্র তিন মাসের পরিচয় আমাদের! এই পরিচয়ে সারা জীবনের মত এই জীবনটা অন্ধের মাশে সব সুখ শান্তি হারিয়ে কাটানো,—এ কখনো বীণার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়! চিরদিনের সুখপালিতা সে,—কখনো কোন কষ্টে অভ্যস্তা নয়! তার প্রতি এত বড় অবিচার,—এ আমি কখনো করতে পারবো না।

তখনি বসে বসে বীণাকে একখানা চিঠি লিখলুম। আমার সমস্ত কথা বিবৃত করে পরে লিখলুম, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল,—আমার এ অবস্থার পর আর তার কোন প্রয়োজন নেই। অনর্থক তোমার জীবন এমন ব্যর্থ হয়ে যাবে, আমি তা চাই না। সেইজন্যে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব ভঙ্গ করে দেবার জন্যে এই চিঠি লিখছি। আমার আশা আছে,—তুমিও সব দিক বিবেচনা করে দেখে, এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবে।

সম্পূর্ণ অকুণ্ঠিত ও বেদনামুক্ত হৃদয়ে আমি বীণার সম্বন্ধে সব দাবী-দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, এই ত্যাগ-পত্র লিখে ফেললুম। আজ আর তার জন্যে আমার মনের কোন কোণে একটুও ব্যথা বাজলো না।

এখন আবার নিজের কথা ভাববার সময় হলো। হাসপাতালে আর আমার থাকবার প্রয়োজন নেই; সুতরাং এখন এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। কিন্তু কথা এই যে, এখন আমি যাই কোথায়? আমার ঘর কোথা?

ঘরের কথা মনে হতে; আমার এ নিস্পন্দ, অসাড় প্রাণও আবার যেন চঞ্চল হয়ে কণ্ঠাগত হয়ে উঠলো! সংসারে আমার বাড়ী ঘর ধন ঐশ্বর্য্য জমিদারী—সবই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে; কিন্তু এ সবের মধ্যে কোথায় যে আমার একটু আশ্রয় হতে পারে, তা ভেবে পেলুম না।

আত্মীয়-স্বজনের ভিতর বিধবা মা ও দুটি ভগ্নী। তারা দুজনেই বিবাহিতা, যে যার ঘরে স্বামী পুত্র লইয়া ঘর করিতেছে। তাদের কাছে গিয়ে তাদের নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে একটা দুর্ব্বহ বোঝা চাপাতে ইচ্ছা হল না।

আর মা? তিনি আমাদের দেশের বাড়ীতে আছেন। তবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প। একে ত একটু বড় হবার পর থেকেই আমি তাঁর কাছছাড়া। যদি বা মাঝে মাঝে ছুটি হলে তাঁর কাছে দাঁড়াতে গেছি,—তাতে বিশেষ আমোল পাই নি। তিনি তাঁর সন্ধ্যা-আহ্নিক, পূজা-অর্চ্চনা, ভাঁড়ার, ঠাকুরঘর নিয়েই ব্যস্ত। আমরা সহরে থেকে থেকে যে রকম অনাচারী হয়ে উঠেছি,—কখন যে কোন্ অসাবধান মুহূর্ত্তে তাঁর শুচিতার সংসার ছুঁয়ে ফেলে নষ্ট করে দেবো, সেই ভয়েই তিনি সর্ব্বক্ষণ শশব্যস্ত! তাঁর এই ভাব দেখে ক্রমে আমিও যথাসাধ্য অন্তরে অন্তরে কাটিয়ে তাঁকে শান্ত মনে থাকবার অবসর দিয়েছি বটে, তবে এর ফলে আমাদের মধ্যেকার স্নেহের বন্ধন শিথিল হয়ে, দু'জনেই যে দু'জনের কাছ থেকে বহু দূরে চলে গেছি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাই আজ সব হারা হয়েও মার কাছে একটু আশ্রয় পাবার কথা মনে করে বিশেষ কোন শান্তি পেলুম না। অনেক ভেবে ভেবে শেষ এক জনের কথা আমার মনে লাগলো। সে আমার অভিন্ন-হৃদয় বাল্যবন্ধু কিরণ!

ছোটবেলা থেকে আরম্ভ করে কলেজের শেষ পর্য্যন্ত আমরা দু'জনে বরাবর একসঙ্গে পড়েছি, একত্র থেকেছি। আমাদের মধ্যে সেই অবিচ্ছিন্ন সদ্ভাব এখনো পূর্ণ মা

বর্ত্তমান আছে। আমি চিরদিনই অত্যন্ত চঞ্চল, আমোদ-প্রিয় ও খামখেয়ালি প্রকৃতির। কিরণ ছোট বয়স হতেই শান্ত, গম্ভীর ও মিতভাষী। সে মুখে বেশি কথা বলে না; কিন্তু তার মনের বল অসীম। সে একান্ত সত্যনিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ। বয়সে সে আমার সমবয়স্ক হলেও, কাযে সে কতকটা আমার অভিভাবকের মত ছিল। আমার প্রতি তার স্নেহও ছিল তেমনি অগাধ,—নিজের ছোট ভাইয়ের মতই সে আমায় ভালবাসতো। পঠদ্দশায় তার ওপর সর্ব্ব বিষয়ে নির্ভর করে আমি বেশ নিশ্চিন্ত আমোদে দিন কাটিয়েছি। আজ আবার এই পরিশ্রান্ত অবসন্ন মন তার সবল হৃদয়ের স্নেহের আশ্রয়ে কিছু দিন একটু শান্তিতে কাটাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

সেই দিনই তাকে চিঠি দিলাম। তার পরে আবার যাত্রার পালা আরম্ভ হলো। শরীর মন আর বয় না। এ ভাগ্য-তাড়িত হতভাগ্যের যাত্রা কোথায় গিয়ে কতদিনে শেষ হবে?

কিরণ আমাকে ঠিক পূর্ব্বের মত গভীর স্নেহে গ্রহণ করলে। প্রথম সাক্ষাতেই সে আমায় তার বুকে টেনে নিয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো। তার পরে গাঢ় স্বরে বল্লে, তোমার যে ক্ষতি হয়েছে,—বন্ধুর জীবনব্যাপী স্নেহ দিয়েও যদি তার কিছুমাত্রও পূরণ হয়, তবে তার ত্রুটী হবে না। এখন থেকে আমরা দু'জনে বরাবর একসঙ্গেই থাকবো। আর কোথাও তোমাকে যেতে দেব না। বহু দিন পরে আমার অবসাদগ্রস্ত ক্লিষ্ট অন্তর এই স্নেহের স্পর্শে যেন কথঞ্চিৎ শীতল হলো।

আবার সেই পাটনা! পাঁচ মাস আগে কিরণের কাছে বেড়াতে এসে, এখানেই বীণাকে প্রথম দেখেছিলুম। আজ আবার সব শেষ হবার সময়ও অদৃষ্ট-সূত্রে সেইখানেই এসে দাঁড়িয়েছি! এ কথা মন থেকে কিছুতেই যেতে চায় না! সব আশাই ত ছেড়েছি—তবে আর কেন?

এখানে আসার দু'দিন পরে সকালে চা খাবার পর কিরণ বেরিয়ে গেছে,—আমি একলা টেবিলের ধারে বসে নিজের চিন্তায় ব্যস্ত,—কার মৃদু পায়ের শব্দ, সে সময় আমার কাণে গেল। ডাকলুম, কে, বেহারা? উত্তর পেলুম না। কে তবে? কিরণ কি এখনি ফিরে এলো? বল্লুম, কিরণ? উত্তর নেই। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কে এ জন এসে কাছে দাঁড়িয়েছে,—তার মৃদু নিঃশ্বাসের শব্দ আমার কাণে আসছে,—তবু সে কথা বলে না কেন? এবার আমি ব্যাকুল ভাবে বল্লুম, কে ওখানে? কিরণ কি? কথা বলছো না কেন? এবার অত্যন্ত মৃদু, কম্পিত স্বরে উত্তর হলো,—কিরণ এখনো ফেরে নি। আমিই শুধু আপনাকে দেখতে এসেছি। এ কি ব্যাপার? কি এ? আমার একান্ত পরিচিত সেই মধুর স্বর শুনে আমি পাগলের মত চৌকি ছেড়ে লাফিয়ে উঠলুম,—বীণা! তুমি? তুমি আমায় দেখতে এসেছ? এই কথা বলেই, শব্দ লক্ষ্য করে, তার হাত ধরে আমার কাছে টেনে আনলুম। তার পর হঠাৎ আমার এত দিনের সঞ্চিত বেদনা ও অভিমান অশ্রুর আকারে অবাধে তার মাথায় ঝরে পড়তে লাগলো!

(ক্রমশঃ)

প্রার্থনা

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ধুয়ে দাও হৃদি পুণ্য-সলিলে
ওগো হৃদয়ের নিবাসী।
মুছে নাও মলা চরণ-পরশে
আবিলতা যত বিনাশি' ॥
হে দেবতা এস এ দীনের ঘরে,
নহে দিনেকের, চিরদিন তরে—
আমি বসে আছি; মিলন দিনের
তোমার দরশ-তিয়াসী ॥

না জানি' না বুঝি' শৈশবে কত
মহাপাপ আমি করেছি,
সুচির দিনের সুখের শান্তি
ক্ষণিকের ভুলে হরেছি।
তাহার ভাবনা মহাভার হয়ে
দিতেছে যাতনা, মোরে র'য়ে র'য়ে,
আজিকে তোমার অমৃত-শান্তি
লাভের আশার পিয়াসী ॥

যুদ্ধে বাঙ্গালী

ডাক্তার শ্রীনিবারণচন্দ্র মিত্র, এম্-বি

বিগত যুদ্ধের সময় মানব-সমাজের অনেক পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। য়ুরোপ ও এসিয়ার রাষ্ট্রীয় মানচিত্রে অদল-বদল,—আচার-ব্যবহার, সমাজ শাসনে অনেক বৈচিত্র্য ও শিথিলতা বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে। নানা জাতির একত্র সমাবেশে একটা আন্তর্জাতিক সমস্যা অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যেই এগুলি বিশেষ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে, সুদূর বাঙ্গালা দেশের "ভেতো বাঙ্গালী" প্রাণকেও অদৃশ্য ভাবে যে আন্দোলিত না করিয়াছে, এমন নহে। বাঙ্গালী এখন সিপাহী হইবার জন্য ব্যগ্র। পিতা-মাতার আদরের দুলাল উন্নতির চেষ্টায় চুপি-চুপি গৃহত্যাগ করিয়াছে—ইহা অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এমন কি, চাষার ছেলে, যাহাকে কখন গ্রামের বাহির হইতে দেখা যায় নাই,—যাহার পক্ষে খুলনা, যশোর পৃথিবীর আর এক প্রান্তের গ্রাম,—তাহাকেও হংকং বোগদাদ, উগাণ্ডা, কেনিয়া, ইজিপ্ত, মরক্কো এবং য়ুরোপের ফ্রান্স, ইতালী, গ্রীস্, তুরস্ক প্রভৃতি স্থানে যাইতে দেখিয়াছি। ইহারা না কি "ননীর পুতুল"—অন্ধের মাণিক! কিন্তু এই সব ননীর পুতুল আফ্রিকার গরমে গলিয়া যায় নাই—তাহারা দুঃখক্লিষ্ট ভারত-মাতার অন্ধপ্রায় নয়নে নূতন জ্যোতিঃ আনিয়া দিয়াছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীরা চিরকাল লড়াই করিয়া আসিয়াছে,—যুদ্ধ তাহাদের নিকট ব্যবসায়ের সামিল। তাহারা লড়ায়ে যাইতে পেছপাও হইলে হয় ত বরং ঘোর লজ্জার বিষয় হইত। এসময় বাঙ্গালী তাহার চিরন্তন জড়তা জঞ্জালের মত ঠেলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল, ইহার কারণ কি? ইহার মূলে বিশেষ রকমের সত্যকার একটা সাড়ার পরিচয় আছে। পেটের দায় হঠাৎ তাহাদের প্রবল হইয়া উঠে নাই,—সেটা বহু দিন হইতেই ছিল। অতএব সেটা যে মূল কারণ নয়, তাহা বেশ বুঝা যায়। আমি চা-বাগানের আড়কাটীদের সঙ্গে কুলীদের যাইতে দেখিয়াছি,—যেন একপাল ভেড়া। তাহারা মাঝে মাঝে একটু হাসিবার বা হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু সে চেষ্টা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছে না। চালানী কুলী ভবিষ্যতে কি একটা রাজত্ব পাইবে, এই আশার কুহকে মজিয়া সুদূর দক্ষিণ আমেরিকায় যাইতেছে; কিন্তু সে যাওয়াতে স্ফূর্ত্তি নাই, একটা উদ্দাম ও বিপুল ইচ্ছা নাই। সে যাওয়া বিজয় সিংহের মত উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যাওয়া নহে,—হাড়কাটে যাওয়া। আর এখন স্ব-ইচ্ছায় জানিয়া শুনিয়া অনেক বাঙ্গালী যুদ্ধে গিয়াছে। আমি এমন অনেককে জানি, যাহারা সিপাহী হইবে, এই আশায় আসিয়াছিল; পরে তাহাদের হাসপাতালে রোগীর সেবায় লাগাইয়া দেওয়াতে তাহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। অনেকে আবার স্পষ্টই বলিয়াছিল, তাহারা স্বাধীন চাষার ছেলে;—সরকারের নফর হইয়াছে শুধু সিপাহী হইবার জন্য,—অন্য কাজের জন্য নহে।

এই যুদ্ধ ব্যাপারের সংস্রবে বাঙ্গালীকে (হিন্দু ও মুসলমান) নানা কাজের দায়িত্ব লইতে দেখা গিয়াছে। ইহাতে তাহাদের সকল শ্রেণীর লোক ছিল। প্রথমতঃ ফরাসী চন্দননগরের বাঙ্গালী ভাইদের কথা বলি। তাঁহাদের বীরত্ব-গাথা ভার্দুনের সমরক্ষেত্রে, মরক্কো ও আনামে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। দলে ভারী না হইলেও, তাঁহারা যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা ভুলিবার নহে। ভার্দুন, যেখানে ফ্রান্সের শেষ পরীক্ষা ও যেখানকার দৈনিক মৃত্যুর তালিকা ১০,০০০এর উপরে, সেখানেও অবস্থান করিতে ভেতো বাঙ্গালীর বুক কাঁপে নাই। সেখান হইতে তাহারা আত্মপ্রাণরক্ষার্থ পলাইয়া যায় নাই; অথবা পাগল বা রোগী সাজিয়া কাজে ফাঁকি দেয় নাই। তাহারা সে কয়টা দিনের ঘোর ঝঞ্ঝার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। আজ তাহাদের কেহ কেহ অমরধামে,—কিন্তু তাহাদের আত্মদান পশ্চাদ্‌বর্ত্তীদের মধ্যে উৎসাহের বীজ বপন করিয়া গিয়াছে।

ইংরাজের এলাকায় বাঙ্গালীরা অনেক প্রকার কাজে লিপ্ত ছিলেন,—যেমন, লড়াই, ডাক্তারী, রেলওয়ে, হাস-

পাতালের ও কমিসারিয়াটের কাজ, জাহাজের খালাসী এবং "লেবার কোর" অর্থাৎ কুলীর দল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, সকল অবস্থাতেই বাঙ্গালী আসরে নামিয়াছিলেন। শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহাদের ২।৪ জন চাষী, এবং বেশীর ভাগ চাষার ছেলে। ইহারা ফ্রান্সে যায় নাই। আফ্রিকার ও মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইহাদের দেখিয়াছি। আর দেখিয়াছি—ভারতের দুর্গম পশ্চিমোত্তর প্রান্তে মাসুদদের রাজ্যে। সরকারী পোষাক পরিয়া বুটপটী আঁটিয়া সকলেই নিজেকে সিপাহী মনে করিত,—কিন্তু কাজ তাহাদের ছিল মাটীকাটা, রাস্তা তৈয়ার করা, বন-জঙ্গল সাফ করা।

একদিন বেলুচিস্তানের একটা পাহাড়ী পথ ধরিয়া পল্‌টনের সহিত যাইতেছি,—রাত প্রায় ১০টা হইবে। হঠাৎ অস্পষ্ট গানের শব্দ কাণে পৌঁছিল। পল্‌টন দাঁড়াইয়া গেল। অফিসারেরা সতর্ক হইলেন; কিন্তু গানের ভাষা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে কর্ণেল কখন যে আমার দিকে তাকাইয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। আমি তখন তন্ময় হইয়া গান শুনিতেছি। হঠাৎ গায়ে হাত পড়ায় চমক ভাঙ্গিল। আমি বলিলাম, কর্ণেল, এ বাঙ্গালা গান। শুনিয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। কুচ করিতে করিতে আমরা যে ক্যাম্পের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহা প্রথমটা বুঝিতে পারি নাই। আমাদেরই লেবার কোরের বাঙ্গালীরা উচ্চৈঃস্বরে মেঠো গান ধরিয়াছিল! একটা বাদল দিনের গান। সে দিন বাতাস বোধ হয় প্রিয় পরিজনের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়া ঘরছাড়া বেচারীদের প্রাণটার মধ্যে তোলপাড় করিয়া দিতেছিল। তাই বেলুচিস্তানের মরুভূমির তপ্তশ্বাসের সহিত তাহাদের মর্ম্মোচ্ছ্বাস বড়ই করুণ শুনাইতেছিল।

ইহাদের নায়করা সকলেই বিদেশী—শিখ বা পাঞ্জাবী মুসলমান। এক দিন একটি হাবিলদারকে—এই রোগা বাঙ্গালীরা কেমন লোক, জিজ্ঞাসা করিলাম। হাবিলদার উত্তরে বলিয়াছিল, ইহারা একেবারে বেশী কাজ করিতে পারে না বটে, তবে দিনের শেষে অন্য জাতের লোকদের কাজের তুলনায় বেশী পেছিয়ে থাকে না। ইহারা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সদাই প্রফুল্ল ভাব। তামাক ছাড়া অন্য নেশা করে না,—বিনামূল্যে পাইলেও নয়। কোনরূপ বে-আইনি কাজ করে না। কথা বলিলে শোনে। বুদ্ধি আছে; এবং যদিও ভাত খায়, তবুও সিপাহীদের মত কষ্টসহিষ্ণু—হাঁটিতে সমান মজবুত। কিন্তু সাহেব, আমার জান খাইয়া ফেলিল—ভাত ভাত করিয়া। আমি বলি,—"আরে রুটী খাও,—গায়ে আরও জোর হইবে;—এতদূরে সরকার চাল কোথা পাবে?" ইহাদেরই জাতভাইরা হাসপাতালে ভিস্তি ও রসুইয়া ব্রাহ্মণের কাজে ভর্ত্তী হইয়াছিল। যখন পল্‌টনের সহিত থাকিতে হইত, তখন ইহাদেরও কুচ করিতে হইত। ২০ মাইল হাঁটার পর সিপাহীরা যখন আরাম করে, তখন ইহারা ঘোলা কাটিয়া তাহাদের রাঁধিয়া খাওয়াইতে ব্যস্ত। কাহারা যে বেশী বাহাদুর, তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

তবে এক দিন বাস্তবিকই ইহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল। সেটা তুর্কীর দেশের কনষ্টাণ্টিনোপল সহরে, শীতের দিনে। চার দিন ধরিয়া বরফের ঝড় বহিতেছিল; তাপ ১৫° ফা মাত্র। বলা বাহুল্য, জলাশয় সব জমিয়া গিয়াছিল। দারুণ জলকষ্ট। চারিদিকে একহাঁটু বরফ জমিয়াছে। তখন সমস্যা—জল পাওয়া যায় কোথায়। সকলেই জলাভাবে প্রাণনাশের আশঙ্কায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার পর যখন তাহাদের বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দিলাম যে, ঐ গুঁড়া বরফ লইয়া গলাইলে জল হইবে,—এবং পরখ করিয়া দেখাইয়া দিলাম, তবে তাহাদের মুখে হাসি বাহির হইয়াছিল। তখন তাহারা আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে লাগিয়া গেল। এইরূপে তাহারা তিনটা শীত কাটাইয়াছে। যাহারা কখন বরফ দেখে নাই,—বাঙ্গালার শীত সহ্য করা যাহাদের অভ্যাস,—তাহাদের পক্ষে যে ইহা কি কঠোর পরীক্ষা তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াও কেহ মরে নাই,—কাহারও নিউমোনিয়া পর্য্যন্ত হয় নাই। অপরন্তু ৩ বৎসরের শেষে, সরকারী নিয়মানুসারে, ডাক্তারী পরীক্ষার সময়ে, সকলেই একবাক্যে বলিয়াছে, "যুদ্ধের জন্য শরীরে কোন জখম হয় নাই, এবং সে জন্য সরকার হইতে কিছু দাবী করিতে পারি না। বাড়ী হইতে যে গ্রীষ্মটী সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহাও অন্তর্ধান করিয়াছে।"

আর একটি ছোট কাজ লইয়া একটি বাঙ্গালীকে

ভারতবর্ষ



তপোবনে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র সিংহ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

দেখিয়াছিলাম। বাড়ী তাহার বর্দ্ধমান জেলায়। তোপখানাতে ঘোড়সওয়ার হইয়া ভর্ত্তী হইয়াছিল। পলটনে বাঙ্গালীকে লওয়া হয় না বলিয়া, সে নিজের নাম "হরিদাস পাল" গোপন করিয়া, "হুবলাল" বলিয়া গিয়াছিল। পায়ে চোট লাগার জন্য চিকিৎসা করাইতে আসিয়াছে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা হইতে আছে। তাহাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল "যদিও এটা রেসালা পলটন নহে (তাহাকে অন্ততঃ সেরূপ আভাষই দেওয়া হইয়াছিল), তবুও মোটের উপর ভালই আছি। তবে দলটা বড় খারাপ—সব হিন্দুস্থানী অন্ত্যজ জাতি।" নিজের ঘোড়ার সব কাজ করিতে হয় বলিয়া, হিন্দুস্থানীর মধ্যে হাড়ী চাঁড়াল প্রভৃতি জাতিকেই সাধারণতঃ এই কাজে বাহাল করা হয়।

এইবার বাঙ্গালী পলটনের কথা। ইহাদের সুখ্যাতি সকলেই শুনিয়াছেন। যুদ্ধ ইহাদের না করিতে হইলেও, রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অতি সুচারুরূপেই তাহারা সম্পন্ন করিয়াছে। অবশ্য, সচরাচর ম্যাট্রিক-পড়া সিপাহী দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি এইরূপ চারজনকে হাসপাতালে রোগীর সেবার জন্য পাইয়াছিলাম। ইংরাজী বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে অনেক বিদেশী সাব-আসিষ্ট্যাণ্ট-সার্জনের চেয়েও ইহারা ভাল ছিল। ইহাদের উপর ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকিতাম। একবার শিখাইয়া দিলে পুনরায় আর বলিয়া দিতে হইত না। কেরাণীবাবুদের দলকে গোলাগুলির গোলমাল ছাড়া আর সব কষ্টই রীতিমত সহ্য করিতে হইত। ইহারা সব ভদ্রলোকের ছেলে—লেখাপড়া জানে। দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বেকার নিয়মানুসারে, কতক বিষয়ে ইহাদিগকে ভিস্তি পাচকদের সামিল করা হইত। ইহাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি ৩০০৲ টাকা মাহিনা পাইতেন। বেশ বুড়া হইয়াছেন এবং চাকুরী শেষ করিয়া চুল পাকাইয়াছেন। কিন্তু এখনও বুক ফুলাইয়া সোজা হইয়া হাঁটেন; এবং তাঁহাকে কোনরূপ শারীরিক পরিশ্রম (কুচ্ কাওয়াজ) হইতে নিষ্কৃতি পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে শুনি নাই। আমেরিকায় যে সব বন্ধুরা ইঞ্জিনিয়ারিং শিখিতেছিলেন, তাঁহাদেরও এই সময় কতক কতক যুদ্ধ ব্যবসা শিখিতে হইয়াছিল। কখন কাজে লাগে তাহা ত জানা নাই। ইহাঁদিগকে জেণ্টেলম্যান ক্যাডেট অর্থাৎ অফিসারের শিক্ষা-নবীশ বলা হইত। ইহাঁদিগকে গাঁতি, কোদাল লইয়া দিনের পর দিন মাঠে থাকিয়া স্বহস্তে রাস্তা ঘাট পোল ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হইত। শীত কালেও এ কাজের বিরাম ছিল না। তখন মাঠে প্রায়ই বরফ থাকিত; আর সেই সব যায়গায় কম্বল মুড়ী দিয়া খোলা মাঠে রাত্রিযাপন করিতে হইত। এই দুধের বাছা বাঙ্গালীদের কিন্তু এক দিনের তরেও সর্দ্দী হয় নাই।

একবার গুটিকতক বাঙ্গালীকে জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারি ও ইলেক্‌ট্রীক কাজে দেখিয়াছিলাম। তবে জাহাজের কাজে চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন বাঙ্গালী খালাসীরা। উত্তরে আর্কেঞ্জাল, দক্ষিণে ম্যাজিলান যোজক, পূর্ব্বে জাপান ও পশ্চিমে হনলুলু ইহাদের গতিবিধির সীমানা ছিল। এই ব্যাপারে প্রায় হাজারের উপর লোক জীবন দান করিয়াছে। টরপেডো, সাবমেরীন, জলের মাইন ইত্যাদির আশঙ্কা পদে পদে ছিল। "ঐ দূরে সাবমেরীন দেখা গিয়াছে" এইরূপ মিথ্যা আশঙ্কার কথা প্রায়ই শোনা যাইত। তখন সকলেই লাইফ বেল্ট পরিয়া দুর্গানাম জপ করিত বটে, কিন্তু বাঙ্গালীদের অনর্থক ব্যস্ত হইয়া মাথা খারাপ করিতে দেখি নাই। আবার একদিন যখন সত্যকার বাঘ আসিল, অর্থাৎ জাহাজের গায়ে টরপেডো লাগিল, তখনকার সেই ভয় ও নৈরাশ্যের দৃশ্যের বর্ণনা করা যায় না। সকলেই ভয়ে কাঁটা,—জাহাজ মেডিটারেনিয়ানের মাঝখানে। নিকটে কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা নাই। ছোট ছোট নৌকায় আগে ছেলে-মেয়েদের নামিয়ে দেওয়া হল। তাহার পর জাহাজ ডুবিল। সকলে নৌকায় বা তক্তায় (raftএ) ভাসিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জনৈক ইংরাজ রমণীর মুখে বাঙ্গালীর বীরত্বের পরিচয় শুনিয়া, নিজে বাঙ্গালী বলিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়াছিলাম।

আর একটা কাজ—যাহা জগতে নূতন এবং করিতে গেলে বিশেষ মনের জোরের প্রয়োজন, সে কাজও অবলীলাক্রমে বাঙ্গালীকে করিতে দেখিয়াছি। আমি এরোপ্লেনে চড়িয়া যুদ্ধ করার কথা বলিতেছি। দুইজন মাত্র বাঙ্গালীর ফ্লাইট ক্যাপ্টেন বার্নাজ্জী এবং ফ্লাইট লেফটেন্যাণ্ট রায়ের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

অবস্থা-বিশেষে পড়িলে ভিতরকার মানুষটী যে নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়, তাহা বাঙ্গালী ডাক্তারদের মধ্যেও

দেখিয়াছি। কখনও কোনরূপ লড়াইয়ের কাজ জানা নাই। কলেজ হইতে সদ্য-পাশ-করা যুবক নিজের মান-ইজ্জত বজায় রাখিয়া যেরূপ ভাবে কাজ চালাইয়াছিল, তাহা বিস্ময়ের বিষয়; এবং সুযোগ পাইলে যে সে চিকিৎসা-বিদ্যা বিদেশী শিক্ষকদের শিখাইয়া দিতে পারে, ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়াছি। শত শত রোগীর ব্যবস্থা করা, প্রত্যহ বেলা ৯টা হ'তে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত (কখন কখন রাত্রেও) অপারেশন করা, এবং তাহার পর হাসপাতালের অন্যান্য কাজ দেখা, কর্ত্তৃত্ব করা, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। এই রূপ কাজ দিনের পর দিন ছয় মাস ধরিয়া করিয়াও কোমর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। অন্য দিকে, গ্রীষ্ম-কালে পল্টনের সহিত ৬দিনে ১৩৭ মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া, বিপন্ন ফৌজের সাহায্য করিতে যাইতেও পায়ে ফোস্কা পড়ে নাই,—পায়ে তেল মালিষ করিতে হয় নাই। আনা-তালিয়ার ভীষণ শীতে (—২° ফা) থাকিয়াও সে জমিয়া যায় নাই। উপরন্তু, সন্তোষজনক কাজের জন্য মেন্‌সাওইন্ ডেস্‌পাচেশ অর্থাৎ সরকারী রিপোর্টে বিশেষ ভাবে তাহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

মেকলের তুলিকায় অঙ্কিত বাঙ্গালীর সে প্রতিকৃতি এখন ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যাইতেছে; এবং তাহার স্থলে আর একটা নূতন মূর্ত্তি—যাহার বলিষ্ঠ দেহ, উন্নত বক্ষ, উদ্দাম তেজ, অসীম মনোবল—আবার পুরাকালের ন্যায় গম্ভীর অথচ দৃঢ়স্বরে বলিতেছে—বন্দে মাতরম্।

ফাঁকি

বন্দে আলী মিয়া

কৌতুক তব লেগেছিল ভালো দু'দিনের লুকোচুরি,
চক্ষের ভাষা অধরের ছাপ্ হাস্যের ফুলঝুরি।
যৌবনতরী চলেছিল যবে জীবনের আব্‌ডালে,
কাণ্ডারী মোরে করিলে কি তায় নির্জ্জন নিশাকালে!
পথিকের কোন্ পথ্‌ভোলা গীতি
সহসা তোমার আদরের ভীতি
সুদূরের পথে শান্তির ছোঁয়া এঁকে দিল মোর ভালে।
জানি না কি প্রিয়া তব আঁখি ছায়া
মা-আসা-দিনের গড়ি রূপ্-কায়া
ঘর কোণে মোরে রাখিল না আর দেখাইল মায়াপুরী।
দুদিনের লুকোচুরি।

কৌতুক তব লেগেছিল ভালো—নয়নের মরীচিকা—
মৌ-বনে যবে জ্বলেছিল তব ছলনার আলো-শিখা।
দুই জোড়া আঁখি মিলি এক ঠাঁয়—হাসি দিয়ে বিনিময়,
দুইখানি রূপ পান করে মোরা হইতাম অক্ষয়।
চুপ্ করে লেখা হরফের বুকে
দুইখানি প্রাণ থাকিত যে লুকে'
কত কথা তার অজ্ঞাত যেন—সীমা ছাড়া কেহ কয়।
মুখোমুখি বসে মোরা দুই জনে,
মায়া-বাঁশী যবে বাজাতেম মনে,
জানিতাম প্রিয়া মোর শুধু তুমি পূজারিণী অনিমিখা।
আজি সব মরীচিকা।

কৌতুক তব লেগেছিল ভালো—বাদলের কিছু আগে;
যায়নি তখন নয়নের মোহ জীবনের রাঙা ফাগে।
একা ঘরে আজ মনে হয় যেন রাত শেষে শরতের,
ছলনায় মোরে ভুলায়েছ তুমি নহো কভু দরদের।
অতীতের বাণী স্বপনের প্রায়
মরীচিকা সম ওই মিশে যায়;
ছিঁড়ে গেল মোর আকাশের ফুল ছোঁয়া লেগে মরতের।
দুইখানি বুকে অভিমান-দেয়া
বন্ধ করেচে লিপিকার খেয়া—
অবেলায় আজি আশাহত প্রাণ কেন তায় মিছি মাগে।
প্রভাতের কিছু আগে।

শিকার

শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় এম এ

(১)

সুধার মাতুল হরদাস পিতৃমাতৃ-হীনা ভাগ্নীর বিবাহ দিয়া গ্রামের মধ্যে যে যশ অর্জ্জন করিয়াছিল—বোধ করি সীতার বিবাহ দিয়া জনক রাজার ভাগ্যেও তাহা ঘটে নাই। জামাতা নীলমণি কলিকাতার কোনও প্রেসে কম্পোজিটারি করিয়া মাসিক ত্রিশটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া থাকে—সুতরাং এ হেন স্বামী-লাভ যে সুধার পূর্ব্বজন্মের শিবপূজার ফল, এ বিষয়ে যেমন সবাই নিঃসন্দেহ হইয়াছিল, তেম্‌নি হরদাসের ভাগ্নী-প্রীতিও একটা আদর্শের রূপ ধরিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। সুধাকে বিদায় দিয়া হরদাস শুষ্ক চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া লাল করিয়া ফেলিলে, পাড়া-প্রতিবাসী তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বুঝাইতে লাগিল—"দুঃখু করে আর কি করবে হরদাস! মেয়ে তো পরের ঘরে যাবার জন্যই লালন করা!"

হরদাস আর্ত্তস্বরে কহিল—"কিন্তু মন যে তা' বোঝে না। দিদি যখন ওকে এতটুকু রেখে দুচোখ বুজলেন, সেই থেকেই যে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছি।"

সকলে বলিল—"আহা, তা সত্যিই তো। একটা কুকুর-বেড়াল পুষলেই মায়া পড়ে যায়,—এ তো বোনের গর্ভের সন্তান। তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। যেমন বাপ-মা-মরা মেয়ে, তেম্‌নি রাজার হাতে তুলে দিয়েছ। ওর আর দুঃখের মুখ দেখ্‌তে হবে না।"

হরদাস প্রসন্ন হইয়া কহিল—"তাই তোমরা আশীর্ব্বাদ করগো, সুধা যেন আমার রাজরাণী হয়। ওকে পার করতে কি কম চেষ্টা করেছি—নিজের মেয়ের বেলাতেও কেউ এমনটি করে না।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"তা তো বটেই, তা তো বটেই। সে কথা কে না জানে।" হরদাস তখন উৎসাহিত হইয়া জামাতা সংগ্রহের কল্পিত ইতিহাসটি আর একবার বলিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া দিল।

(২)

পিতৃমাতৃ-হীনা সুধার বিবাহ একটু বেশী বয়সেই হইয়াছিল। সুতরাং মাতুলের সংসার ছাড়িয়া এক অজানা ঘরে আসিতে তাহার খুব যে বেশী কষ্ট হইয়াছিল, তাহা নয়। বরং মামা-মামীকে এত শীঘ্র রেহাই দিতে পারিয়াছে মনে করিয়া সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। সকলে তাহার স্বামী-ভাগ্য দেখিয়া যখন তাহার অদৃষ্টের প্রশংসা করিতেছিল—তখন তাহার এই কথাটাই মনে জাগিয়াছিল, আর যাহাই হউক, এইবার সে মামা-মামীর কথার খোঁচা হইতে চিরদিনের মত পরিত্রাণ পাইয়াছে।

স্বামী নীলমণি তাহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসিল। এক বস্তির দুখানি খোলার ঘর লইয়া নীলমণির সংসার। সংসারে এক নীলমণি ছাড়া আর কেউ নাই। সুতরাং সুধা একেবারে গৃহের কর্ত্রী হইয়া বসিল। প্রতি দিন স্বামীর জন্য রাঁধিয়া, স্বামীর অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরিষ্কার করিয়া, স্বামীর ঘর মনের মত করিয়া সাজাইয়া-গুছাইয়া সে সময় কাটাইত।

নীলমণি বেলা আটটা নয়টায় প্রেসে যায়। তার পর সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া, অপরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় ছাড়িয়া, কিছু জলযোগ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে। আর সুধা সেই শূন্য গৃহে একাকী ভয়ে আড়ষ্ট ভাবে রাত্রির অনেকটা কাটাইয়া দেয়। তার পর নীলমণি গভীর রাতে ফিরিয়া আসিয়া আহার করিলে, তাহার পাতের প্রসাদ খাইয়া সে স্বামীর পাশে বিছানায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। কোনও দিন সে এ প্রশ্ন করিতে সাহস করে না—কেন প্রতি রাত্রে তাহাকে একলা ফেলিয়া সে এমনি করিয়া চলিয়া যায়,—তাহার কত ভয় করে একলা থাকিতে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে আশেপাশের খোলার ঘর-গুলিতে নানা রকমের কাণ্ড চলিতে থাকে। কোথাও

বা হারমোনিয়াম-ডুগি-তবলার শব্দ, কোথাও বা মেয়েলি গলার বেসুরো সঙ্গীত, কোথাও বা মাতালের জড়িত স্বর। তাহাদের বাড়ীটিকে ঘিরিয়া যাহারা বসবাস করিয়া থাকে, তাহাদের সহিত তাহার কোনও পরিচয় না হইলেও, সে বুঝিতে পারে, যে স্থানে তাহারা বাস করে, সেখায় আর যাহারই হউক, ভদ্রলোকের বাস করা চলে না। তাই সন্ধ্যা হইতে না হইতে তাহার গা এক অজানা ভয়ে কাঁপিতে থাকে।

সেদিন নিতান্ত ভয়ে ভয়ে সুধা বলিল—"দেখ, একা থাকতে আমার বড় ভয় করে।"

নীলমণি সহাস্যে কহিল—"তাহলে পাহারা দেবার জন্য আর কাউকে আন্‌বো কি?"

কুণ্ঠিত ভাবে সুধা কহিল—"না, তা বলছিনে,—আমার মনে হয়, আশেপাশের লোকগুলো তেমন ভাল নয়।"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া নীলমণি কহিল—"কারও সাথে আলাপ-পরিচয় হয়েছে না কি?"

সুধা ভীত ভাবে বলিল—"তা নয়। তবে আমি ওদের ভাবে বুঝতে পারি।"

নীলমণি উত্তর দিল—"নিজে ভাল থাকলেই হ'লো। অন্যে কি করছে তা দেখবার তোমার দরকার কি শুনি?"

সুধা কহিল—"এ বাড়ী ছেড়ে দিলে হয় না?"

"কেন? রাজরাণী তো আর নয় যে, এতে মন উঠ্‌চে না। বলি, গেঁয়োভূত সহরে এসেছ, সেই তো খুব। বেশী আবদার ভাল নয়।"

তা বটে! সুধা চুপ করিল। কিন্তু কেন যে সে সে-বাড়ী ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করিল, স্বামী তাহা বুঝিল না বলিয়া সুধা মর্ম্মাহত হইল।

(৩)

বছর তিন-চার পরের কথা বলিতেছি। এই কয়েক বছরের মধ্যেই সুধার যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সে এখন আর ছোটটি নয়—এক সন্তানের জননী। যে সুধা মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিতে পারিত না—সে এখন স্বামীর সঙ্গে তেজের সহিত কথা বলে; আর তারই ফলে তাহার দেহ প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া উঠে। কিন্তু তবু যে সে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে সে নিজের অদৃষ্টলিপি অনেকটা পড়িয়া ফেলিয়াছে—ভবিষ্যতে তাহার জন্য যে ভাগ্য-লিপি অপ্রকাশিত রহিয়াছে, তাহারও অনেকটা বুঝি বা সে অনুমানে বুঝিয়া লইয়াছে।

স্বামী-ভাগ্য তাহার যেমনই হউক, কিন্তু পুত্রটিও যে পৃথিবীর সমস্ত ব্যাধির আকর হইয়া জন্মিয়াছে, ইহাই তাহাকে সর্ব্ব সময়ে পীড়া দিতেছিল। রুগ্ন পুত্রের জন্য সুধার মাতৃ-হৃদয় যতই আকুলি-বিকুলি করিতে থাকে—নীলমণি ততই তাহাকে আঘাতের পর আঘাত দেয়। স্বামী যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে—এই লইয়াই উভয়ের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক হয়।—তার পর সে বাড়ীর বাহির হইলে সুধা রুগ্ন পুত্রকে কোলে লইয়া কাঁদিতে থাকে, আর ভগবানকে প্রত্যহ জানায়—"স্বামীর সুমতি দেও ভগবান!"

কিন্তু নীলমণির মতি ফিরিবার কোনও লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। বরং সে ধাপে-ধাপে এম্‌নি নিম্নস্তরে নামিয়া চলিল যে, ক্রমশঃ তাহার বাড়ী আসা পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গেল। সুধা প্রমাদ গণিল।

তিন-চার দিন পরে এক দিন নীলমণি বাড়ী ফিরিলে, সুধা কহিল—"এত দিন কোথায় ছিলে? আমার দিকে না চেয়ে দেখ, ছেলেকে তো দেখতে হয়।"

নীলমণি রক্ত চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া কহিল—"ও—আমার বড় দায় রে! যার দরদ সেই দেখুক।"

সুধা কহিল—"আমি মেয়েমানুষ—যত দরদই করি না কেন—কিন্তু টাকা তো রোজগার করতে পারিনে। সে তো তোমাকেই জোগাতে হবে। তুমি আর যাই কর, এইটুকু দেখো, যেন খেতে না পেয়ে মরি।" সুধার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

নীলমণি সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—"মামার বাড়ী বার ব্যঞ্জন দিয়ে ভাত খেতে যে, এখানে খাওয়া জুটছে না,—না? মেয়েমানুষের মত এমন নেমকহারাম জাত আর দুটি নাই।"

সুধা গর্জ্জিয়া উঠিল, কহিল—"নেমকহারাম? তাই বটে!" এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই একটা বাটীতে খানিকটা জলীয় সাদা পদার্থ স্বামীর পায়ের কাছে ধরিয়া দিয়া কহিল—"নেমকহারাম আমি—তাই তোমার দেওয়া অন্ন-ব্যঞ্জন রোচে না। কিন্তু কেন তোমার ছেলেকে দুধের বদলে খড়ি গুলে খাওয়াতে হয়? কেন তার তিন দিন দুধ তো দূরের কথা—একটু বার্লি

পর্য্যন্ত জোটে না? নেমকহারাম মেয়েমানুষ—তাই তোমাদের লাথি ঝাঁটা খেয়েও মুখ বুজে পড়ে থাকে।"

দাঁত মুখ খিঁচাইয়া নীলমণি বলিয়া উঠিল—"ওঃ, কি আমার সতী সাধ্বীরে!"

"না—আমি সতী নয়,—তুমি বড় সৎ। ত্রিশ টাকা মাইনের চাকুরে—নিজে খেতে পান না—বউ-ছেলেকে খেতে দেবার সামর্থ্য নাই—সে যায় 'ফূর্ত্তি' উড়াতে। আমি মাই হই, ভগবান দেখছেন—কিন্তু তুমি যে কত বড় বদমায়েস, তাও তাঁর জান্‌তে বাকি নেই।"

নীলমণি এইবার মরিয়া হইয়া সুধার দিকে ধাইয়া আসিল। তার পর তাহার চুলের মুষ্টি ধরিয়া, সজোরে লাথি মারিয়া ফেলিয়া দিয়া, সরোষে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। সুধা অনেকক্ষণ সেই জায়গায় স্তব্ধ নীরব হইয়া রহিল—তাহার চোখ দিয়া একবিন্দু জল বাহির হইয়াও তাহার বুকের জ্বালা লঘু করিল না।

(৪)

সেদিন প্রায় সন্ধ্যাকালে সুধা স্বামীর প্রেসের কালী-মাখা মলিন জামা-কাপড় লইয়া সাবান দিয়া ধৌত করিতেছিল, এমন সময় নীলমণি বাড়ী আসিল। কিন্তু আসিয়াই তাহার কাপড় জামার অবস্থা দেখিয়া রাগে আগুন হইয়া কহিল—"এতক্ষণে বুঝি কাপড়ে হাত দেওয়া হয়েছে?"

সুধা ধীর স্বরে কহিল—"চুপ, আস্তে কথা কও, ছেলে এইমাত্র ঘুমিয়েছে; চেঁচামেচি করলে উঠে পড়বে—আমার আর কাপড় কাচা হয়ে উঠ্‌বে না।"

নীলমণি গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"চুপ করবে তোর ছেলের ভয়ে! এতক্ষণে কেন কাচা হয়নি হারামজাদি?"

দাঁতে দাঁত চাপিয়া সুধা কহিল—"হারামজাদি! খেতে দেবার কেউ নয়, গাল দেবার সোয়ামি! বাবু যাবেন রোজ ধোয়া কাপড় পরে সন্ধ্যার পর ফূর্ত্তি উড়াতে, আর আমি ঐ জ্বরে-গা-পোড়া ছেলেকে ফেলে রেখে নিত্যি কাপড় কেচে দেব!"

নীলমণি মারমুখি হইয়া কহিল—"মেরে যে রোজ হাড় গুঁড়ো করে দি'—তাতেও তোর লজ্জা হয় না? কেবল মুখের উপর কথা! যদি কাজ করতেই না পারবি—তবে এখানে পড়ে আছিস্ কেন? মামাবাড়ী চলে গেলেই পারিস্।"

সুধা কহিল—"কেন সেখানে যাব? যদি খেতে দিতে না পারবে, যদি আমি তোমার এম্‌নি ভার হয়ে দাঁড়াব,—তাহ'লে কেন আমায় বিয়ে করেছিলে,—কেন আবার ছেলের সখ হয়েছিল?"

নীলমণি মুখ ফিরাইয়া কহিল—"আমি কি তোকে সেধে বিয়ে করতে গিয়েছি যে লম্বা কথা শোনাচ্ছিস্? কেন তোর মামা পায়ে ধরে সেধে নিয়ে গিয়েছিল, তাই জিজ্ঞেস করি?"

সুধার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, কহিল—"তা' জানিনে। শুধু এইটুকু জানি, তুমি আমায় তোমার ঘরে স্থান দিয়েছ, তুমি আমার স্বামী। তুমি আমার উপর যত জুলুম কর সহ্য হবে—কিন্তু ঐ রোগা ছেলের দিকে একটু তাকাও। ওকে ডাক্তার দিয়ে দেখাও। আজ তিন দিন জ্বরের ঘোরে বেহুঁস্ হয়ে রয়েছে—ও বুঝি আর বাঁচ্‌বে না।"

নীলমণি বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে কহিল—"অমন ছেলের মরাই ভাল। যে ছেলে জন্মে অবধি জ্বালাচ্ছে—তাকে গলা টিপে মেরে ফেলা ভাল।"

"তবে তাই কর গো, তাই কর। তোমার ঐ হাত দিয়ে আগে আমার গলা টিপে মেরে ফেল—তার পর ছেলের দফাও নিকেশ করে দাও। আমরা সকল জ্বালা থেকে উদ্ধার পাই। কিন্তু কেন ছেলে জন্ম অবধি এম্‌নি ভাবে জ্বালাচ্ছে আর নিজেও জ্বলছে? সেও তোমারই পাপে। ওর সারা গা দিয়ে যে ঘা বেরিয়েছে—সেও তোমারই পাপের ফলে। তোমরা পুরুষ মানুষ, তাই এততেও মুখ দিয়ে জোরের কথা বেরোয়—কিন্তু আমাদের একটু কিছু হলে লজ্জায় আর মুখ দেখানো চলে না।"

নীলমণি সুধার কথার অর্থ বুঝিয়া ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—"কে তোমায় বলেছে,—আমারই দোষে ছেলের সর্ব্বাঙ্গে ঘা বেরিয়েছে?"

"কে আবার বলবে—ডাক্তার বলেছে। তুমি কি মনে কর, বাপ হয়ে তুমি চুপ করে আছ বলে' আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারি। এ যে মায়ের প্রাণ। তাই লজ্জা-সরম ত্যাগ করে আমাকেই ডাক্তার ডাক্‌তে হ'লো। যার স্বামী এমন অপদার্থ—তার আবার স্ত্রীর মানসম্ভ্রম কোথায়!"

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া কহিল—"কিন্তু ডাক্তার ডাকবার খরচটা কে দিলে শুনি? সেটা কি ধারে চল্‌ছে,—না নিজের ইজ্জত দিয়ে ছেলের চিকিৎসা হচ্ছে?"

তাঁহার কথায় অর্থ সুধা পরিষ্কার বুঝিতে পারিল। কিন্তু সেও তেজের সহিত জবাব দিল—"তাও হয় তো এক দিন না এক দিন দিতে হবে। সমর্থ স্ত্রীকে একলা এই নরককুণ্ডে ফেলে রেখে যে স্বামী দিনের পর দিন বাইরে কাটায়, তার ইজ্জত কি করে বেশী দিন থাকবে? আমি বলেই এত দিন টিঁকে আছি—আর কেউ হলে—"

মুখ ফিরাইয়া নীলমণি কহিল—"আর কেউ হলে খাতায় নাম লিখাতো। কিন্তু কি আস্পর্দ্ধা—আমার মুখের সাম্‌নে এ কথা বল্‌তে তোর লজ্জা হ'লো না?"

"লজ্জা? রাতদুপুরে যার ঘরের দরজায় পাড়ার বদমায়েসেরা ঘা মারে,—যাকে উদ্দেশ করে বাড়ীর সাম্‌নে বিনা বাধায় অশ্লীল গান গায়,—যার দিকে দিনের পর দিন মন্দ লোকের কুৎসিত দৃষ্টি পড়ে আছে—তার আবার সম্ভ্রম কোথায়? যার স্বামী এমন হৃদয়হীন পিশাচ যে স্ত্রীর অপমান দিন-দিন বাড়িয়ে তুলছে, তার আবার লজ্জা কিসের? না, আমার লজ্জা নাই, অপমান নাই, সম্ভ্রম নাই, ইজ্জত নাই—সব গিয়েছে সেইদিন থেকে, যেদিন আমার ভাগ্যে তোমার মত অপদার্থ স্বামী জুটেছে!"

"চুপ কর হারামজাদি! আমি হলুম অসৎ, আর যে ইয়ারকি দিয়ে লোকের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে—সে হ'লো সতী!"

সুধা আর সহ্য করিতে পারিল না। সে উদ্দীপ্ত চোখে স্বামীর দিকে চাহিয়া তেজের সহিত কহিল—"চুপ কর, ওগো, চুপ কর। এখনও চন্দ্র সূর্য্য উদয় হচ্ছে—অমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো না, ভগবান সহ্য করবেন না।"

"না—ভগবান তোমার কীর্ত্তিকলাপ সহ্য করবেন। কিন্তু আমিও তোমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যাব। সদর-দরজায় তালা বন্ধ করে বেরিয়ে যাচ্ছি—যত দিন না এইখানে ছেলে সুদ্ধ না খেতে পেয়ে মরছিস্—তত দিন আর এমুখো হচ্ছিনে। দেখি—কোন্ ভগবান তোকে রক্ষা করে।" এই বলিয়া সে দ্রুত বাহির হইয়া গেল। সুধা সেই জায়গায় নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। স্বামী যে তাহার কথানুযায়ী কাজ করিল—সদর-দরজায় তালা-চাবি লাগানোর শব্দ শুনিয়াই তাহা বুঝিতে তাহার আর বিলম্ব হইল না।

(৫)

"মা"—

সুধা পুত্রের মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—"বাবা!" অতি ক্ষীণ কণ্ঠে দুই বৎসরের শিশু কহিল "জল!" সুধা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিল—"ভগবান্!"

আজ তিন দিন সুধা এই ঘরে বন্দিনী। আহার নাই, নিদ্রা নাই,—এমন কি, আজ একবিন্দু জল পর্য্যন্ত মুখে পড়ে নাই! প্রত্যহ রাস্তার কল হইতে সুধা জল লইয়া আসিত—কিন্তু সদর-দরজায় তালা বন্ধ থাকায় আজ তিন দিন জল আনা হয় নাই। যেটুকু ছিল, এ দুদিন চলিয়াছে,—এখন আহার তো দূরের কথা—জল অভাবেই মরিতে হইবে। তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া সমস্ত দেহ একবিন্দু জলের প্রতীক্ষায় ছটফট করিতেছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও নিদারুণ যন্ত্রণা—মৃত্যুশয্যায় শয়ান পুত্রটির মুখে একবিন্দু জল দিতে পারিল না। ক্ষুদ্র শিশু মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে বারংবার জল চাহিতেছে—কিন্তু সে এমনি হতভাগিনী যে, ঔষধ-পথ্য দূরের কথা—পুত্রের শেষ সময়ে এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত তাহার জুটিল না রে!

আজ সারাদিন সে নিজের দেহ-মনের সহিত যুঝিয়াছে। মনকে বুঝাইয়াছে যে, এম্‌নি করিয়া পুত্র সহ সেও ইহলীলা সম্বরণ করিবে। কিন্তু যখনই শিশু পুত্রের পিপাসা-কাতর মৃত্যু-ছায়া-মণ্ডিত শুষ্ক মুখের দিকে সে চায়—অম্‌নি দেহ-মন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সে ভাবে—যাক তার ইহকাল-পরকাল, যাক তার ধর্ম্ম—সে আর কিছু চাহে না,—শুধু বিনিময়ে একটু জল!

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হওয়ায় আশেপাশের ঘরগুলি ক্রমশঃ নিস্তব্ধ, নীরব হইয়া আসিল। কিন্তু সুধার বক্ষ-স্পন্দন আরও দ্রুত তালে চলিতে লাগিল। আজ এই কদর্য্য পল্লীতে আশেপাশের কদর্য্য হল্লা তাহার বুকে যে কতটা বল দান করিতেছিল, তাহা এখন সে যতটা বুঝিতে পারিল, এম্‌নটি আর পূর্ব্বে অনুভব করে নাই। সে একবার পুত্রের মুখের দিকে চাহিল, একবার ভগবানের নাম স্মরণ করিল। তার পর অস্থির-পদে ঘরের সঙ্কীর্ণ স্থানের মধ্যে বারংবার পদচারণা করিয়া ফিরিতে লাগিল।

আবার অতি ক্ষীণকণ্ঠে সুদূর পথের যাত্রী শিশু ডাকিল—"মা!"

সুধা কাণ পাতিয়া সেই শব্দ শুনিয়া, ছিন্ন শয্যার প্রান্তে আসিয়া, শিশুর মুখের উপর পড়িয়া আবেগ-ভরে ডাকিল—"খোকা, বাবা!"

"একটু জল!"...সহসা বাড়ীর সাম্‌নে রাস্তায় কদর্য্য প্রেমের সঙ্গীত শুনিয়া সুধার মুখে ক্রুর হাসি ফুটিয়া উঠিল। অস্বাভাবিক কণ্ঠে সে কহিল—"জল! জল! মাণিক আমার, একটু সবুর কর, এখুনি দিচ্ছি।" তড়িৎবেগে সুধা রাস্তার পাশের জানালাটি অনেক দিন পরে খুলিয়া তীক্ষ্ণ-স্বরে ডাকিল—"বিপিন!"

বিপিন জানালার নিকটে আসিতেই, সুধা অস্বাভাবিক স্বরে কহিল—"একটু জল দিতে পার!...একটুখানি জল! পরিবর্ত্তে তুমি যা চাও, তাই পাবে। আর আমি আপত্তি করবো না।"

বিপিন সহসা যেন থতমত খাইয়া গেল, কহিল—"এর মানে কি?"

"তুমি যদি এই মুহূর্ত্তে একটু জল ভিক্ষা দিতে পার, আমি আজীবন তোমার দাসী হয়ে থাকবো।"

বিপিন আর ইতস্ততঃ না করিয়া, বলিষ্ঠ নিপুণ হস্তে দরজার তালা ভাঙ্গিয়া, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই, ঘটি লইয়া বাহির হইয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরেই জল সমেত ফিরিয়া আসিল।

সুধা জল লইয়া পুত্রের মুখে দিল—কিন্তু শিশুর তখন এমন সাধ্য নাই যে, এক বিন্দু জলও গিলিতে পারে। জলটুকু গলায় আটকাইয়া তাহার চোখ কপালে উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণ প্রাণটুকুও বাহির হইয়া গেল। সুধা পুত্রের মুখের দিকে অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিল। তার পর তাহার হাতের পাত্রটি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া, শয্যাপ্রান্ত হইতে উঠিয়া বলিল—"চল।"

হতবুদ্ধি বিপিন কহিল—"কোথায়?"

"যেখানে নিয়ে যাবার জন্য দিনের পর দিন আমায় উত্যক্ত করে তুলেছিলে! সব কি এরই মধ্যে ভুলে গেছ? না,—আজ তোমাকে কিছুতে ছাড়ছিনে। ভাব্‌ছো, বুঝি পাগল হয়ে গিয়েছি। না গো না—এ যে নারীর প্রাণ, এতে অনেক সয়।"

বিপিন ইতস্ততঃ করিতেই, সুধা ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল—"এখন সাহস হচ্ছে না বুঝি! কিন্তু আমি তো সেই সুধাই আছি, যাকে উদ্দেশ করে তোমাদের অফুরন্ত প্রেমের গান চলতো,—যাকে নরকের পথে সঙ্গী করবার অভিলাষে কত অভিসন্ধিই না তোমাদের করতে হয়েছে। নাও—আর দেরী করো না।"

বিপিন ভাবিল—সুধা পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মুখে কহিল—"খোকা"—

"হ্যাঁ—ওকে সঙ্গে করেই নিয়ে যাব বৈ কি!" তার পর সন্তানের শয্যাপ্রান্তে ফিরিয়া, মৃত শিশুকে বুকের উপর জাপটাইয়া ধরিয়া, তাহার মুখে অসংখ্য চুমো খাইতে খাইতে, বিকৃত স্বরে বলিতে লাগিল—"আহা, বাছা আমার! এক ফোঁটা জলের অভাবে অভিমান করে চলে গেলি! না, রাগ করিস্‌নে মাণিক, এমন জায়গায় তোকে এবার রেখে আসবো যে, আর জলের অভাব হবে না।"

তার পর বিপিনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—"চল বিপিন, এইবার খোকাকে আমার গঙ্গা মায়ের কোলে দিয়ে আসি।"...এই বলিয়া সে নিজেই বিপিনের হাত ধরিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

দিন সাতেক পরে নীলমণি বাড়ীতে ফিরিয়া, সদর-দরজা উন্মুক্ত দেখিয়া, একেবারে আগুন হইয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু ঘরে কাহাকেও দেখিতে পাইল না। পুত্রের শেষ শয্যা তেম্‌নি পাতা রহিয়াছে, অদূরে মেঝের উপর গেলাসটি ধূলায় গড়াইতেছে, কিছু দূরে খানিকটা জলসমেত পিতলের ঘটিটি পড়িয়া আছে—ইহা ছাড়া ঘরে—সুধা বা তাহার পুত্রের অস্থি-মাংস দূরের কথা—একগাছি কেশ পর্য্যন্ত নাই। নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিতে লাগিল—"সতী সাধ্বী নিজের পথ দেখেছেন! যাক্—আপদ গিয়েছে।" এই বলিয়া সে ঘটিটি তুলিয়াই, ঢক ঢক করিয়া খানিকটা জল পান করিয়া লইল। তার পর সেইখানেই মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

খৃষ্টান তীর্থরাজ পাদোহ্বা

অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম-এ

(১)

হ্বেরোণা হইতে ঘণ্টা ছয়েকে পাদোহ্বায় পৌছানো গেল। এই শহরকে ফরাসীরা জানে "পাদু" বলিয়া। ইংরেজি নাম প্যাডুয়া। জার্ম্মাণদের উচ্চারণে ইহার রূপ পাডোহ্বা। ভারতবাসীও ইচ্ছা করিলে পাদোহ্বার এক ভারতীয় সংস্করণ জারি করিতে পারেন। বাধা দিবার কেহ নাই।

মাইলের পর মাইল চোখে পড়িল কেবল বিকট ন্যাড়া ডালপালাহীন গাছের সারি। মাঠগুলা সমতল। পেঁট্রা খোলাখুলির ধুম পড়িয়া গেল। "নয়া কোনো চিজ আছে কি? থাকিলেই মাশুল!"

(২)

বড় সড়কটা মফঃস্বলের শহরের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কয়েকটা মস্ত মস্ত ইমারতও নতুন মাথা তুলিয়াছে। অনতিদূরে ফ্যাক্টরি মহাল্লার চিহ্নও দেখা যাইতেছে। একটা পুল (পোন্তে মোলিনো) পার হইতে হইল।

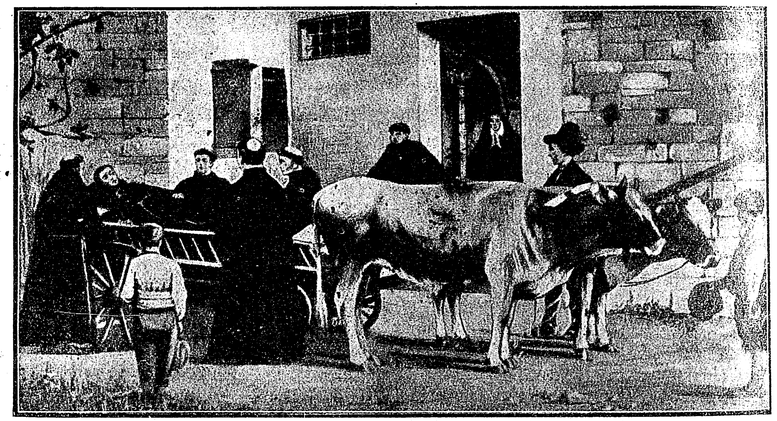

গোশকটে মুমূর্ষু সান্তোনিও (১১ জুন ১২৩১)

আশে পাশে দূরে অতি দূরেও কোনো পাহাড়-পর্ব্বতের টিক্কি দেখা যাইতেছে না। শীত এবার জবর পড়িয়াছে —মায়, পাদোহ্বা অঞ্চলেও বরফ! ইতালিয়ানরা হিন্দু হইলে এই ধরণের কাণ্ডকে বলিত "কাশীতেও ভূমিকম্প!" এখনও চাষের লক্ষণ মালুম হওয়া সম্ভব নয়।

ষ্টেশনে কেহই জার্ম্মাণও জানে না, ফরাসীও জানে না। শহরে প্রবেশ করিবার পথেই চুঙ্গির আফিস। বাক্স ঘর-বাড়ীগুলা সাধারণতঃ দোতালা বা তেতালা। খিলান আর জানালার সারি মনোরম। বারান্দার স্তম্ভগুলা পর পর সাজানো। এই দৃশ্য গলি ঘোঁচের ভিতরেও অজস্র। ইটের দালান। পাথরের রেওয়াজ বেশী নয়।

কোনো কোনো গলির দুই "ফুট পাথ"ই দালানগুলার বারান্দা বিশেষ। রাস্তার এক কিনারা হইতে অপর

কিনারায় পৌছিতে আকাশের নীচে নামিতে হয় না। জল-বৃষ্টির সময়ও বিনা ছাতায়ই এইরূপ বারান্দা-ফুট-পাথের সাহায্যে বহু দূর চলা-ফেরা করিতেছি।

আগাগোড়া পাড়াগাঁ বলিলেই চলে। বড় সড়কটায় যা কিছু শহুরে জীবনের ধুম-ধাম। মধ্যযুগের বাস্তু দু' একটায় জাঁক কিছু কিছু দেখিতেছি। ভারতীয় মফঃস্বলের দ্বিতীয় শ্রেণীর শহরে আর পাদোহ্বায় বড় একটা প্রভেদ পাওয়া যাইবে না। তবে আধুনিকতার সাক্ষী এখানে বিজুলীবাতী আর তাড়িতের ট্রাম। মোটরকারও অবশ্য চলিতেছে। তবে বৃষ্টির সময় কাদা, আর রোদ উঠলে ধূলা সকল রাস্তায়ই নিত্য-সহচর।

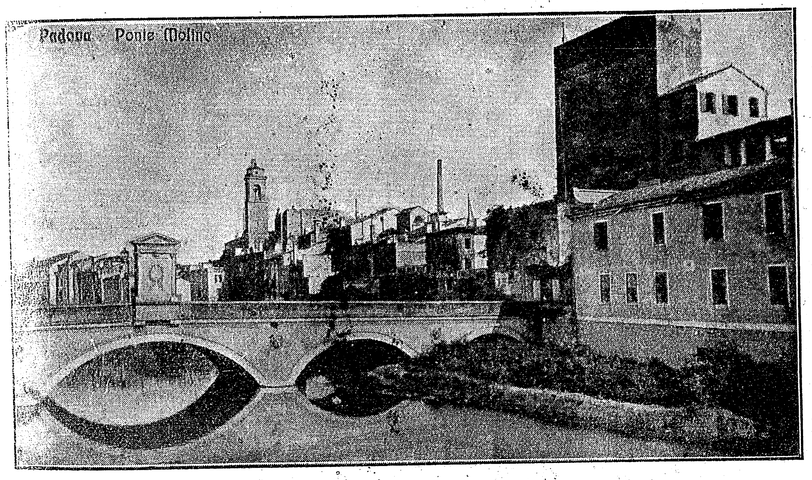

মোলিনো সাঁকো (পাদোহ্বা)

(৩)

ইতালিয়ানদের চেহারায় ইতিমধ্যেই প্রধানতঃ দুই শ্রেণী দেখিতেছি। কোনো কোনো পুরুষকে জার্ম্মাণিতে কিম্বা ফ্রান্সে বা আমেরিকায় দেখিলে ইহাদিগকে নিশ্চয়ই ইহুদি বিবেচনা করিতাম। ইহুদি জাতীয় নাক চোখ ও সাধারণ মুখশ্রী এ পর্য্যন্ত রেলে এবং পাদোহ্বার পথ-ঘাটে হামেশা পাইয়াছি। ইহাদের অনেকেই ইহুদি নয়। অর্থাৎ খৃষ্টান।

নাক চোখ ও মুখের ভঙ্গী ছাড়া ইহুদি চিনিবার আর এক উপায় হইতেছে গায়ের রঙ। ইহুদিরা কিছু কালো। কাজেই ইয়োরামেরিকায় যে সকল ভারতসন্তান বসবাস করে তাহাদের রঙ কথঞ্চিৎ ফর্সা হইলে লোকে প্রথমেই তাহাদিগকে ইহুদি জাতির অন্তর্গত করিয়া বসে। কিন্তু অনেক স্থলেই কি মুখশ্রী কি রঙ, দুইই ইহুদি খৃষ্টান ও ভারতীয় ইত্যাদি জাতি-ভেদের কাজে ভুল সাক্ষ্য দেয়।

ইতালিয়ান নারী মহলেও "ইহুদি-সুলভ" মুখ চোখ এবং রঙ সর্ব্বদা চোখে পড়িতেছে। খাঁটি ইতালিয়ানদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে বুঝিতেছি, আমার অনুমান আগা-গোড়া অঠিক। অর্থাৎ খৃষ্টান ইতালিয়ান নর-নারী অনেকেই কিছু কালোও বটে। আর ইহাদের মুখ কথঞ্চিৎ চ্যাপটা এবং নাকের মাঝখানটা কিছু উঁচাইয়াও উঠে।

ইহুদি ও খৃষ্টান জাতি-ভেদের "নৃতত্ত্ব"টা রুদ্ধ হইয়া গেলেও, ইতালিতে আর এক সমস্যায় আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। যে সকল লোককে কোনই মতেই ইহুদি শ্রেণীর অন্তর্গত করা যায় না,—অর্থাৎ খাঁটি শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ইতালিয়ানদেরও অনেকেরই চুল কোঁকড়া। এইখানে

নিগ্রো নৃতত্ত্বের মামলা। মিশরের মুসলমান মহলে এই ধরণেরই চুল দেখা যায়।

চুলগুলা কেবল কোঁকড়া মাত্র নয়। অনেকটা উস্‌খু-খুস্‌কুও বটে। ইয়াঙ্কি যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের মাথায় প্রায় এই ধরণের চুলই দেখিয়াছি। ইতালিতে বলিব যে—উত্তর আফ্রিকার চুল বিরাজ করিতেছে। এ ঠিক নিগ্রো চুল নয়।

এই সকল বিশেষত্বহীন "ইয়োরোপীয়ান-সুলভ" অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও পাদোহ্বার হাটে-বাজারে নজরে আসিতেছে। কিন্তু তবুও মামুলি ধাঁচের ইতালিয়ান নর-নারীকে

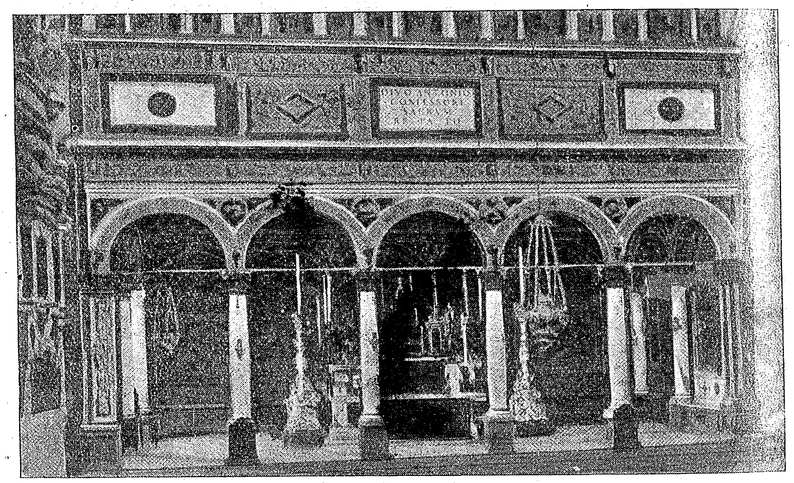

আন্তোনিয়ো গির্জ্জার ভিতরকার দৃশ্য (পাদোহ্বা)

দেখিবামাত্র জার্ম্মাণ বলিয়া ভ্রম হওয়া কঠিন। শ্বেতাঙ্গ খৃষ্টান ইতালিয়ানরা "ছিপ্‌ছিপে" "রোগা"। অর্থাৎ বহরে ইহারা সাধারণতঃ বিশাল নয়। অধিকন্তু চুল ইহাদের কালো বা কৃষ্ণাভ অথবা বাদামি। কিন্তু জার্ম্মাণরা সাধারণতঃ "ব্লণ্ড্" বা শ্বেতাভ চুলের অধিকারী। আর জার্ম্মাণদের বপু—স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই—বেশ কিছু বিস্তৃত পরিমাণ আকাশ দাবী করিতে অভ্যস্ত।

(৪)

শীতকালেও ঘর গরম করা ইতালিয়ানদের দস্তুর নয়। কাজেই চীন, জাপান, ভারতের লোকজনের মতন ইতালিয়ান নর-নারীও শীত বরদাস্ত করিতে ভয় পায় না। কিন্তু ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইংরেজ, আমেরিকান ইত্যাদি পাশ্চাত্যেরা ফেব্রুয়ারী মাসে বাঘা শীতের জন্য প্রস্তুত থাকে। চোপর দিন ঘর গরম রাখা ইহাদের দস্তুর। এই সব জাতীয় লোক ইতালিতে আসিলে মহা বিপদে পড়ে। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর হোটেল ছাড়া ইতালির কোনো শহরে ঘর গরম করিবার আয়োজন নাই। অবশ্য এই ধরণের হোটেলে বসবাস করা বহু লোকের পয়সায়ই কুলায় না।

বেচারা ভারত-সন্তান দশ বৎসর ইয়োরামেরিকায় থাকিতে থাকিতে শীতকালে গরম ঘরের মহিমা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন! পাদোহ্বায় পদার্পণ করা মাত্র ইতালিতে এই হিসাবে "আধুনিকতার অভাব" বেশ লক্ষ্য করিতেছি। ইহার নাম "গরীবের ঘোড়া রোগ"। শীত যদিও দিল্লী লাহোরের মাত্রা ছাড়ায় না, তবুও ঠাণ্ডা ঘরে কয়েক ঘণ্টা কাটানো এক প্রকার অসম্ভব বোধ হইতেছে।

শাস্ত্রে আছে,—"শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়ায়ে তাই সয়।" সুতরাং ঠাণ্ডা ঘরে বসবাস করা ইতালিয়ান,

জাপানী, চীনা, ভারতবাসী ইত্যাদির পক্ষে একটা অতি-কিছু কৃচ্ছ্রসাধন নয়। কিন্তু অপর দিকে, একবার গরম ঘরের মায়ায় পড়িলে সে মায়া কাটাইয়া উঠা রক্তমাংসের শরীরের পক্ষে অতি মাত্রায় সংযম পালন,—যাহার শেষ নিষ্পত্তি হয় সর্দ্দি কাসিতে, ইনফ্লুয়েঞ্জায়, ম্যালেরিয়ায়।

যাহা হউক, একজন ছোটখাটো জমিদারের ঘরে অতিথি হইয়াছি। ইতালিয়ান জমিদারকে বলে "বারোণ"। ইহাঁর পত্নী অষ্ট্রিয়ান (জার্ম্মাণ)। কাজেই বাড়ীতে উনন জ্বালিয়া ঘর গরম রাখা হইতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ইহাকে

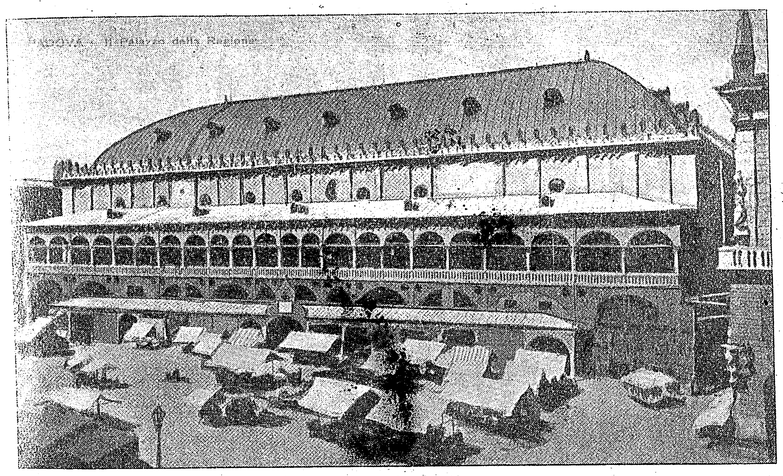

সালোনে প্রাসাদ ও বাজার (পাদোহ্বা)

"জার্ম্মাণ কুল্‌টুরে"র এক অঙ্গ বিবেচনা করিতে হইবে। কেন না "বারোণ" শ্রেণীর অন্যান্য ইতালিয়ান পরিবারে ঘর গরম করা হয় না। বাবু ব্যবসাতে চিকিৎসক। অধ্যাপক হিসাবে স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও নাম লেখানো আছে।

(৫)

পরিবারে এক শিশু। ছেলে শাসন করিবার কায়দায় দেখিতেছি—ইতালিয়ান বাবুটি ভারতবাসীর মাসতুত ভাই। মারপিট, চেঁচাচেঁচি, চোখরাঙানি ইত্যাদি যন্ত্র কায়েম হইয়া থাকে যখন তখন। জননী এ বিষয়ে বিপরীত। এতদিন ইয়োরামেরিকার পরিবারে পরিবারে শিশু সন্তানের লালন পালন যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে লাঠ্যৌষধি নজরে পড়ে নাই। ছেলেপুলেদিগকে কথায় কথায় ট্যাঁ ট্যাঁ করিতেও দেখি নাই।

বাড়ীতে দুই ঝী ঘরের কাজ করে। 'ইহারা আসিয়াছে বাবুর জমিদারী হইতে। বেতন দিতে হয় না। খোর-পোষ পাইয়াই ইহারা সন্তুষ্ট। প্রত্যেক উঠা-বসায় ইহারা গিন্নীকে "বারোণো" রূপে সম্বোধন করিয়া থাকে।

এক অদ্ভুত চিজ খাওয়া যাইতেছে। নাম "বোলেস্তা"। ভুট্টার আটা সিদ্ধ করিয়া আগুনে সেঁকা হয়। খাইতে হয় গরম গরম। বাবুটি দুইবেলা বোলেস্তা খান। সঙ্গে থাকে স্যালাডের কচি পাতা। ব্যস্। ইহাতেই ইনি খুসী। গিন্নী জার্ম্মাণ কন্যা। তাঁহার পক্ষে "বোলেস্তা" গলাধঃকরণ করা যে-সে কথা নয়। জার্ম্মাণদের বিবেচনায় বোলেস্তা "ছোট লোকের" খাদ্য। বড় জোর সপ্তাহে একবার করিয়া মুখ বদলানো চলিতে পারে!

অষ্ট্রিয়ানরা রান্নাবাড়িতে ওস্তাদ। রান্নাবাড়ি বলিলে ঘরকন্নার সকল প্রকার কাজই বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে ইতালিয়ানরা না কি নেহাৎ পশ্চাৎপদ। শুনিলাম:—"অতি উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকের মেয়েরাও না জানে ঘর সুন্দর

রাখিতে, না জানে রান্নাঘরের কোনো কাজ সামলাইতে। ইহারা বাড়ীর বাহিরে আসিবার সময় খুব দামী পোষাক পরিয়া লোক সমাজে দেখা দেয়। কিন্তু ঘরের ভিতর বিরাজ করে চরম নোংরামি, শৃঙ্খলাহীনতা আর দুর্গন্ধ।"

(৬)

ইতালিয়ানদের ঘরকন্না কিরূপ—এখনই বিচার করিতে বসা কঠিন। কিন্তু জার্ম্মাণ-অষ্ট্রিয়ানরা যে এ বিষয়ে উচ্চতম মাপকাঠি অনুসারে নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি চালাইয়া থাকে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

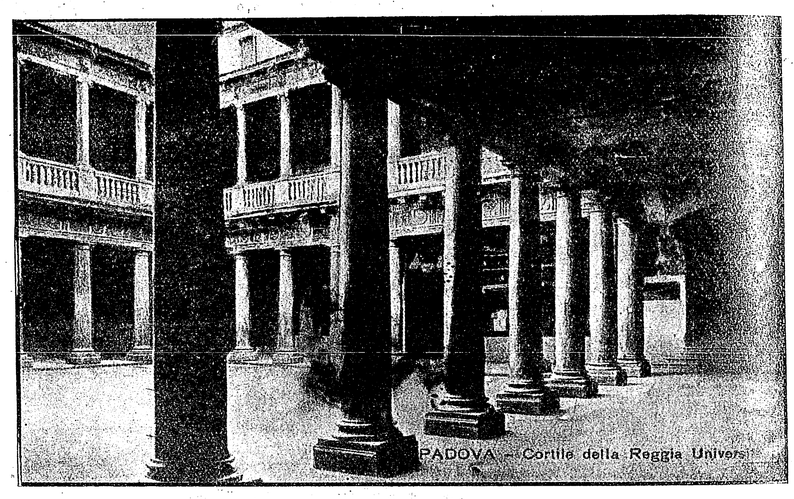

বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা (পাদোহ্বা)

জার্ম্মাণদের রান্নাঘরে প্রবেশ করিলে আগন্তুক মাত্রের আনন্দ হয়। দেখা যায়,—নুন, চিনি, ঘি, চর্ব্বি, মশলা, আটা, তরকারী ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিস যথাস্থানে রক্ষিত হইতেছে। ভাঁড়গুলার গায়ে ছাপার অক্ষরে প্রত্যেক জিনিসের নাম লেখা থাকে। এমন কি দেওয়ালের, টেবিলের এবং আলমারির কোন্ কোণে কোন্ ভাঁড়টার ঠাঁই তাহাও ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাই। বাসনকোসন পরিষ্কার করিবার জন্য যে তোআলে বা ন্যাকড়া ব্যবহৃত হয়, তাহার স্বতন্ত্র ঠাঁই আছে। টেবিল পরিষ্কার করিবার ন্যাকড়ার ঠাঁই স্বতন্ত্র। আবার হাত মুছিবার জন্য তোআলেও স্বতন্ত্র জায়গায় ঝুলাইয়া রাখা হয়।

জার্ম্মাণ-সমাজের যেখানে যেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছি, সর্ব্বত্রই এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আর নিয়ম-বদ্ধতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছে। প্রত্যেক পরিবারের গিন্নীই অতিথিকে নিজ রান্নাঘরটা দেখানো এক চরম গৌরব ও গর্ব্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকে। অতি উচ্চশিক্ষিতা নারীও হেঁসেল-ঘরের রাণী রূপে নিজের কৃতিত্ব জাহির করিতে লজ্জা বোধ করে না।

(৭)

আমেরিকার রান্নাঘরেও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করিবার বস্তু। তবে জার্ম্মাণরা এ বিষয়ে বোধ হয় একেবারে চরমে গিয়া ঠেকিয়াছে। ইতালিয়ানরা জার্ম্মাণদের নিকট পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিয়ম শিখিয়া থাকে। ঠাকু'মা বা ঠানদির নিকট যাহা কিছু শিখা যায়, জার্ম্মাণ বালিকারা একমাত্র তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকে না। গিন্নীপনার বিদ্যালয় জার্ম্মাণিতে, অষ্ট্রিয়ায় বিশেষ ইজ্জৎজনক

প্রতিষ্ঠান। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বড়ঘরের মেয়েরাও হাতে-কলমে গিন্নী হইতে শিখে।

এই বিদ্যাপীঠে কয়েক বৎসর কাটাইয়া যাহারা সংসারে প্রবেশ করে, তাহারা কম-সে-কম দুই হাজার "পদ" রাঁধিতে শিখে। "শুক্তানি হইতে আরম্ভ করিয়া ভূনী খিঁচুড়ি, বা পোলাও কোপ্তা" ইত্যাদি বলিলে ভারতে নবরসের খানাপিনার বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়। জার্ম্মাণ বালিকারা ইয়োরামেরিকান খানাপিনার বিশ্বকোষখানা পুরাপুরি দখল করিতে বাধ্য থাকে।

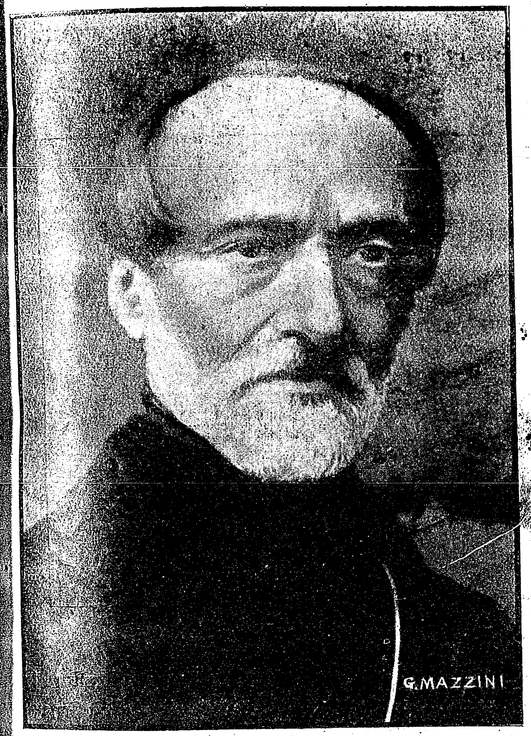

যুবক ইতালির প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা মাৎসিনি

ইহার ভিতর "পিঠাপুলি পকান্নের" কোনো কিছু বাদ যায় না। পেটের অসুখ হইলে কিরূপ পথ্য দরকার, তাহাও গিন্নীপনার বিদ্যাপীঠে জানা হইয়া যায়। দাঁতের ব্যথা, সর্দ্দি, জ্বর, ইত্যাদি ব্যাধি হিসাবে পথ্য তৈয়ারি করা গিন্নীগিরির অন্তর্গত। এক কথায়, পরিবার যদি ঘটনাচক্রে রোগীর বাথানে বা হাস্পাতালে পরিণত হয়, তাহা হইলে জার্ম্মাণ গিন্নীরা পথ্য তৈয়ারি সম্বন্ধে হা-হুতাশ করে না।

রান্নাবাড়ির শিক্ষায় আগুনের তাপ ও মাত্রা, খাদ্য দ্রব্যের রাসায়নিক দোষ-গুণ ইত্যাদি "বৈজ্ঞানিক" তথ্যও প্রচারিত হয়। অধিকন্তু, খরচপত্রের অঙ্ক কষিয়া এক একটা খানার দাম নির্দ্ধারণ করাও গিন্নী-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শিক্ষনীয়।

(৮)

রান্নাবাড়ি আর রোগীসেবা গৃহস্থালীর দুই বড় কাজ। আর এক বড় কাজ হইতেছে কাঁথা শেলাই করা, জামা মেরামত করা, আর কাপড় চোপড় ধোলাই করা। অর্থাৎ বুনন বলিলে যাহা কিছু বুঝা যায়—জার্ম্মাণ "হাউস হাল্টুঙস্-শুলে"তে তাহার সকল দফাই শিখিতে হয়। কাপড় কাচা বড় সহজ চিজ নয়। তুলা, লিনেন, রেশম, পশম ইত্যাদি ভেদে ধোলাই ভেদ হইয়া থাকে। তাহার উপর ইস্ত্রী করার ঝঞ্ঝাট ও রকমারি বলাই বাহুল্য।

গৃহস্থালী এইখানেই সম্পূর্ণ হয় না। ঘরের ভিতর বাহির পরিষ্কার করা আর মেরামত সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান রাখাও গিন্নীগিরির সামিল। তাহার উপর চেয়ার টেবিল ইত্যাদি আসবাব-পত্রের সেবা আছে। ছবি, মূর্ত্তি ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৌখীন দ্রব্যে ঘর সাজাইবার কায়দাও না শিখিলে গিন্নীর লাইনে কেহ ওস্তাদ হইতে পারে না। অধিকন্তু, সঙ্গীত এবং শারীরিক ব্যায়ামের জন্য এই বিদ্যা-পীঠেই ছাত্রীদের অভ্যাস গড়িয়া তোলা হয়।

শুনিতেছি, ইতালিতে শিল্পী-শিল্পের জন্য এই ধরণের কোনো রূপ উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নাই। নেহাৎ "প্রিমিটিভ" বা আদিম অবস্থায়ই ইতালিয়ানদের পারিবারিক জীবন চলিয়া থাকে। ইহারা বৈঠকখানাটা ফিট্‌ফাট রাখে। কিন্তু রান্নাঘর, শোবার ঘর, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি কুঠ্‌রিতে অতিথিকে লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ করে।

(৯)

মফঃস্বলের শহরেও চৌরাস্তায় চৌরাস্তায় স্থাপত্যের ছড়াছড়ি দেখিতেছি। শহরের অতি-লোক-সমাগমপূর্ণ

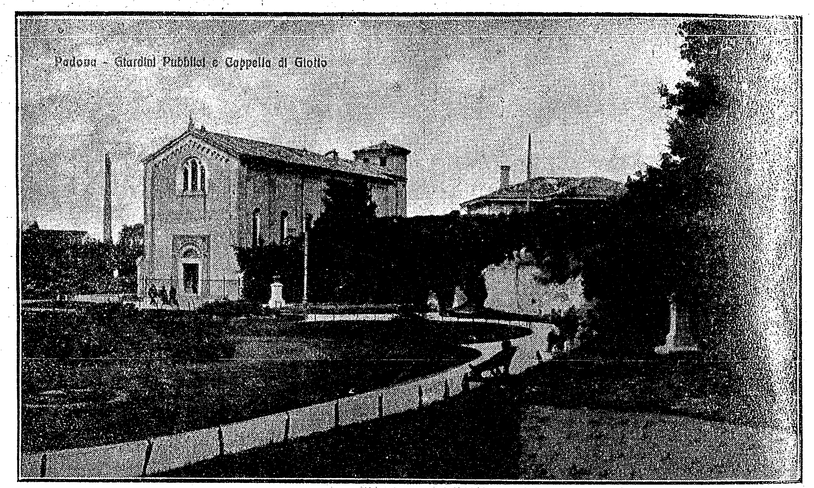

জ্যোত্তের গির্জ্জা (পাদোহ্বা)

স্থানে "পিয়াৎসা কাহ্‌বুর।" পিয়াৎসা শব্দের অর্থ প্লাস, প্লাট্‌স্ বা প্লেস্, অর্থাৎ চৌরাস্তা জাতীয় রাস্তার উপরকার উঠান বিশেষ।

"পিয়াৎসা গারিবাল্‌দি"ও শহরের বড় কেন্দ্র। কাহ্‌বুরের কৌটিল্যনীতি আর গারিবাল্‌দির সমর-শক্তি ইতালিকে অষ্ট্রিয়া হইতে স্বাধীন করিয়াছে। সে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের কথা। হ্বেনেৎসিয়া এবং লম্বার্দি এই দুই জেলা অর্থাৎ গোটা উত্তর ইতালি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গারির অধীনস্থ প্রদেশ ছিল। কাজেই উত্তর ইতালির লোকেরা উঠিতে বসিতে এই দুই কর্ম্মবীরের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে।

সেই যুগের "রিসোর্জিমেন্তো" বা বিপ্লব-প্রচেষ্টায় পিয়েমোন্তে প্রদেশের রাজা বা নবাব বিপ্লবীদের সহায় হন। তাঁহার নাম হ্বিক্তর এমানুয়েল। পিয়েমোন্তে উত্তর-ইতালির পশ্চিমতম জেলা,—ফ্রান্সের লাগাও। হ্বিক্তর এমানুয়েলের বিরাট মূর্ত্তিও পাদোহ্বাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম :—"রিসোর্জিমেন্তোর সকল বীরেরই মূর্ত্তি দেখিতেছি। কিন্তু মাৎসিনির মনুমেণ্ট কোথায়?" সে "মাৎসিনি পিয়াৎসায়" লইয়া গিয়া বলিল :—"এই দেখুন মাৎসিনি মূর্ত্তি।" পাড়াটা ঠিক জাঁকজমকপূর্ণ নয়, কিন্তু মূর্ত্তি অন্যান্য মূর্ত্তিগুলার জুড়িদারই বটে।

(১০)

মাৎসিনিকে ইয়োরোপে এবং ভারতে যত বড় বিবেচনা করা হইয়া থাকে, ইতালিয়ানরা স্বয়ং তত বড় বিবেচনা করে না। ইতালিয়ানদের চিন্তায় বীর ত বীর গারিবাল্‌দি

বীর। গারিবাল্‌দি বড় কি কাহ্‌বুর বড়—ইতালিতে এই বিষয়ে তর্ক-প্রশ্ন চলে। কিন্তু গারিবাল্‌দি বড় কি মাৎসিনি বড়, অথবা কাহ্‌বুর বড় কি মাৎসিনি বড়—এই ধরণের সওয়াল সাধারণতঃ উপস্থিত হয় না।

ভারতে ১৯০০ সাল যাঁহারা সুরু করিয়াছিলেন তাঁহারা মাৎসিনি এবং গারিবাল্‌দি এই দুইজনকে সমান চোখেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই দুই জনের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি ভারতীয় জননায়কগণকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অর্দ্ধে বিশেষ রূপেই অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বলিতে কি, মাৎসিনি-গারিবাল্‌দি ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দীক্ষাগুরু স্থানীয়। ইঁহাদের নাম জপ করা সেকালে স্বাদেশিকতার অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত।

মাৎসিনি আদর্শ প্রচারক, ভাবুক, দার্শনিক। যুবক ইতালিকে কর্ত্তব্যের পথ দেখাইয়া তিনি স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আর একটা জাতিকে স্বাধীন করিয়া দেওয়া দুই স্বতন্ত্র বস্তু।

ইতালিয়ান যুবক বলিতেছেন—"সেনাপতি গারিবাল্‌দির সমর-প্রচেষ্টাই ইতালীকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে। জনসাধারণ সেই কর্ম্মবীরের অসাধ্য-সাধনই পূজা করিতে অভ্যস্ত। দার্শনিক, কবি বা আদর্শ প্রচারকের সাহায্যে সে যুগের ইতালিবাসীর চিত্ত কতখানি গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা আলোচনার সামগ্রী। বলা বাহুল্য, দেশের সাধারণ লোক সে সব বুঝে সুঝে না। গারিবাল্‌দি না থাকিলে ইতালি স্বাধীন হইত না,—এ কথা যে-সে লোকই বুঝিতে পারে। কিন্তু মাৎসিনির মতন লোক না থাকিলে ইতালিয়ান জাতি স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিত না,— এ কথা স্বীকার করিতে বহু লোকই রাজি হইবে না।

(১১)

স্বদেশ-সেবা, স্বার্থত্যাগ, কষ্ট-স্বীকার, নির্য্যাতন ভোগ ইত্যাদি হিসাবে মাৎসিনি গারিবাল্‌দিতে উনিশ-বিশ করিতে বসিবার প্রয়োজন নাই। বরং অনেকে হয় ত মাৎসিনিকে উচ্চতর স্থানই দিবে।

কিন্তু স্বাধীনতা জিনিষটা বক্তৃতার বা লেখালেখির মাল নয়। "কেজো" লোকের বীরত্ব, কেজো লোকের ধড়িবাজি, লাঠিশোটার আওয়াজ, এই সব যেখানে নাই, স্বাধীনতা সেখানে মুখ দেখায় না। গারিবাল্‌দি এই কেজো লোকের একজন। এই জন্যই ১৯২৪ সালের ইতালিতে



দান্তে (জ্যোত্তোর আঁকা)

গারিবাল্‌দি যত বড়, মাৎসিনি তত বড় নন। এই কারণেই আবার কাহ্‌বুরও মাৎসিনির চেয়ে ইতালিয়ান সমাজে বেশী পরিচিত।

অথচ যখন গোটা ইয়োরোপের সাহিত্য বা দার্শনিক চিন্তার ধারা আলোচনা করিতে বসি, তখন দেখি যে, মাৎসিনির কিম্বৎ অতি উঁচু। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় চিন্তামণ্ডলে মাৎসিনি এক যীশুখৃষ্ট। চিন্তায় আর

কর্ম্মে এই প্রভেদ। কর্ম্মবীর পূজ্যতে স্বদেশে, দুনিয়ায় পূজ্যতে চিন্তাবীর,—এই সূত্র প্রচার করিতে প্রলুব্ধ হইতেছি। চিন্তা জিনিসটা বিশ্ববাসীর সম্পত্তি,—কর্ম্মের প্রভাব প্রধানতঃ স্বজাতি ও স্বদেশের দেওয়ালের ভিতর ঘেরাও হইয়া থাকে।

যুবক ভারত,—"যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্"! পথগুলা সবই বড়, সবই মহান, সবই উঁচু। কিন্তু কে কোন্ পথে চলিবে, তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ খেয়াল, শক্তি ও সুযোগের উপর নির্ভর করে।

(১২)

পাদোহ্বার পথঘাটে ইতিহাস-বিশ্রুত বিজ্ঞানবীর, সাহিত্যবীর ইত্যাদির "বাস্তুভিটা"র সঙ্গে পরিচিত হইতেছি। গালিলেও নামক জ্যোতির্ব্বিদের কথা ভারতে কে না জানে? সেই যুবা প্রবর্ত্তক বৈজ্ঞানিকের পর্য্যবেক্ষণালয় এই শহরেরই এক স্মৃতিস্তম্ভ।

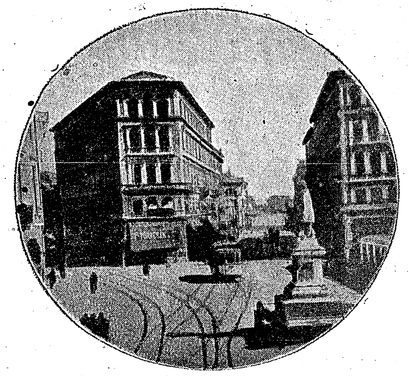

পিয়াৎসা গারিবাল্‌দি (পাদোহ্বা)

কবিবর পেত্রার্কা (১৩০৯-১৩৭৪) ছিলেন ইতালির অন্যতম যুগান্তর সাধক। ভারতে আমরা অন্ততঃ এইটুকু জানি যে, তিনি ছিলেন প্রেমের কবি। আর, "সনেট্" বা চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর জন্মদাতা রূপেও পেত্রার্কা ভারতে পরিচিত বটে। বোধ হয় মধুসূদনের কাব্যে পেত্রার্কার কিছু পরিচয় আছে। সেই পেত্রার্কার মূর্ত্তিও পাদোহ্বায় দেখিলাম।

মহাকবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১) কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের লোক। তাঁহার বিরাট মূর্ত্তিও দেখিতেছি "প্রাতো দেল্লা হ্বাল্লে" নামক পিয়াৎসায় বা পার্ক-সদৃশ চৌরাস্তায়। পার্শ্বেই বিরাজ করিতেছে চিত্রশিল্পী জ্যত্তোর মূর্ত্তি। জ্যত্তো দান্তের সমসাময়িক। দান্তেকে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীর যুগাবতার বিবেচনা করা চলিতে পারে।

"প্রাতো দেল্লা হ্বাল্লে" এক অপূর্ব্ব বাগান। গড়নে ডিম্বাকৃতি। সীমানার উপর সারি সারি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিগুলায় হেলেনেৎসিয়া প্রদেশের মধ্যযুগ বাঁচিয়া রহিয়াছে।

মূর্ত্তি গড়িতে ইতালিয়ানরা চিরকালই ওস্তাদ। পাদোহ্বার মতন একটা ছোটখাটো শহরেও "রূপদক্ষ"দের তৈয়ারি এতগুলা স্থাপত্য একটা বিশেষ-কিছু সন্দেহ নাই। ইয়োরোপের সকল দেশেই স্থাপত্যের এত ছড়াছড়ি দেখা যায় না।

(১৩)

ব্যবসাপাড়ার এক কাফেতে খানিকক্ষণ কাটানো গেল। পাশেই এক ব্যক্তিকে গম্ভীর ভাবে কাগজ পড়িতে দেখিতেছি। বিশেষ মনোযোগের সহিত ইনি "ষ্টক-এক্স্ চেঞ্জে"র দরগুলা পড়িতেছেন। নয়া পুরানা কতকগুলা চিঠির তাড়া কাফির পেয়ালার নিকট টেবিলের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পরিচয়ে জানা গেল ইনি দালাল। ফরাসী এবং জার্ম্মাণ দুই-ই ইহাঁর জানা আছে। পূর্ব্বে হিব্রুয়েনায় গতিবিধি ছিল।

দালাল মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"ফরাসীদের সঙ্গে ইতালির বন্ধুত্ব আর কত দিন টিঁকিবে?" ইনি বলিতেছেন ঃ—"লড়াই থামার পর হইতেই ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালিয়ানদের মন-কষাকষি চলিতেছে। মুসোলিনির আমলে আজকাল শেয়ানায় শেয়ানায় কোলাকুলি ছাড়া আর কিছু নাই। ফ্রান্সের সঙ্গে বনিবনাও হওয়া ইটালির পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব।"

অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে ইটালির ঝগড়া ছিল ত্রেন্তিনো বা দক্ষিণ টিরোল লইয়া। আর একটা বিবাদের কারণ ছিল আড্রিয়াতিক সাগরের ত্রিয়েস্থ বন্দর। দুই মুল্লুকই আজকাল যুদ্ধের ফলে ইটালির হাতে। কাজেই অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখিয়া চলাই ইটালির বর্ত্তমান রাষ্ট্রনীতি।

আর, জার্ম্মাণির সঙ্গে প্রকৃত প্রস্তাবে ইতালির কোনো

ঝগড়াই ছিল না। বর্ত্তমানে মুসোলিনি জার্ম্মাণির সপক্ষে ইতালির চিত্ত গড়িয়া তুলিতেছেন। দালাল মহাশয়ের নিকট শুনিলাম—"জার্ম্মাণ ভাষা শিখিবার দিকে ইতালির ছাত্রসমাজে বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাইবেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ইস্কুল কলেজে জার্ম্মাণ একপ্রকার অবশ্য-পাঠ্য। তাহা ছাড়া, ইতালির বড় বড় ফ্যাক্টরিতে জার্ম্মাণ এঞ্জিনিয়ার ও রাসায়নিক বাহাল করিবার ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। জার্ম্মাণির শিল্প-বিজ্ঞান ও বাণিজ্য-শক্তির সাহায্য না পাইলে ইতালি উন্নতি-লাভ করিতে পারিবে না।"

(১৪)

ফ্রান্সের সঙ্গে আড়াআড়িই আজকাল ইতালির রাষ্ট্রীয় জীবনের বড় কথা। দালালের নিকট এক কাগজওয়ালা আসিয়া বসিলেন। ইনি ফরাসী জানেন। ইতালিয়ান পররাষ্ট্রনীতির চর্চ্চা চলিতে থাকিল।

কাগজওয়ালা বলিতেছেন ঃ—"ভূমধ্য সাগর লইয়া ইতালিতে ফ্রান্সে ঠোকাঠোকি অনিবার্য্য। জার্ম্মাণির সঙ্গে এই বিষয়ে ইতালির কোন গোলযোগ হইতেই পারে না। স্পেনের সঙ্গে বন্ধুত্ব আমাদের পাকিয়া উঠিতেছে। রুশিয়াকে হাত করিবার জন্য মুসোলিনির চেষ্টার ত্রুটী নাই।"

জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—"ভূমধ্য সাগরের আসল মালিক ত ইংরেজ। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইতালির যোগাযোগ আজকাল কিরূপ?" জবাব ঃ—"ইংরেজের নিকট ইতালি অনেক কিছু পাইয়াছে। ১৯১৫ সালে লণ্ডনে যে গুপ্ত সন্ধি হয়, তাহার জোরেই আমরা অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে লড়িতে গিয়াছিলাম। কথা ছিল, যুদ্ধে জয়লাভ হইলে উত্তর ইতালির ত্রেন্তিনো প্রদেশ আর ত্রিয়েস্ত বন্দর আমরা পাইব। ইংরেজের সাহায্যে ইতালির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। কাজেই সকল বিষয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক মতে কাজ করা ইতালিয়ানদের স্বার্থ।"

আফ্রিকার কেনিয়া প্রদেশের জুবালাণ্ড জেলা লইয়া আলোচনা হইল। এই মুল্লুকটাও ১৯১৫ সালের গুপ্তসন্ধি অনুসারে ইতালির পাওয়ার কথা। কিন্তু এখনো ইংরেজ ইতালির হাতে জুবালাণ্ডের দখল সমঝাইয়া দেয় নাই। কাগজওয়ালা বলিতেছেন—"এই লইয়া মুসোলিনি-র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডে কথা-কাটাকাটি চলিতেছে। আপোষ হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী।"

(১৫)

"বাঙ্কা নাৎসিওনালে দি ক্রেদিতো" নামক ব্যাঙ্কের এক শাখা কাহ্বুর চৌরাস্তার উপর অবস্থিত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ করা গেল। ব্যাঙ্কটা গত বৎসর (১৯২৩) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তির ইতিহাস বিচিত্র।

১৯২১ সালে "বাঙ্কা ইতালিয়ানা দি স্কোন্তো" নামক রোমের বিপুল ব্যাঙ্ক ফেল মারে। ব্যাঙ্ক ফেল মারার কারণ অতি সোজা। লোকেরা যে টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখে, ব্যাঙ্কওয়ালারা সেই টাকা লোহার সিন্দুকে পুঁতিয়া রাখে না। সেই টাকা নানা ব্যবসায়ে খাটাইয়া লাভ

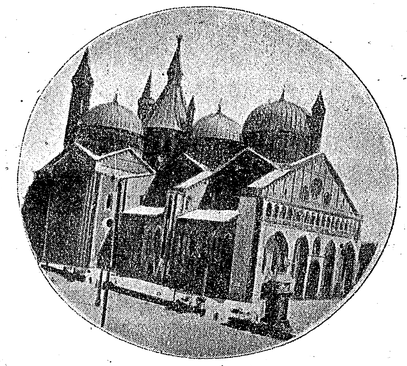

আন্তোনিয়ো গুজ্জা (পাদোহ্বা)

উঠানোই ব্যাঙ্কের কাজ। যে যে ব্যবসায়ে টাকা খাটিতেছে, সেই ব্যবসাগুলার এদিক-ওদিক ঘটিলেই ব্যাঙ্ক স্বয়ংই টলমল করিতে বাধ্য।

লড়াইয়ের হিড়িকে "দিস্কোন্তো বাঙ্কা"র জন্ম হয়। ইতালিতে লোহা-লক্কড়ের যন্ত্রপাতির কারবার পূর্ব্বে এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। ইতালিয়ান শিল্পপতিরা ভাবিয়াছিল যে, যুদ্ধসামগ্রী জোগাইবার অর্ডার পাইলে লোহা-লক্করের কারখানা ইতালিতে পা গাড়িতে পারিবে।

যুদ্ধের সময়টায় গবর্মেণ্টের সাহায্যে অবশ্য কারখানা-গুলা চলিতেছিল একপ্রকার ভালই। কিন্তু লড়াই থামিবার পর গবর্মেণ্টের তরফ হইতে লোহার কারখানায় নিয়মিত প্রচুর চাহিদার আমল উঠিয়া যায়। কাজেই

ইতালির "স্বদেশী" লোহার কারখানাগুলা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে থাকে।

এই সব লোহার ব্যবসারেই দিস্কোন্তো ব্যাঙ্কের টাকা লাগানো হইয়াছিল অনেক। কারখানাগুলার বিপদের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কটা লইয়াও টানাটানি পড়ে। গবর্মেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া ইতালিয়ান নরনারীকে সর্ব্বনাশ হইতে বাঁচাইতে পারিয়াছে। "দিস্কোন্তো" ব্যাঙ্ককে তুলিয়া দিয়া তাহার ঠাঁইয়ে, তাহার জমাপুঁজি কাগজপত্র ইত্যাদি লইয়া একটা নতুন ব্যাঙ্ক কায়েম করা হইয়াছে। তাহার নাম "বাঙ্কা নাৎসিওনালে দি ক্রেদিতো"।



সেণ্ট আন্তোনিয়ো

ম্যানেজার বলিলেন :—"পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাঙ্কে যাহাদের টাকা জমা ছিল, তাহাদিগকে প্রায় দশ আনা অংশ দিয়া নয়া ব্যাঙ্কের সূত্রপাত হইয়াছে। এই নতুন প্রতিষ্ঠানের আর ভয়ের কোন কারণ নাই।"

জোর জবরদস্তি করিয়া কতকগুলা ফ্যাক্টরি খাড়া করিলেই "স্বদেশী আন্দোলন" সুরু করা সম্ভব নয়। কোন্ কারবারটা টেঁকসই, সে সম্বন্ধে অনেক পাকা মাথা খেলানো দরকার।

(১৬)

পাদোহ্বা রোমাণ ক্যাথলিক খৃষ্টানদের অন্যতম তীর্থরাজ। সেইণ্ট বা সাধু আন্তোনিয়োর কবর্ এই নগরে অবস্থিত। সেই কবরের উপর যে মন্দিরটা উঠিয়াছে, তাহার নাম-ডাক দুনিয়ার সর্ব্বত্র। "গথিকের" ছায়া ইহার গড়নে কিছু কিছু লক্ষ্য করিতেছি।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখি, গির্জ্জায় বহুমূল্য ধাতু-রত্নের উপহার জুটিয়াছে প্রচুর। খৃষ্টানদের দেবালয়গুলা আমাদের মঠ-মন্দিরের মতনই উপাসকদের ভক্তির চিহ্নস্বরূপ বহুবিধ "কাঞ্চন মূল্যং" পাইয়া থাকে। দেশ-বিদেশের তীর্থযাত্রীরা অনেক প্রকার দেবোত্তর প্রদান করিতে অভ্যস্ত। "ধাতুরত্নের সংগ্রহ" তীর্থযাত্রীদিগকে দেখাইবার ব্যবস্থাও আছে।

আন্তোনিয়ো দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। পাদোহ্বার নিকটবর্ত্তী এক পল্লীতে তাঁহার অসুখ হয়। গরুর গাড়ীতে করিয়া তাঁহাকে মঠে লইয়া আসা হইয়াছিল। সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনীরা রোগী মুমূর্ষু সাধুকে গাড়ী হইতে নামাইতেছে—এই বিষয় লইয়া সেকালের এক চিত্র আছে।

ইতালিতে গরুর গাড়ীর চল মধ্যযুগের মামুলি কথা। গরুর গাড়ী আজও ইতালির পল্লী হইতে উঠিয়া যায় নাই। গরুর গাড়ীর ভিতর যতখানি ভক্তিযোগ এবং আধ্যাত্মিকতা মূর্ত্তি গ্রহণ করে, তাহা একমাত্র ভারতবর্ষেরই একচেটিয়া গুণ নয়। খৃষ্টানরাও সেই রসে বঞ্চিত নয়।

(১৭)

সাধু আন্তোনিয়োর সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। "ঠাকুরমার ঝুলি"র ভিতর ক্যাথলিক বালক-বালিকারা সেহ সব ছেলেবেলায়ই শুনিয়া থাকে।

আন্তোনিয়ো "ভগবান" যীশুকে "শিশু" ভাবে পূজা করিতেন। দেবতার শিশুত্ব ছিল তাঁহার ভক্তিরসের উৎস। এই কারণে নিজ নিজ শিশুর জীবনে মঙ্গল কামনা করিবার জন্য ক্যাথলিক নর-নারীরা আন্তোনিয়োকে পূজা করে।

আন্তোনিয়োর নামে "মানত" করা, আন্তোনিয়োর মন্দিরে তীর্থ-যাত্রা করিতে আসা সেই পূজারই অন্তর্গত। জাপানী বৌদ্ধরা "জিজো"র এবং বাঙালীরা "মা মঙ্গলচণ্ডী" বা "মা ষষ্ঠী"র কৃপায় ছেলেপুলেদের জন্য যা কিছু লাভ করিয়া থাকে—ক্যাথলিকরা আন্তোনিয়োর মাহাত্ম্যে সেই সবই পায়।

একজন জার্ম্মাণ মহিলা ব্যাভেরিয়ার লাণ্ডশুট্ নগর হইতে এই তীর্থে আসিয়াছেন। ভক্তির মাত্রায় ইনি ভারতের যে কোন নারীকে হটাইতে সমর্থ, এইরূপ বিশ্বাস করিতেছি। অন্ততঃ সমানে সমানে টক্কর চলিবে। এই ক্যাথলিক নারী "ভদ্রলোকে"র ঘরেরই মেয়ে, অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত এবং সঙ্গতিপন্ন লোক ইঁহার স্বামী।

গরমিল

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(প্রথমাংশ)

২

গৃহিণী ছিলেন ফিরিতে না ফিরিতে, নরেশ তড়াক্ করিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া লীলা যে সোফাটায় বসিয়াছিল, তাহার উপর একেবারে লীলার গা ঘেঁসিয়া গিয়া বসিল। এবং তাহার কাঁধের উপর একটী হাত দিয়া তাহাকে ঈষৎ নিজের দিকে টানিয়া লইয়া বলিল, "তোমার সঙ্গে আমার গোটা কতক কথা আছে, এরা কেউ এসে পড়বার আগে তোমায় বলে নিই, শোনো।"

লীলা তখন একখানা বাঙলা মাসিকপত্র খুলিয়া দেখিতেছিল। নরেশকে বলিল, "দেখ, এবার কেমন সুন্দর ছবিখানি দিয়েছে! ওমার খৈয়ামের মুখখানি ঠিক যেন দাদার মতো হয়েছে, না?"

ব্যাকুল হইয়া নরেশ বলিল, "চারুর ওখানে আজ তোমায় নেমতন্ন যেতেই হবে লীলা, নইলে আমি আর তাদের মুখ দেখাতে পার্ব্বো না!"

লীলা মাসিক পত্রখানা আঙুলের ফাঁকে মুড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "আমিও ঠিক মনে করিছি, তুমি এই কথাই বলবে।"

"তাহলে যাবে তো, কেমন?"

"কি ক'রবো, কিছু ঠিক করতে পারছিনি।"

"আমি তোমায় অনুরোধ কর্‌ছি চল!"

"কিন্তু মার আর বাবার সে ইচ্ছে নয়।"

"কিন্তু আমার যে একান্ত ইচ্ছে!"

"মা বাবার অমতেও!"

"দেখ, তুমি যে আমার স্ত্রী, এটা তোমার মনে থাকে না কেন?"

"আমি যে ওঁদেরই মেয়ে, এটাই বা তোমার মনে থাকে না কেন?"

"তাহলে ওই সম্পর্কটাই তোমার বেশি হ'ল, কেমন?"

"সেটা হওয়া কি কিছু বিচিত্র ব্যাপার? ভূমিষ্ঠ হবার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যাদের স্নেহ-মমতায়, যাদের আদর-যত্নে এত বড় হোয়ে উঠলুম, তাদের ওপর টানটা বেশি হওয়াই কি স্বাভাবিক নয়?"

নরেশ সোফার উপর সজোরে একটা চাপড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, "আলবাৎ নয়! বরং বিবাহের পর বাপের বাড়ীর ওপর মেয়েদের বেশি টান থাকাটাকে আমি অস্বাভাবিক বলেই মনে করি। বে'র দিন কি মন্ত্র পড়ে

আমাকে বরণ করেছিলে, মনে আছে? সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে, চিরদিন তুমি আমার অনুগামিনী হবে বলে অগ্নি আর দেবতা সাক্ষী করে যে সেদিন প্রতিশ্রুত হয়েছিলে।"

লীলা হাসিতে হাসিতে উত্তর দিল "দেখ, সে অনেক রাত্রে লগ্ন ছিল, ঘুমের ঘোরে ঢুলতে ঢুলতে কি যে বলিছি কিছুই জানি নি। তার ওপর মন্ত্র-তন্ত্র তো সবই সংস্কৃত—কেবল অনুস্বর বিসর্গ আর চন্দ্রবিন্দুতে ভরা; তার মানে যে কি তার একবিন্দুও আমি বুঝতে পারি নি। এ ছাড়া তার অর্দ্ধেক কথাও আমার মুখ দিয়ে উচ্চারণই হয় নি। বোধ হয় তোমারও হয়েছিল তাই। কেন না, সংস্কৃত ভাষায় তুমি যে আমার চেয়ে বেশি পণ্ডিত নও, এ কথা নিজেই কত দিন ব'লেছো। সে যাই হোক, সেই দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র আউড়ে আমি আর যাই বলে থাকি না কেন, তা বলে নেমতন্ন-বাড়ীতেও যে আমি বরাবর তোমার অনুগামিনী হবো, এ রকম প্রতিশ্রুতি আমি নিশ্চয়ই দিই নি। বিয়ের মন্ত্রটা কিছুই বুঝতে না পারলেও, আমার বিশ্বাস, তার ভেতর কোথাও এমন উপদেশের উল্লেখ নেই যে, লুচি সন্দেশের আহ্বান কদাচ উপেক্ষা করবে না!"

"কিন্তু আমার আহ্বান যে তোমায় সর্ব্বদা মানতে হবে, এ সম্বন্ধে ত কড়া হুকুম আছে!"

"তা জানি, আর এও জানি যে, স্বামী আমার বাপ-মার অবাধ্য হতে কখনই আহ্বান করবেন না।"

"অবস্থা বিশেষে সে রকম আদেশেরও যে প্রয়োজন হয় লীলা!"

"ভগবান করুন, আমার জীবনে যেন সে রকম অবস্থা কখন না আসে!"

"ভগবান কি করবেন না করবেন বলতে পারি নি; কিন্তু নেমন্তন্নে আজ তোমার যাওয়াই চাই।"

"বেশ তো, ওঁদের মত করাতে পারো যদি, আমার যেতে কোনই আপত্তি নেই।"

"তাঁদের মতামতে কিছু এসে যায় না। আমি যদি মত করি, তা হলেই তোমার যাওয়া উচিত। কেন না, স্ত্রী কখনও স্বামীর অবাধ্য হবে না—এ উপদেশটা বোধ হয় কোনও মেয়ে মানুষেরই অজানিত নেই।"

"না, কিন্তু তার অনেক আগে থাকতেই যে, পিতা মাতার কখনও অবাধ্য হবে না, এ শিক্ষাটাও তারা পায়। সেটাই বা চট্ করে ভুলি কেমন করে?"

"তাহ'লে দেখ্‌ছি স্বামীর চেয়ে পিতামাতাই তোমার বেশি আপনার!"

"শুধু আমার কেন, সকল স্ত্রীলোকেরই। স্ত্রী কোন গুরুতর অপরাধ করলেই স্বামীরা তাদের অনায়াসে ত্যাগ করে; কিন্তু সহস্র দোষে দোষী হলেও বাপ মা কখনও মেয়েটিকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দিতে পারেন না—এটা তো জানো।"

"তা হ'লে তুমি স্বামীকে চাও না, পিতা মাতাকে পেলেই সুখী—কেমন?"

"না, আমি স্বামীকে চাই, কিন্তু পিতামাতার পরিত্যাগ ক'রে নয়।"

"বাপ মা কি সবার চিরকাল থাকে?"

"সে অশুভ দিনের কথাটা এত আগে আলোচনা ক'রে কোনও লাভ নেই বোধ হয়।"

"তোমার কোনও লাভ, না থাকতে পারে, কিন্তু আমার যথেষ্ট আছে। আমি জান্‌তে চাই যে, ওঁদের অবর্ত্তমানে তোমার আমার মধ্যে সম্পর্কটা ভবিষ্যতে কি রকম দাঁড়াবে?"

লীলার বড় বড় দুটি চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিল।

নরেশ তাড়াতাড়ি নিজের কোঁচার কাপড় দিয়া সস্নেহে তাহার চোখ দু'টি মুছাইয়া দিয়া মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল "কেঁদে ফেল্‌লে লিলি! কেন, আমি তো তোমায় আঘাত দেবার জন্যে কোনও কথা বলি নি। আমি শুধু জান্‌তে চেয়েছিলুম যে, তোমার পিতামাতার চেয়েও তোমার ওপর আমার বেশি অধিকার আছে কি না?"

লীলা কোনও উত্তর দিল না, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া আঁচলে চোখ রগড়াইতে লাগিল।

নরেশ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল "আচ্ছা বেশ, আমি না হয় আর স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রী হিসেবে তোমার ওপর নিজের কোনও দাবী করবো না। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা যত দিন না তুমি পিতা-মাতার সঙ্গে কন্যার সম্পর্কের চেয়েও বড় ক'রে দেখ্‌তে শিখ্‌বে, তত দিন না হয় তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা ক'রে থাক্‌বো লিলি!"

অভিমানে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে লীলা বলিল, "কেন তুমি আজ আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ,—কি করিছি আমি?"

আর্ত্ত ও বিপন্নের মতো কাতর কণ্ঠে নরেশ বলিল, "আর তুমি যে আজ আমার মনে কি কষ্ট দিচ্ছ লিলি—তা বোধ হয় নিশ্চয় বুঝতে পারতে, যদি তুমি একটুও আমাকে ভালবাস্‌তে!"

লীলার চোখ দুটি আবার জলে ভরিয়া উঠিল, ঠোঁট দুখানি কাঁপিতে লাগিল। অভিমান ও অনুরাগে ভরা অশ্রু-সজল আঁখি দু'টি স্বামীর দিকে ফিরাইয়া জড়িত অস্পষ্ট কণ্ঠে বলিল "আমি বুঝি বাসিনি?"

তরুণী পত্নীর কম্পিত অধরপুটের এই কটি সোহাগের বাণী, বলিল-সিক্ত নয়ন-কোণের একটুকু কেমন সেই অনুরাগ-বিচ্ছুরিত দৃষ্টি, অভিমানে উচ্ছ্বসিত কিশোরীর পরিপুষ্ট সুন্দর গণ্ডদ্বয়ের সেই অরুণ-রাঙা রক্ত-আভা, নরেশকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দিল। নরেশ তাহাকে আবেগ ভরে আপন বাহু-বন্ধনে টানিয়া লইয়া, অভিমানিনীর সজল আঁখি-পল্লব দু'টিতে বারবার চুম্বন করিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "বাসো? আচ্ছা, তবে বল দেখি লীলা, ও কথাটার মানে কি? ওটা তো আর সংস্কৃত কথা নয়!"

লীলাও হাসিয়া ফেলিল। হাসিতে হাসিতে নিজেকে নরেশের আলিঙ্গন-পাশ হইতে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, "ছাড়, সকাল বেলা—কেউ এসে পড়বে এখুনি; কিন্তু মনে থাকে যেন—আর ওসব অলুক্ষুণে কথা মুখে আন্‌বে না। তাহ'লে আমি ভয়ানক কাঁদ্‌বো, আর মা বাবা শুন্‌তে পেয়ে দৌড়ে আসবেন, খালি জিজ্ঞেসা করবেন 'কি হ'ল—কি হয়েছে?' তখন কি যে হয়েছে আমি কিছু তাঁদের বলতেও পার্ব্বো না! সে একটা মস্ত বড় কেলেঙ্কারী হ'বে কিন্তু!"

লীলার মুখে আবার তাহার পিতা-মাতার উল্লেখ শুনিয়া নরেশের মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়া মুখখানা অন্ধকার হইয়া উঠিল। অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে নরেশ বলিল "চিরজীবন চোখের জল ফেলার চেয়ে এইবেলা দু' ফোঁটা কেঁদে নেওয়াই কি ভাল নয় লীলা?"

লীলা নরেশের এ প্রশ্নের অর্থটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। সহাস্য প্রফুল্ল মুখখানি সহসা বিচ্ছিন্ন কমলের মতো বিবর্ণ হইয়া গেল। সভয়ে বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "কেন? আমি কি করিছি যে আমার অত বড় শাস্তি হবে?"

নরেশ যেন উদাস ভাবে বলিতে লাগিল—"বিবাহিত জীবনের সমস্ত কর্ত্তব্য যারা মাল্য-দানের সঙ্গেই চুকিয়ে বসে থাকে, হৃদয় দান করে না,—বিবাহ-বন্ধনের সূত্রে প্রেমাস্পদের কাছে নিজের সব কিছু বিলিয়ে দিয়ে আপনাকে যে সম্পূর্ণ ভাবে ধরা দেয় না,—যাদের পরিণয়ের মধ্যে প্রেমের যোগ সম্পর্ক নেই, ভালবাসার অটুট বন্ধন নেই,—যারা মুখে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হবে স্বীকার করেও কার্য্যতঃ পশ্চাৎপদ হয়—তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিশ্চয়ই অন্ধকার হ'য়ে ওঠে! যে পরিণয়ের পুণ্য-ছায়ায় দু'টি হৃদয় একত্র মিলিত হ'য়ে স্নেহে, প্রেমে, অনুরাগে সার্থক ও ধন্য হ'য়ে ওঠে, মানুষের জীবনের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখ-সম্পদ থেকে আজ আমি শুধু বঞ্চিত নই লীলা, আমার জীবন বোধ হয় ব্যর্থ হয়ে যেতে বসেছে! আমার ভয় হচ্ছে, হয় ত এর পর আমার বেঁচে থাকাও দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠবে!"

ভয়-ব্যাকুল কণ্ঠে লীলা বলিতে গেল "আমার দোষেই কি—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুর মতো নরেশ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং ঘরের ভিতর ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "দোষ কারুর নয় লীলা! দোষ আমার অদৃষ্টের! আমি চোখের সামনে আমার শোচনীয় ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখ্‌তে পেয়েও তবু এখনও আশার ছলনায় ঘুরে মরছি! আমি ভেবেছিলুম, আমার এই অগাধ উচ্ছ্বসিত ভালবাসার স্রোতে তোমাকেও ভাসিয়ে নিয়ে স্বচ্ছন্দে এক দিন আমার হৃদয়ের প্রেমাস্তীর্ণ উপকূলে টেনে নিয়ে আসতে পারবো, কিন্তু আজ আমার সকল চেষ্টা—সকল যত্ন—যেন ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে! তোমার প্রতি আমার অপরিসীম ভালবাসা আজ যেন আমাকেই উপহাস করছে! কিন্তু তবু এখনও আমি একেবারে হতাশ হই নি লীলা! প্রাণপণে তোমাকে জয় কর্ব্বার একটা

শেষ চেষ্টা করেও যদি অকৃতকার্য্য হই, তখন তোমার কাছ থেকে আমি জন্মের মতো বিদায় নেবো, তার আগে নয়।"

নরেশের এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া লীলা বলিল, "তুমি কি বল্‌ছো আমি বুঝ্‌তে পারছি নি! আমাকে জয় কর্ব্বার জন্যে প্রাণপণে একবার শেষ চেষ্টা করবে, এ সব কথার মানে কি?—আমি তো তোমার হাতেই আত্ম-সমর্পণ করিছি—"

নরেশ আবার তাহাকে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "একে আত্ম-সমর্পণ বলে না লীলা। আমি জানি, আমি কি পেয়েছি। মাণিকের লোভে নন্দনের কোনও এক অপূর্ব্ব ভূজঙ্গিনীর অবহেলায় পরিত্যক্ত বিচিত্র খোলসটাকে আমি আজ বড় আগ্রহে কণ্ঠে দুলিয়েছি। তাই তার শিয়রের মণি আমার হৃদয় আলো করতে পারলে না। জান কি লীলা, আমি তোমায় কতখানি ভালবাসি—?"

লীলার ঠোঁট দুখানি তখন রাগে অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। মুখখানি হেঁট করিয়া সে বলিল, "তা যদি বাসতে, তা'হলে কখনই আমায় এমন সব ভয়ানক কথা বলে কষ্ট দিতে না। আমি তো এক দিনও এমন শক্ত শক্ত কথা বলে তোমাকে ব্যথা দিই নি!"

অস্থির হইয়া অধীর ভাবে নরেশ বলিতে লাগিল, "কেন দাও না, কেন তুমি দাও না!—আমি তো দংশনের ভয় করি নি, গরলের জ্বালাকে গ্রাহ্য করি নি—আমি যে 'মণি' চেয়েছিলুম, শুধু মণি চেয়েছিলুম!—কিন্তু কই, পেয়েছি কই?—দাও, দাও লীলা, তোমার প্রেমের পরশমণি দিয়ে আমাকে সার্থক করে দাও,—আমাকে ধন্য করে দাও—!"

নরেশের ভাবগতিক দেখিয়া—তাহার এই উন্মাদের মতো অসংলগ্ন কথাবার্ত্তা শুনিয়া—লীলা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভীত বিবর্ণ মুখে বলিল, "তুমি যে কি চাইছো, আমি তো তা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারছিনি!"

নরেশ তখন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া একেবারে লীলার সম্মুখে আসিয়া বসিল। তাহার হাত দুইখানি সাদরে নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আমি জানি, তুমি আমার সব কথা ভাল বুঝ্‌তে পারো না লিলি, কিন্তু এক দিন পারবে! আজ শুধু কর্ত্তা-গিন্নীর অমত থাকলেও, কেবল আমার অনুরোধ রাখতে তুমি চারুর ওখানে চল।"

লীলা নীরবে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল।

নরেশ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "যাবে কি? বল,—পার্ব্বে না?"

অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত কুণ্ঠিত ভাবে লীলা বলিল, "তুমি কেন এ বিষয়ে এত পেড়াপিড়ি করে আমাকে মুস্কিলে ফেল্‌ছো? তুমি কি জান না যে, তাঁদের অমতে আমি কিছুই করিনি।"

নিতান্ত বিরক্তির সহিত লীলার হাত দুটীকে নিজের মুঠার ভিতর হইতে সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সশব্দে চেয়ারখানাকে তিন হাত পশ্চাতে ঠেলিয়া নরেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। পাশের টেবিলটার উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল "ব্যস্—আর না—আজই আমাকে এর একটা হেস্ত নেস্ত করতেই হবে।"

লীলাও উঠিয়া দাঁড়াইল। মুখখানি আঁধার করিয়া বলিল "আজ তোমার কি হয়েছে,—তুমি তো কখন এমন রাগারাগি কর না।"

তীব্র কণ্ঠে নরেশ উত্তর করিল, "আর আমি সহ্য করতে পারছি নি লীলা! এ রকম করে আর আমাদের চল্‌বে না। হয় তুমি বাপ-মাকে ছাড়, নয় তো আমায় ছেড়ে দাও—"

লীলা কাঁদিয়া ফেলিল। নরেশের কাছে ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও এমন ভর্ৎসনা পায় নাই। আপন বস্ত্রাঞ্চলে চোখ দুটী চাপা দিয়া অভিমানিনী কোঁপাইতে লাগিল।

নরেশ অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শেষে ধীরে ধীরে তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া, অসীম মমতার সহিত তাহাকে আপন বক্ষের উপর টানিয়া লইল। পরম স্নেহে তাহার স-অঞ্চল হাত দুখানিকে চোখের উপর হইতে নামাইয়া দিল—কপালের উপর হইতে মাথার চুলের উপর দিয়া পিঠের দিক পর্য্যন্ত অতি সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে, আদরের সহিত বলিল, "কেঁদ না, ছিঃ! চুপ কর। তোমায় তো কোনও দোষ দিচ্ছি নি আমি। তোমার একটা অপরাধ শুধু এই যে, তুমি হাসির মধ্যেও যেমন অপরূপ সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠো, কান্নার ভিতর দিয়েও ততোধিক!—তোমার এই ফুলের কুঁড়ির

মতো মুখখানি যেন প্রতি দিন আমার চোখে নিত্য নূতন শোভায় বিকশিত হোয়ে উঠ্‌ছে! তোমার অকলঙ্ক হৃদয়ের মধু-সৌরভে আমার চিত্ত বিহ্বল হোয়ে যায়! আমি তোমাকে চাই লীলা! একেবারে পুরোপুরি দখল করে থাকতে চাই। তোমার ওপর অন্য কারুর অধিকার—তা সে যেই হোক্ না কেন—আমি কিছুতেই সহ্য করতে পার্চ্ছি না। আমি তোমাকে নিয়ে আমার চারিদিক ভরিয়ে রাখতে চাই। আমার দুঃখ, আমার বেদনা আমি তোমার শুভ্র হাস্যে ডুবিয়ে দিতে চাই! ছিঃ, চুপ কর; লক্ষ্মী আমার—কেঁদ না। ও কি, আবার চোখ রগড়াচ্ছ! চোখ দু'টি রাঙা হোয়ে উঠলো যে! কেউ দেখে জিজ্ঞেসা করলে কি বল্‌বে বল তো?—দাঁড়াও, আমি মুছিয়ে দিচ্ছি—ওই কে আসছে যেন—মা বোধ হয়,—নাঃ, বৌদি—"

এমন সময় কমলা কক্ষের ভিতর আসিয়া,—যেন কত রাগিয়াছে এমনি ভাবে বলিতে লাগিল, "বলি, সকাল থেকে দুটিতে মিলে কি এতো গুজ্ গুজ্ ফুস্ ফুস্ হচ্ছে শুনি?—কতখানি বেলা হোয়েছে, হুঁস আছে? আজ কি আর তোমাদের নাইতে খেতে হবে না? ওঁরা যে সব বকাবকি করছেন।"

কমলা কথাগুলা খুব রাগ করিয়া বলিবার চেষ্টা করিলেও, তাহার অধর প্রান্তে যে গোপন হাসির রেখাটুকু উঁকি মারিতেছিল, উহাই তাহার ক্রোধের সমস্ত কৃত্রিমতা-টুকু ধরাইয়া দিল। নরেশ হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই যে ভাই, এখনি যাচ্ছি। হুকুম করলেই তো হয়, অত রাগারাগি করবার কি দরকার?—যাও তো লীলা, একছুটে গিয়ে নেয়ে নাওগে তো—"

লীলা বলিল "তুমি আগে যাও। সত্যি, ঢের বেলা হ'য়ে গেছে!"

"এই যে আমি এলুম বলে—তুমি ততক্ষণ এগোও না। তোমার বৌদির সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।"

"আচ্ছা, তুমি আগে বল যে আমার ওপোর একটুও রাগ করনি?"

"একটুও না। আমি তো কতবার বলিছি, যে, তোমার ওপর আমি জীবনে বোধ হয় কখনও রাগ কর্‌তে পারবো না।"

"আচ্ছা দেখ্‌বো। বৌদি, তুমি সাক্ষী রইলে ভাই। যদি করে, তাহ'লে তোমার ওপোর ওর শাস্তির ভার রইল।"

কমলা তাহার কৃত্রিম রাগ ভুলিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেজন্যে তোর ভাবনা নেই,—এমন শাস্তি দোবো তখন, যে, শেষ তুইই হয় ত এসে বলবি 'এবারটি ওকে মাপ কর ভাই বৌদি!' তখন কিন্তু আমি কারুর কথা শুনবো না, তা আগে থাক্‌তে বলে রাখ্‌ছি।"

"হ্যাঁ—তা বই কি,—আচ্ছা দেখবো তখন।" বলিতে বলিতে লীলা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। (ক্রমশঃ)

ব্যাণ্ডেল

কুমার শ্রীমুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"—জগতে সুখ এবং দুঃখ চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রাচী এবং প্রতীচীর বাণিজ্য-বন্দর-সঙ্ঘ মধ্যে পশ্চিম-বঙ্গের রাজকীয় বন্দর পুণ্যতোয়া মুক্তবেণী ত্রিবেণী-সংলগ্ন সপ্তগ্রাম মহানগরী এক কালে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেকালে বিপুলকায়া সরস্বতী-বক্ষ পণ্য-সম্ভার-পূর্ণ পোত-সমাবেশে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিত। সুদূর রোমক ও কার্থেজ রাজ্য, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ, চীন সাম্রাজ্য, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও মলয়প্রদেশবাসীগণ পণ্যের বিনিময়ে সপ্ত-গ্রামের ধনভাণ্ডার সুবর্ণে পূর্ণ করিয়া দিত। শ্রীমন্ত, ধনপতি, চাঁদ সওদাগরের গৌরবময় কাহিনীর স্মৃতি সপ্ত-গ্রামের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে বিজড়িত। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিত্যলীলা-ভূমি,—সর্ব্বত্যাগী ভগবৎ-প্রেম-বিহ্বল রঘুনাথ ও উদ্ধারণের সিদ্ধপীঠ সপ্তগ্রাম নিয়তির অনিবার্য্য বিধানে অতি শোচনীয় পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। বন্য বরাহ, শিবা ও শার্দ্দূলের বিকট আরাবে ও ঘোরা নিশীথিনীতে

পেচকের কর্কশ রবে জনহীন গহন কানন দিগদিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইলেও, ভক্ত উদ্ধারণ-রোপিত মাধবীকুঞ্জ ও মুসলমান আমলের মসজীদ ও সমাধির ভগ্নাবশেষ পূর্ব্ব-কীর্ত্তি-গরিমার স্মৃতি অদ্যাপি সজাগ রাখিয়াছে।

ভাঙ্গা গড়া জগতের প্রাকৃতিক নিয়ম। সপ্তগ্রামের লয়ে হুগলীর অভ্যুদয়। হুগলীর অভ্যুদয়ের কারণ পর্ত্তুগীজ আগমন। পর্ত্তুগীজেরা কবে হুগলীতে প্রথম আগমন করে, তাহার সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না—অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাচার্য্য পোপ পঞ্চম নিকোলাস্

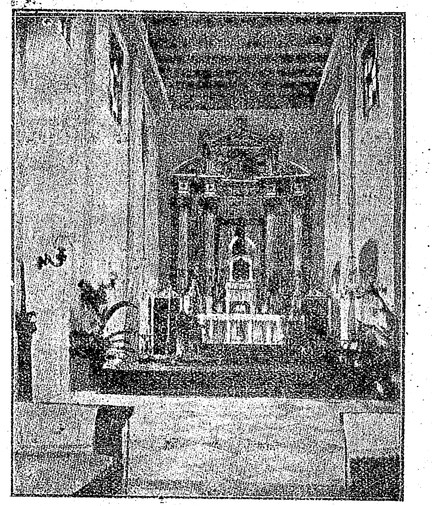

লেডী অফ্ দি রোজারির বেদী, ব্যাণ্ডেল

পর্ত্তুগাল-রাজ পঞ্চম এলফনসোকে প্রাচ্যে আবিষ্কৃত যাবতীয় রাজ্য উপভোগের ক্ষমতা অর্পণ করেন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে ডিয়াজ (Diaz) নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ উত্তমাশা অন্তরীপ সর্ব্ব প্রথম অতিক্রম করেন। সেই পথে পোতারোহণে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট জগদ্বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতোপকূলে কালিকাট সহরে প্রথম পদার্পণ করেন। জলযানে য়ুরোপবাসীর ভারতবর্ষে এই প্রথম আগমন। ভাস্কো-ডা-গামার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা অর্থার্জ্জন। তাঁহার উদ্দেশ্য আশাতীত ভাবে সফল হইয়াছিল। দুই বৎসর ভারতে অবস্থানের পর, তিনি বহু ধনরত্ন ও ভারত-জাত অপূর্ব্ব দ্রব্যসম্ভারে বাণিজ্যতরী পূর্ণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ক্রমে ভারতের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রতীচীর পুরুষকার ও উদ্যম-শীলতায় আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ভারতের দুর্দ্দিনের সূত্রপাত হইল। গামার স্বদেশবাসিগণ তাঁহার অভাবনীয় অতুল বৈভব দেখিয়া বিস্মিত হইল। তাহারা শুনিল, ভারতে কল্পতরু বৃক্ষ আছে, নাড়া দিলে মোহর ঝরে। তাহারা স্বর্ণলোভে ভারতে আসিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইল। এক দুই করিয়া জলযানে পর্ত্তুগীজ বণিকগণ ভারতে আসিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহারা বাণিজ্য-ব্যপদেশে আসিতেছিল; ক্রমে এখানে অল্প অল্প করিয়া ভূমি ক্রয় করিতে লাগিল; আত্মরক্ষার জন্য দুর্গও নির্ম্মাণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহাদের রাজ্যলাভের বাসনা হইল। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা কয়েক স্থান অধিকার করিয়া লইল। গোয়া, সিংহল, মলক্কা, অরমাজ পর্ত্তুগীজ-করতলগত হইল। এই সকল অধিকারে স্থাপিলেন পর্ত্তুগীজদিগের ক্লাইভ্—আলফন্সো আলবুকার্ক। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর মামুদ পাঠান সেনাপতি শের শার কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ায়, সাহায্যের জন্য গোয়ার পর্ত্তুগীজ রাজ-প্রতিনিধির নিকট আবেদন করেন। তিনি বঙ্গেশ্বরের সাহায্যার্থ বঙ্গদেশে নয়খানি রণতরী প্রেরণ করেন; কিন্তু, রণতরী পৌছিবার পূর্ব্বেই মামুদ পরাভূত হইয়া মোগল সম্রাট হুমায়ুনের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে পর্ত্তুগীজদের এই প্রথম সেনা-সমাবেশ। ১৫১৭ খৃঃ অব্দের পূর্ব্ব হইতে ব্যবসার জন্য পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্য-পোত বাঙ্গালায় আসিত বটে, কিন্তু তখনও রণপোত প্রবেশ করে নাই। রণতরীসমূহের সেনাপতি সাম্প্রিয় যখন হুগলীতে আসিয়া পৌছিলেন, তখন সম্রাট হুমায়ুন শের শার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। পর্ত্তুগীজরা অনেক-দিন হইতে বাঙ্গালায় উপনিবেশ সংস্থাপনের জন্য ব্যগ্র ছিল; সুতরাং এরূপ সুবর্ণ সুযোগ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সাম্প্রিয় হুগলীই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থির করিলেন। হুগলীতে একটী কুঠী স্থাপিত হইল। এই সময়ে গৌড়াধিপতির অনুরোধে দেশের

অন্তর্বিপ্লব দমন জন্য কয়েকজন পর্ত্তুগীজ সৈন্য গৌড়ে প্রেরিত হয়। সাম্প্রিয় অধিক দিন হুগলীতে অবস্থান করেন নাই। তাঁহার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল গোয়া। সেখানে তিনি বাহুবলে প্রধান শাসনকর্ত্তার আসন পরিগ্রহ করেন। অল্প দিন পরে পর্ত্তুগাল-রাজ নুনীয় নামক জনৈক রাজপুরুষকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সাম্প্রিয় শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লিস্‌বনে প্রেরিত হন। ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে জন্ ডি ক্যাষ্ট্রো পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার সময়ে পর্ত্তুগীজদের প্রবল প্রতাপে সমুদ্রতীরবর্ত্তী জনপদ-সমূহ সর্ব্বদাই প্রকম্পিত হইত। ক্যাষ্ট্রোর শাসন-গৌরব বৃদ্ধি করিবার জন্য তাৎকালিক পর্ত্তুগীজ কবি ক্যামিয়স স্বজাতি-প্রেমে অন্ধ হইয়া গাহিয়াছিলেন—

(বঙ্গানুবাদ)

মন্দাকিনীর পুলিনে পুলিনে সিন্ধুর তীরে আর
লুণ্ঠনরক্ত কণ্ঠে কণ্ঠে উঠে না ক হাহাকার।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, শান্তি-দেবীর কৃপা-মন্দার ফোটে,
হেম পুষ্পিত সহকার-শাখা শোভে মঙ্গল ঘটে।
কামো রাজিকে শাসিছে প্রাজ্ঞ নীতিশাস্ত্রের বলে
বিশাল প্রাচ্য পর্ত্তুগালের নিদেশ মানিয়া চলে।

কবির কল্পনা চিরপ্রসিদ্ধ,—তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে গুরুতর করিতে পারেন। কোথায় সিন্ধুনদ আর কোথায় গঙ্গা! এত বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার স্বদেশবাসিগণ কোথায় পাইল? আটক হইতে কটক তখন সম্রাট আকবরের রাজ্যভুক্ত। পর্ত্তুগীজরা সমুদ্রোপকূলে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা পশ্চিম উপকূলে। ক্যামিয়সের ন্যায় সৌজা (Souza) স্বদেশ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে চীন উপকূল পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত নহে। সম্ভবতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ঐ সকল স্থানে পর্ত্তুগীজ-দিগের যাতায়াত ছিল। আবুল ফাজ্‌ল্ বলেন, সম্রাট আকবর খৃষ্ট-ধর্ম্ম বিষয় অবগত হইবার জন্য ব্যগ্র হন। সেজন্য ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে পাদ্রী রডালফ্ একোয়াভিভা আকবরের নিকট গমন করেন। দুইজন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকও তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন।

হুগলী এ যাবৎ নগণ্য অবস্থাতেই ছিল। কবিকঙ্কনের চণ্ডী ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। চণ্ডীতে গঙ্গার পূর্ব্বকূলের গৌরীপুর, হালিসহর প্রভৃতির ও পশ্চিম কূলের সপ্তগ্রাম, ত্রিবেণী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, হুগলীর কোনও উল্লেখ নাই। সে সময় পর্ত্তুগীজরা হুগলীতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া থাকিলে, কবিকঙ্কন নিশ্চয় তাহার উল্লেখ করিতেন। হিজলীর পথে ফিরিঙ্গির দেশ বলিয়া চণ্ডীতে লিখিত আছে, আর হুগলীর উল্লেখ থাকিবে না, তাহা সম্ভবপর নহে। সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বিংশ বৎসর পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজরা হুগলীতে উপনিবেশ স্থাপন করে। আইন-আকবরী-প্রণেতা কহেন যে, হুগলী এবং সপ্তগ্রাম ফিরিঙ্গিদের অধীন ছিল; তন্মধ্যে

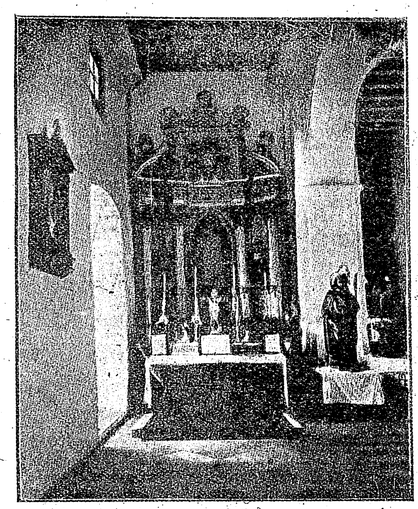

ব্যাণ্ডেল কনভেণ্টের উচ্চ বেদী

শেষোক্ত স্থান হইতে রাজস্ব আদায় হইত। ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে রাল্‌ফ্ ফিচ (Ralph Fitch) নামক ভ্রমণকারী হুগলীতে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে হুগলী পর্ত্তু-গীজদের এক প্রধান সুরক্ষিত স্থান। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে এক-দল সৈন্য বিদ্রোহী হয়—সে সময় হুগলী পর্ত্তুগীজদিগের অধীন বলিয়া প্রকাশ। বর্দ্ধমানের নিকট সালিমাবাদ নামক স্থানে মোগল সেনাপতি মির নাজাৎ পাঠান সেনা-পতি কতলু খাঁ কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া হুগলীর পর্ত্তুগী

শাসনকর্ত্তার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকবরনামার হস্তলিপিতে উক্ত শাসনকর্ত্তার নাম প্রতাব্বর ফিরিঙ্গি বলিয়া উল্লিখিত আছে। তিনি রাজস্ব প্রদান উপলক্ষে সস্ত্রীক দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। উপরি উক্ত ঘটনাবলী হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, পর্ত্তুগীজরা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলীতে উপনিবেশ সংস্থাপন করে।

ইহারা যখন প্রথম হুগলীতে আগমন করে, তখন সেখানে যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করিতে পাইবে, তাহা ভাবে নাই। ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া ধনোপার্জ্জনই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। তাহারা অস্থায়ী বংশ-নির্ম্মিত কুটীরে বৎসরের

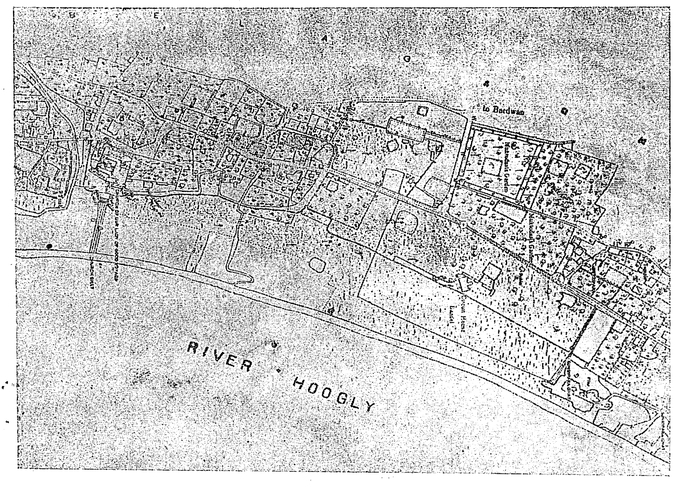

হুগলীর উত্তরাংশের মানচিত্র

কতকাংশ সময় অবস্থান করিয়া অর্জ্জিত অর্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত। সম্রাট আকবর ইহাদের বিষয় অবগত হইয়া রাজধানীতে জনৈক পর্ত্তুগীজকে নমুনা স্বরূপ প্রেরণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের সুবাদারকে আদেশ প্রদান করেন। আগরা হইতে হুগলী অনেক দূর; কাজেই পত্র আসিতে অনেক সময় লাগিল। পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পর্ত্তুগীজরা স্বদেশে গমন করিয়াছিল। সুতরাং সে বৎসর পর্ত্তুগীজ নমুনা প্রেরিত হইল না। সেজন্য সম্রাট সুবাদারকে এক শ্লেষাত্মক পত্র প্রেরণ করেন। তাহা পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগে যে, তিনি অবিলম্বে পীড়িত হইয়া মানব-লীলা সম্বরণ করেন। পর বর্ষে নব সুবাদার সম্রাটের সন্তোষ বিধানার্থ ট্যাভারেজ নামক পর্ত্তুগীজ পোতাধ্যক্ষকে আগরায় প্রেরণ করেন। আকবর ট্যাভারেজের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, এবং হুগলীর নিকট যে কোনও স্থানে সহর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিবার অনুমতি প্রদান করেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার ও উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণেরও অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। আকবরের সময় পর্ত্তুগীজদিগের সুবর্ণ-যুগ বলা যাইতে পারে। জাঁহাগীরের সময়েও পর্ত্তুগীজরা নিরুটকে রাজত্ব করিয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর তাঁহার বিদ্বেষভাব ছিল না। বাণিজ্যের প্রসারে দেশের উন্নতি হইবে ভাবিয়া, ও পর্ত্তুগীজরা বঙ্গোপসাগর হইতে জলদস্যুগণকে বিদূরিত করিবার ভার গ্রহণ করায় তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে নির্ব্বিবাদে হুগলীতে বাণিজ্য করিতে দিয়াছিলেন। এই সময়ের পর্ত্তুগীজদিগের অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রমণকারী পার্চ্চাস এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"The Portuguese have here Porto Grande (Sun-dip) and Porte Pequens (Hooghly) but without Forts and Government; every man living after his own lust and for the most part, they are such as dare not stay in those places of better Government for some wickedness by them committed."

সম্রাট সাহজাঁহার আমলে পর্ত্তুগীজদিগের পতন হইলেও, তিনিই ইহাদিগকে ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন।

হুগলীর নামকরণ কবে হইল? ফেরিয়া ডি সৌজার পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে (১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়) হুগলীর নাম "গলিন" বলিয়া উল্লিখিত আছে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পাটনা হইতে হিউজ এবং পার্কার সাহেব যে পত্র লেখেন, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, নিম্নবঙ্গে পর্ত্তুগীজদের দুইটি দুর্গ আছে,—একটী সিরিপুল্লীতে (সম্ভবতঃ পিপ্‌লী) আর একটী "গলির" বা "গলিন" নামক স্থানে। ডাচ্ শাসনকর্ত্তা বাউচ্ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে হুগলীর নাম "ওয়েগ্‌লী" বা "হোয়েগ্‌লী" বলিয়া লিখিয়াছিলেন। ডি লেইটোর "ইণ্ডিয়া টেরা" নামক পুস্তকে "উগেলী" বলিয়া উল্লিখিত

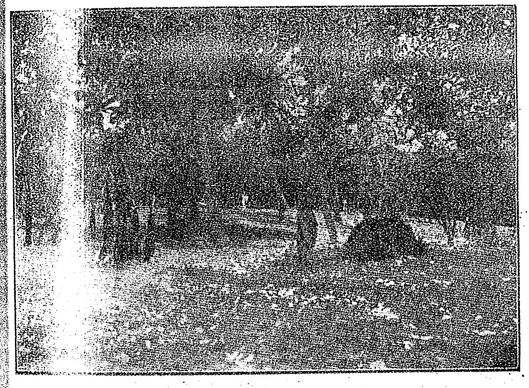

পর্ত্তুগীজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ—হুগলী

আছে। উপরিউক্ত নামগুলির সহিত হুগলীর অনেকটা সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। টিপু সুলতানের পাঠাগারের গ্রন্থসমূহের অন্তর্গত বিস্তারিত তালিকার পরিশিষ্টে হুগলীর উৎপত্তির বিষয় লিপিবদ্ধ আছে; কিন্তু নগর কোন সময় স্থাপিত হয়, তাহার নির্দ্দেশ করা হয় নাই। সুতরাং ইহার সঠিক মীমাংসা হওয়া দুষ্কর।

ভারতে পর্ত্তুগীজ রাজত্বের প্রধান রাজধানী ছিল গোয়া নগরে,—সেখানে রাজপ্রতিনিধি বাস করিতেন। অন্যান্য স্থানে উচ্চ কর্ম্মচারী বা প্রতিনিধি নিযুক্ত থাকিতেন। বঙ্গদেশে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছিলেন,—তিনি হুগলীর কুঠীতে অবস্থান করিতেন।

সপ্তগ্রাম এতকাল পর্য্যন্ত রাজকীয় বন্দর ছিল। পর্ত্তুগীজরা হুগলীকেই এ প্রদেশের প্রধান বন্দর রূপে পরিণত করাই স্থির করিল। নূতন সৌষ্টবে হুগলী সপ্তগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দণ্ডায়মান হইল। সপ্তগ্রামের প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী বিরূপা হইলেন। সরস্বতী নদীর জল শুষ্ক হওয়ায়, তাহার উপর দিয়া বৃহৎ জলযানে যাতায়াত একরূপ বন্ধ হইয়াছিল। সুতরাং পর্ত্তুগীজদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইবার সুযোগ উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ হুগলীর শ্রীবৃদ্ধি ও সপ্তগ্রামের অধঃপতন হইতে লাগিল। সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা হুগলীর অভ্যুদয় ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। হুগলীর উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিবার জন্য তিনি স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগীজরা প্রমাদ গণিল। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য সচেষ্ট হইল। হুগলী সুরক্ষিত করিবার জন্য পরিখা খনন ও দুর্গ নির্ম্মাণ করিল। হুগলীর প্রথম পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ গোয়া হইতে নিযুক্ত কোনও ব্যক্তি ঐ কার্য্য করিতেন। আর তিনি যিনিই হউন, তাঁহার ক্ষমতা সম্ভবতঃ সীমাবদ্ধ ছিল। হুগলীতে খৃষ্টোপাসনা করিবার জন্য এতকাল কোনও ধর্ম্মমন্দির ছিল না। এই অভাব দূরীকরণ মানসে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হুগলীতে একটী সুন্দর উপাসনালয় ও মঠ নির্ম্মিত হয়। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে যখন হুগলী অবরুদ্ধ হয়, সেই সময় উক্ত গির্জ্জা মোগল সেনা কর্ত্তৃক তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে গির্জ্জাটি পুনঃনির্ম্মিত হয়। গির্জ্জায় প্রবেশের দ্বারে একখানি প্রস্তরফলকে সর্ব্বপ্রথম গির্জ্জা নির্ম্মাণের তারিখ ১৫৯৯ বলিয়া অঙ্কিত আছে। বিগত ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে গির্জ্জাটির কয়েক স্থান ভগ্ন হইয়াছিল; পর বৎসর তাহার সংস্কার করা হয়।

অল্পকালের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলেও, প্রকৃত পক্ষে তাহারাই

হুগলীর সর্ব্বময় প্রভু ও হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা যথা নিয়মে বা যথা সময়ে রাজস্ব প্রদান করিত না; তাহারা বল প্রকাশ করিয়া অধিবাসীগণকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিত। যাহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিত, তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হইত। অনেকে রাজকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রমাণও পাওয়া যায়। এমন কি, এক জন স্বীয় কর্ম্মদক্ষতায় হুগলীর শাসনকর্ত্তার কার্য্য পর্য্যন্ত পাইয়াছিল।



ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার দক্ষিণাংশ

যত দিন সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তত দিন পর্ত্তুগীজেরা একরূপ নির্ব্বিবাদে হুগলীতে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি লাভ করিতেছিল। আকবর বঙ্গদেশে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানদিগকে শাসনে রাখিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। এই সুযোগে পর্ত্তুগীজেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দাউদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠানদিগের আধিপত্য হ্রাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত তাহারা সম্পূর্ণ রূপে করায়ত্ত হয় নাই। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা মোগল সেনাপতি মহারাজা মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাভূত হওয়ার পর একেবারে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল।

আকবর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎপুত্র সেলিম্ জাহাঁগীর উপাধি গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই সময় পর্ত্তুগীজ দস্যুপতি সিবাশ্চিয়ন গঞ্জেলিসের অধীন জলদস্যুদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশ বিশেষতঃ পূর্ব্বদিক শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া পূর্ণ জলযান ও গ্রাম লুণ্ঠন করিত, এবং অধিবাসীগণকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিত। হুগলীর পর্ত্তুগীজেরা অবাধে এই জলদস্যুদিগের দাস-ব্যবসায়ের সহায়তা করিত। তাহারা অল্প মূল্যে পাইকারি দরে নৌকা পূর্ণ দাস ক্রয় করিয়া নানা দেশে তাহাদিগকে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। এ সম্বন্ধে মোগল রাজত্বে ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার বলেন—

"Even the Portuguese of Hooghly in Bengal purchased without scruple these

wretched captives, and the horrid traffic was transacted in the vicinity of the island of Galles, near Cape das Palmas. The pirates by a mutual understanding waited for the arrival of the Portuguese who bought whole cargoes at a cheap rate; and it is lamentable to reflect that other Europeans, since the decline of the Portuguese power, have pursued the flagitious commerce with the pirates of Chittagong, who boast that they convert more Hindoos to Christianity in twelve months than all the missionaries in India do in ten years. A strange mode this of propagating our holy religion by the constant violation of its most sacred precepts, and by the open contempt and defiance of its most awful sanctions."

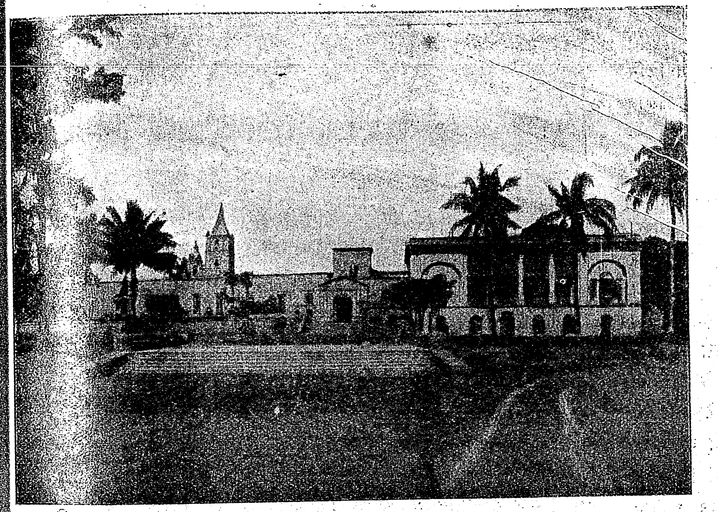

ব্যাণ্ডেল কনভেণ্ট—পূর্ব্বাংশ

পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচারে পূর্ব্ববঙ্গ বিধ্বস্ত হইতেছিল। কাজেই তাহার প্রতিরোধ জন্য রাজমহল হইতে ঢাকায় বাঙ্গালার রাজধানী স্থানান্তরিত করা হইল। ঢাকার নামকরণ হইল 'জাহাঙ্গীরনগর'। এই সময় ইসলাম খাঁ বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের প্রতাপ কথঞ্চিৎ হ্রাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে তাহাদিগকে একেবারে বশীভূত করিতে পারেন নাই। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার পদে কাশিম খাঁ নিযুক্ত হন। ইঁহার পর ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি বীর ও সুশাসক ছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় দেশে শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল।

ঐতিহাসিকগণের মতে সম্রাট জাহাঁগীর সৎ ও উদার-প্রকৃতির সম্রাট ছিলেন; কিন্তু তাঁহার ভালমানুষিই অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তিনি শাসন করিবেন কি; তিনি নিজেই তাঁহার প্রিয় বেগম জগদ্বিখ্যাত নূরজাহান কর্ত্তৃক শাসিত হইতেন। তিনি নূরজাহানের হস্তের ক্রীড়া-পুত্তলিকাবৎ ছিলেন। জাহাঁগীরের পুত্রদের মধ্যে খুরম (সাহজাঁহা) নিঃসন্দেহ সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার বহু সদ্‌গুণ সত্ত্বেও তিনি নূরজাহানের বিষ নয়নে পতিত হইয়াছিলেন। নূরজাহান সম্রাটের চতুর্থ পুত্র সারিয়ারকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাঁহার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত একমাত্র কন্যার সহিত সারিয়ারের পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল; সুতরাং নূরজাহান যে তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার প্রয়াস পাইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। ব্যাপার

দেখিয়া ১৬২১ খৃষ্টাব্দে খুরম (সাহজাঁহা) বিদ্রোহী হন। তিনি সসৈন্যে দিল্লী যাত্রা করেন। কিন্তু রাজ-সৈন্য কর্ত্তৃক পরাভূত হন। রাজ-সৈন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলে, তিনি পলায়ন করিয়া বর্দ্ধমানে আসিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় হুগলীর পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তা মাইকেল রড্রিগেজ তাঁহার সহিত বর্দ্ধমানে সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। সাহজাঁহা তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার জন্য তাঁহার নিকট কয়েকটি কামান ও একদল সশস্ত্র য়ুরোপীয় সৈন্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি নানা রূপ পুরস্কার অঙ্গীকার করেন। সম্রাটের বিরাগ উৎপাদনের আশঙ্কায় রড্রিগেজ তাঁহাকে কোনও রূপ সাহায্য করিতে স্বীকৃত হন নাই। সাহজাঁহা তাহাতে আন্তরিক বিরক্ত হন এবং উপযুক্ত সুযোগ পাইলে ইহার প্রতিফল প্রদানে মনে মনে স্থির সঙ্কল্প করেন। পর্ত্তুগীজদিগের নিকট সাহায্য না পাইলেও তিনি সৈন্য-সামন্ত সহ পুনরায় যুদ্ধে ব্রতী হইলেন। এবার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হন। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজেকে বঙ্গেশ্বর বলিয়া ঘোষণা করেন। দুই বৎসর রাজত্বের পর রাজকীয় সৈন্য কর্ত্তৃক তিনি পুনরায় পরাস্ত হইয়া পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সেবারকার মত পরিত্রাণ পান।

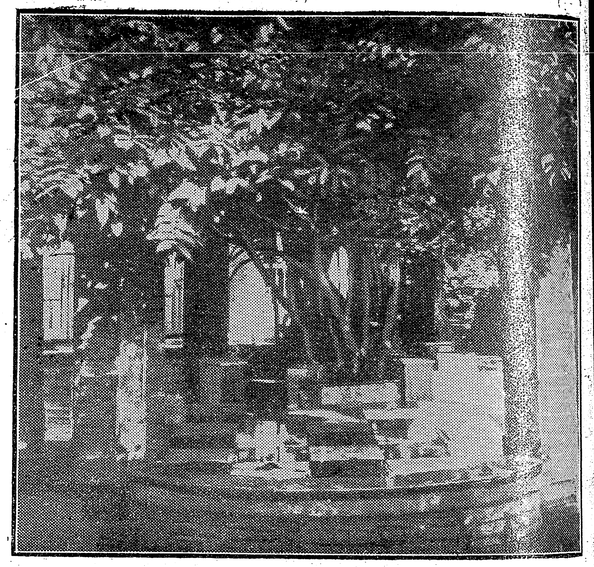

সপ্তগ্রাম মাধবী—কুঞ্জ

১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঁগীরের মৃত্যু হইলে সাহজাঁহা দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। পর বৎসর তিনি তাঁহার প্রিয় সদস্য কাশিম খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা রূপে নিযুক্ত করেন। ইঁহার শাসন কালের প্রধান ঘটনা হুগলীর অবরোধ ও পতন।

বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হওয়ার কয়েক বৎসর পরে কাশিম খাঁ পর্ত্তুগীজদিগের দুর্ব্বিনীত ও উদ্ধত ব্যবহারে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট সাহজাঁহার সমীপে তাহাদের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ-লিপি প্রেরণ করেন। তাহাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ (১) ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে হুগলী নামক স্থানে কতকগুলি পর্ত্তুগীজ পৌত্তলিককে ব্যবসা করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল ; তাহারা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া থাকিবার কথা, তাহা না থাকিয়া, বিনা অনুমতিতে দুর্গ নির্ম্মাণ ও পরিখা খনন দ্বারা তাহারা হুগলী সুরক্ষিত করিয়াছে। (২) তাহাদের হুগলীর কুঠীর সম্মুখস্থ গঙ্গার উপর দিয়া যে সমুদায় নৌকা ও বাণিজ্য-পোত যাতায়াত করে, তাহাদের নিকট হইতে তাহারা অন্যায় রূপে শুল্ক আদায় করিয়া থাকে। (৩) তাহারা প্রাচীন সপ্তগ্রাম বন্দরের যাবতীয় বাণিজ্য আকর্ষণ করিয়া এত দিনের বন্দরটি একেবারে নষ্ট করিয়াছে। (৪) তাহাদের অত্যাচারে সাম্রাজ্যের অধিবাসীগণ বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হইতেছে। তাহারা ছেলে চুরী এবং গরীবের সন্তান ক্রয়

করিয়া ভারতের নানা স্থানে তাহাদিগকে ক্রীতদাস রূপে বিক্রয় করিয়া থাকে। (৫) পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ মগেদের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীগণের উপর অকথ্য অত্যাচার করিয়া থাকে। এই গুরুতর অভিযোগলিপি প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তাকে তাঁহার রাজ্য হইতে পৌত্তলিক পর্ত্তুগীজদিগকে বিদূরিত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

কাশিম খাঁ জানিতেন যে, আদেশ দেওয়া যেরূপ সহজ, আদেশ পালন করা ততদূর সহজ-সাধ্য নহে। বিশেষ হুগলী

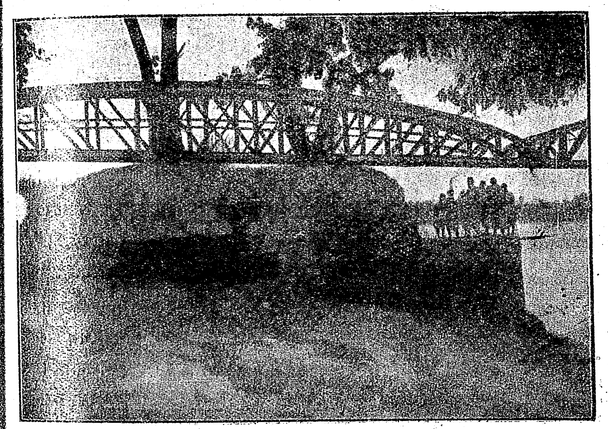

জেসুট কলেজের টাবী—সাওপালো উদ্যান, ব্যাণ্ডেল

সুরক্ষিত ছিল। নদীর দিক হইতে আক্রমণের সুবিধা ছিল না; কারণ সদা সর্ব্বদা সেখানে অনেক পর্ত্তুগীজ জাহাজ থাকিত। আর দুর্গটি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পরিখা সর্ব্বদা জলে পূর্ণ থাকিত। সুতরাং হুগলী আক্রমণের জন্য বিশেষ আয়োজন করিতে হইয়াছিল। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের বিরাট আয়োজন আরম্ভ করা হইল। যুদ্ধোদ্যম যাহাতে পর্ত্তুগীজরা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে না পারে, কাশিম তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যুদ্ধের আয়োজন সমাপ্ত হইলে, তিনি প্রকাশ করিলেন যে, তিনি মুকসুদাবাদ ও হিজলীর রাজদ্রোহী জমীদারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে বাহাদুর কুম্বর অধীনে একদল সেনা ঢাকা হইতে মুকসুদাবাদাভিমুখে প্রেরিত হইল। একদল সেনা সহ কাশিম খাঁর পুত্র এনায়াৎউল্লা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। খাজা শিয়ারের অধীনে তৃতীয় দল সেনা হুগলীর পদপ্রান্তে প্রবাহিত ভাগীরথী নদী রক্ষার জন্য প্রেরিত হইল। খাজা শিয়ারের আদেশে পর্ত্তুগীজদিগের পলায়নের পথ রোধ করিবার জন্য শ্রীরামপুরের সম্মুখে ভাগীরথীর উপর একটি নৌকার সেতু নির্ম্মিত হইল।

খাজা শিয়ার যথাস্থানে পৌঁছিয়া, সেখানে সসৈন্যে সমবেত হইবার জন্য অপর সেনাপতিদ্বয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা উপস্থিত হইবামাত্র ১০৪১ অব্দের (১৬৩২ খৃঃ অব্দে) ২রা জিলিজি (১১ই জুন) রাজকীয় সৈন্য কর্ত্তৃক হুগলীর চতুর্দ্দিক অবরুদ্ধ হইল। পর্ত্তুগীজ-অধিকৃত স্থানসমূহ লুণ্ঠন ও সম্মুখে যে কোনও পর্ত্তুগীজ পড়িবে তাহাকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়া তদ্দণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক দল সেনা চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইল।

হুগলী এ প্রদেশের প্রধান বন্দর হওয়ায় অনেক বিদেশী নাবিক ও নৌচালক হুগলীর নিকটে বাস করিত। মোগলেরা তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কামান রক্ষার স্থান নির্ম্মাণ ও কামান দাগিবার কার্য্যে নিয়োজিত করিল। বলা আবশ্যক, মোগলেরা কামান দাগিতে পটু ছিল না।

সার্দ্ধ তিন মাস ব্যাপিয়া হুগলী অবরুদ্ধ ছিল। ইতিমধ্যে পর্ত্তুগীজেরা অনেকবার বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং একলক্ষ টাকা বার্ষিক রাজস্ব প্রদান করিতে সম্মত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজেরা য়ুরোপ কিংবা গোয়া হইতে সৈন্য সাহায্য পাইবার প্রতি মুহূর্ত্তেই আশা করিতেছিল। সে জন্য তাহারা আত্মরক্ষার তৎপরতায় কিছুমাত্র নিশ্চেষ্ট হয় নাই। তাহারা সর্ব্বদাই গোলাগুলি নিক্ষেপ করিয়া অবরোধকারীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিল।

সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া মোগল সেনাপতিগণ কূট নীতি অবলম্বন করিলেন। ডি মেলো নামক একজন বর্ণসঙ্কর পর্ত্তুগীজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগল সেনাপতিদিগকে একটি গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিল। তাঁহারা সেই পথের অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইলেন। পর্ত্তুগীজেরা দুর্গাভ্যন্তর হইতে তাঁহাদের গতির প্রতিরোধ করিতে লাগিল। দুর্গ আক্রমণ ব্যর্থ দেখিয়া সুড়ঙ্গ খনন করিয়া দুর্গ তোপে উড়াইয়া দিবার সঙ্কল্প স্থিরীকৃত হইল। অপর স্থান অপেক্ষা গির্জ্জার নিকটস্থ পরিখা স্বল্প-পরিধি-বিশিষ্ট থাকায় পয়ঃপ্রণালী খনন করিয়া পরিখা শুষ্ক করতঃ সুড়ঙ্গ খনন কার্য্য আরম্ভ হইল। সুড়ঙ্গ খনন কালে পর্ত্তুগীজদিগের একটি সুড়ঙ্গ দেখা গেল। সম্ভবতঃ পলায়নের জন্য ঐ সুড়ঙ্গটী খনন করা হইয়া থাকিবে। সেই সুড়ঙ্গটী নষ্ট করিয়া বাহাদুর কুস্থর অধীনস্থ লোকেরা দুর্গচূড়ার নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আর একটি সুড়ঙ্গ খনন করিল। এই উচ্চ চূড়ার নিম্নে অবরুদ্ধ বহু সেনা প্রত্যহ সমবেত হইত। ১০৪২ অব্দে ১৪ই রুবিয়াল্ আভাল্ তারিখে সুড়ঙ্গ খনন সমাপ্ত হইলে সুড়ঙ্গটি বারুদে পূর্ণ করা হইল। তৎপরে দুর্গচূড়া লক্ষ্য করিয়া একদল মোগল সেনা অগ্রসর হইল। পর্ত্তুগীজগণ অবরোধকারীদিগকে দুর্গচূড়া আক্রমণ করিতে দেখিয়া বহু সেনা সহ সেখানে যুদ্ধার্থ গমন করিল। কিছুকাল উভয় পক্ষে অজস্র গোলাগুলি বর্ষণ চলিতে লাগিল। অবশেষে বাহাদুর কুস্থর আদেশে বারুদ পূর্ণ সুড়ঙ্গে অগ্নি প্রদান করা হইল। নিমেষ মধ্যে প্রচণ্ড শব্দে সমবেত সেনা সহ উচ্চ চূড়া ও দুর্গের কতকাংশ শূন্যে উড়িয়া গেল। মোগল সৈন্যগণ এই শুভ ঘটনায় প্রোৎসাহিত হইয়া সকলে একযোগে দুর্গ আক্রমণ করিল। এই ভীষণ সংঘর্ষে কত যে পর্ত্তুগীজ ইহলোক পরিত্যাগ করিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অনেকে নৌকায় বা জাহাজে পলায়ন করিতে গিয়া সন্তরণ কালে জলে ডুবিয়া মরিল। কেহ কেহ নিরাপদে জাহাজে পৌঁছিল বটে, কিন্তু তাহারা অবিলম্বে খাজা শিয়ারের অধীনস্থ সেনাগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাহাজখানিতে দুই সহস্র লোক ধনরত্নসহ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এক্ষণে মোগল সেনার হস্তে পতিত হওয়া অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া জাহাজের অধ্যক্ষ স্বীয় জাহাজ তোপে উড়াইয়া দিলেন। অন্যান্য অনেকগুলি জাহাজ সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। হুগলী অবরোধের পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজদিগের সর্ব্বসমেত ৩২১ খানি জলযান হুগলীর দুর্গের সম্মুখে লঙ্গর করিয়াছিল। যুদ্ধাবসানে দেখা গেল কেবলমাত্র তিনখানি জলযান লইয়া কয়েকজন পর্ত্তুগীজ পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীরামপুরের নৌকার সেতুতে অগ্নি লাগিয়া কতকাংশ নষ্ট হওয়ায় সেই সুযোগে তাহারা প্রস্থান করিতে পারিয়াছিল; নতুবা তাহাদের পলায়নের কোনই সম্ভাবনা ছিল না।

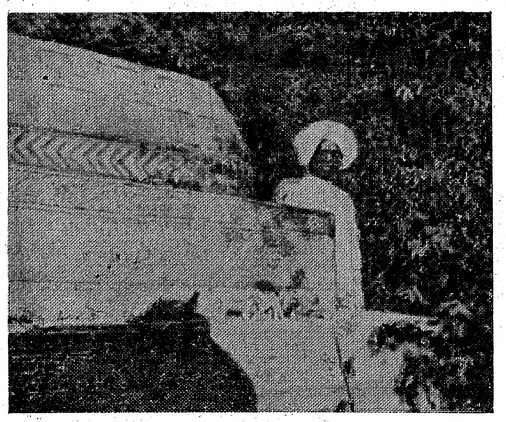

ফকীরদিগের সমাধি-স্তম্ভ

যে কোনও সম্পত্তি অগ্নিমুখ হইতে রক্ষা পাইল, তাহা বিজয়ী সেনা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইল। তাহারা গির্জ্জার অভ্যন্তরস্থ সুন্দর সুন্দর চিত্রপটগুলি ও প্রতিমূর্ত্তি সকল নষ্ট করিয়া ফেলিল।

অবরোধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত দশ সহস্র পর্ত্তুগীজ মৃত্যুমুখে পতিত ও স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকা ও ধর্ম্মযাজক লইয়া মোট ৪৪০০ জন পর্ত্তুগীজ বন্দী হইয়াছিল।

ইহাদের মধ্যে পাঁচ শত সুন্দর যুবক ও সুন্দরী যুবতী অবিলম্বে আগরার রাজধানীতে প্রেরিত হইল। যুবতীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগুলি সম্রাটের অন্তঃপুরে রক্ষিত হইল। অবশিষ্ট যুবতীগণকে প্রধান প্রধান ওমরাহগণের মধ্যে বিতরণ করা হইল। যুবকগণকে ত্বকচ্ছেদ করিয়া মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল। জেসুইট ধর্ম্মযাজকগণকে মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করিবার জন্য নানা রূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। বহু কষ্টে কয়েক মাস কারাবাসের পর তাঁহারা নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গোয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। এ সম্বন্ধে খ্যাতনামা ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার বলেন—

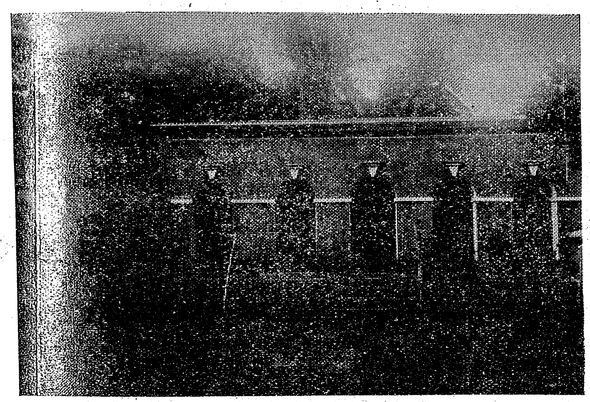

সপ্তগ্রাম—রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পাট

"The misery of the people is unparalled in the history of modern times; it nearly resembled the grievous Captivity of Babylon; for, even the children, priests and monks shared the universal doom. The handsome women, as well as married single, became inmates of the Seraglio; those of a more advanced age, or of inferior beauty, were distributed among the omrahs; little children underwent the rite of circumcision, and were made pages; and the men of adult age, allured for the most part, by fair promises or terrified by the daily threats of throwing them under the elephant's feet renounced the Christian faith. Some of the monks, however, remained faithful to their creed, and were conveyed to Goa, and other Portuguese settlements, by the kind exertions of the Jesuits and missionaries at Agra, who notwithstanding all this calamity continued in their dwelling, and were enabled to accomplish their benevolent purpose by powerful aid of money, and the warm intercession of their friends."

পর্ত্তুগীজেরা দশ সহস্র এ দেশীয় লোককে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। মোগল সেনাপতির আদেশে তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করা হইল। এই যুদ্ধে এক সহস্র মোগল সৈন্য হত হইয়াছিল। হুগলী বিজয়ের তিন দিবস পরে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা কাশিম খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

হুগলী পতনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে পর্ত্তুগীজদিগের পতন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ সেনাপতি সাম্প্রিয় প্রথম হুগলীতে পদার্পণ করেন। আর ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে এক শতাব্দী সমাপ্ত হইতে না হইতে পর্ত্তুগীজগণ বঙ্গদেশে নগণ্য হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রতাপ দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল, যদি তাহাদের গতির এইরূপ প্রতিরোধ না হইত, তাহা হইলে কালে যে তাহারা প্রভূত ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া মুসলমান রাজ্যের অধঃপতনকালে বঙ্গদেশে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিত না, তাহা কে বলিতে পারে?

পর্ত্তুগীজ দুর্গের ভিতর একটী গির্জ্জার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় উপাসনাদি হইত। তখন পাদ্রী ছিলেন ফ্রা দে ক্রুজ। তিনি একজন পরম ভক্ত ছিলেন।

সেই গির্জ্জার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর (Blessed Lady of our Happy Voyage) বেদীর নিম্নে বসিয়া তিনি অনেক সময় ধ্যান-ধারণায় অতিবাহিত করিতেন। এই দেবীর নিকট অনেকে মানসিক করিত এবং ফলও পাইত। ফ্রাঁ দে ক্রুজের একজন অন্তরঙ্গ বণিক বন্ধু ছিলেন। তিনি যখনই বাণিজ্য করিতে বিদেশ যাত্রা করিতেন, এই দেবীর নিকট ভক্তির সহিত মানসিক করিতেন—দেবীর কৃপায় তাঁহার আশাতীত অর্থলাভ হইত। দেবীই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধির মূলীভূত কারণ বলিয়া দেবীর প্রতি তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। অবরোধ কালে যখন দুর্গ রক্ষা হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখন সেই ভক্ত বণিক দেবী-মূর্ত্তিকে বেদী হইতে নামাইয়া লইলেন। শত্রু হস্তে নিপতিত হইলে মূর্ত্তিটি পদদলিত, বিচূর্ণিত ও নানা-রূপে নিগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই তিনি মূর্ত্তি সহ সন্তরণ করিয়া গঙ্গার পরপারে নিরাপদ স্থানে তাহা সংরক্ষণ করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু গুরুভার বশতঃ মূর্ত্তি সহ জলমগ্ন হন। কিছুকাল পরে পর্ত্তুগীজ দুর্গ মোগল করতলগত হয়। বিজীত পর্ত্তুগীজগণের সহিত পাদ্রী ফ্রাঁ দে ক্রুজ ও কয়েকজন ধর্ম্ম-যাজকও আগরায় বন্দী রূপে প্রেরিত হন। তাঁহাকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করাইবার জন্য নানাবিধ প্রলোভন ও নির্য্যাতন যখন ব্যর্থ হইল, তখন বাদশাহ হস্তী-পদদলিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। একটী প্রচণ্ড মাতঙ্গকে কয়েক দিন অভুক্ত রাখা হইল। সহরের বহির্ভাগে এক বিস্তৃত ভূখণ্ডে বন্দী দে ক্রুজকে করি-পদ-পিষ্ট করিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। নাগরিকগণকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য আদেশ বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। নির্দ্ধারিত কালে স্বয়ং বাদশাহ মহা সমারোহের সহিত শোভা-যাত্রা করিয়া বধ্য-ভূমিতে উপনীত হইলেন। তাহার পূর্ব্বে স্থানটি জন-সঙ্ঘে পূর্ণ হইয়াছিল। বন্দী বধ্য-ভূমির মধ্যস্থলে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আনীত হইলে, বুভুক্ষু মাতঙ্গকে তাঁহাকে পদ-পিষ্ট করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। হুঙ্কার করিতে করিতে ক্রোধোন্মত্ত মাতঙ্গ শূন্যে শুণ্ড উত্তোলন করিয়া প্রচণ্ড বেগে তাঁহার উদ্দেশে প্রধাবিত হইল। সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া দর্শকগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। সকলে বুঝিল, নিমেষের মধ্যে সব শেষ হইয়া যাইবে—হস্তি-পদ-পিষ্ট হইয়া অবিলম্বে বন্দী ধূলিকণার সহিত মিশিয়া যাইবে। সকলে আগ্রহের সহিত সেই শেষ মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল। অকস্মাৎ এক অচিন্তনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। বন্দীকে দেখিবামাত্র মত্ত মাতঙ্গ স্তম্ভিত হইয়া শান্ত ভাব ধারণ করিল ও শুণ্ডের দ্বারা তাঁহার পদ-সম্বাহন করিতে আরম্ভ করিল। এই অভাবনীয় দৃশ্যে সকলে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বন্দীর উদ্দেশে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। বাদশাহের বদনমণ্ডল কালিমায় সমাচ্ছন্ন হইল। এই আকস্মিক ব্যাপারে তিনিও বিচলিত হইয়া পড়িলেন। জনসঙ্ঘের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া তিনি বন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার আদেশ দিলেন ও তাঁহাকে অন্যান্য বন্দিগণ সহ হুগলীতে বাস করিবার ও গির্জ্জা পুনর্গঠন করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। এতদুপলক্ষে



ত্রিবেণী—গঙ্গাসরস্বতী-সঙ্গম

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার জন্য সপ্তগ্রাম সরকার হইতে পৃথকীকৃত করিয়া বাদশাহ ৭৭৭ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন ও গির্জ্জাধ্যক্ষকে নরহত্যা ব্যতীত সর্ব্ব রকম বিচারের ক্ষমতা প্রদান করেন।

হুগলী নগরের উত্তরে এবং কেওটা সার্কিট হাউস বা ডাকাতি কমিশনরের বাটীর দক্ষিণে বলাগড় নামক পল্লী অবস্থিত আছে। এবার সেইখানে গির্জ্জা পুনঃ নির্ম্মিত হইল। পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপনের পর হইতে বলাগড় "ব্যাণ্ডেল" নামে পরিচিত হয়। "ব্যাণ্ডেল" বন্দর কথার অপভ্রংশ। গির্জ্জা প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব রাত্রিতে পাদ্‌রী সাহেব স্বপ্ন দেখিলেন, যেন গির্জ্জার পূর্ব্ব দিকে ভাগীরথীর তটভূমি অপূর্ব্ব আলোকে সমুদ্ভাসিত হইয়াছে—আর তাহার মধ্যস্থলে

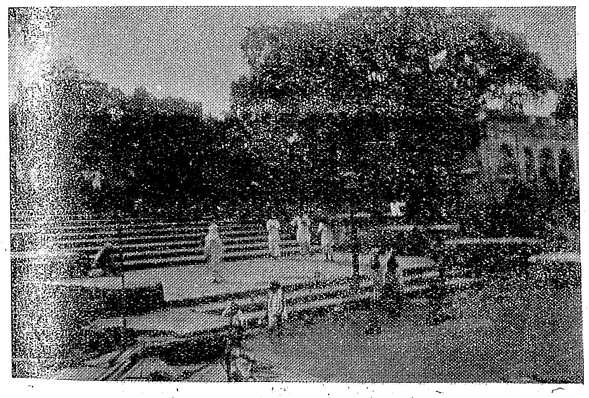

মুক্তবেণী—ত্রিবেণী

সেই জলমগ্না দেবী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা হইয়া আছেন। আর সেই বণিক উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন—"উঠ—উঠ, জাগ্রত হইয়া দেখ, আমি মাতৃদেবীকে লইয়া আসিয়াছি!" পাদ্‌রী সাহেব ব্যস্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন ও গবাক্ষ-দ্বার উন্মোচন করিয়া দেখিলেন; কিন্তু কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তিনি শয়নকালে এই দেবী-মূর্ত্তির কথাই ভাবিতেছিলেন। মনে হইতেছিল, গির্জ্জা প্রতিষ্ঠার সময় মূর্ত্তিটি বেদীর উপর সংরক্ষিত হইলে কেমন সুশোভন হইত। তাই ভাবিলেম, বুঝি বা সেই চিন্তাধারাই অলীক স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পুনরায় নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাবেশে আরও দুইবার ঐরূপ স্বপ্ন দেখিলেন। প্রাতে জন-কলরবে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলেন, গঙ্গার ঘাটে বহু লোক সমবেত হইয়াছে। পূর্ব্ব রজনীর স্বপ্নের কথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি ব্যগ্র হইয়া সেখানে গিয়া দেখিলেন, গির্জ্জার ঘাটে স্বপ্নাদিষ্ট সেই দেবী-মূর্ত্তি। তখন সেই মূর্ত্তি গির্জ্জাভ্যন্তরে আনীত ও প্রতিষ্ঠিত হইলেন! সেই মহোৎসবের দিন আর একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। সান্ধ্যভোজের অব্যবহিত পূর্ব্বে সহসা একখানি অর্ণবপোত আসিয়া গির্জ্জার ঘাটে লাগিল। পোতাধ্যক্ষ জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া পাদ্‌রী সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানাইলেন, তিনি সাগর-পথে বিস্কে উপসাগরে বড়ই বিপন্ন হইয়াছিলেন—জাহাজ রক্ষার কোনও উপায়ই ছিল না। নীলাম্বুর উত্তাল তরঙ্গমালা জাহাজখানিকে স্বীয় কুক্ষিস্থ করিবার উপক্রম করিলে, তিনি এই গির্জ্জার দেবী-মূর্ত্তির উদ্দেশে আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিবামাত্র সমুদ্র শান্ত ভাব ধারণ করে ও জাহাজ রক্ষা পায়। তিনি এই দেবীর নিকট জাহাজের মাস্তুলটি মানসিক করিয়াছিলেন, তাহাই প্রদান করিতে আসিয়াছেন। পরদিন জাহাজ হইতে সেই মাস্তুল খুলিয়া আনিয়া গির্জ্জার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে তাহা প্রোথিত করা হয়। সেই মাস্তুল সর্ব্বধ্বংসী কালকে উপেক্ষা করিয়া এখনও সেখানে দণ্ডায়মান আছে। এখনও সেই দেবীর নিকট অনেকে মানসিক দিয়া থাকে। অনেককে ৪।৫ হাত লম্বা মোমবাতি মানসিক দিতে দেখিয়াছি। অনেকে পুত্র পর্য্যন্ত মানসিক করে। তাহাকে দান করিয়া ধর্ম্ম-যাজককে ছাগশিশু বা মেষশাবক বিনিময়ে দিয়া পুত্র ক্রয় করিয়া লয়। আপদ বিপদ হইতে উদ্ধারের জন্য,

কঠিন ব্যাধি হইতে মুক্তির আশায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বীরা নানারূপ মানসিক করে; এমন কি, হিন্দুদের ন্যায় মস্তকের কেশরাশি মানসিক রূপে প্রদত্ত হয়। পাদরী সাহেব প্রথমে কেশগুচ্ছ কর্ত্তন করেন। তাহার পর নরসুন্দরেরা অবশিষ্ট কেশের গতি করে। সেণ্ট জেরিয়ার কলেজের হোষ্টেন্ সাহেব স্বচক্ষে এই কেশ কর্ত্তন দেখিয়া লিখিয়াছেন যে, ইহা আন্তরিক বিশ্বাসের কার্য্য—ইহাকে কুসংস্কার বলা মহা ভ্রম ও অতীব অন্যায়। তিনি তদুপলক্ষে লিখিয়াছেন—

"Not less curious nor less edifying is the case that came under my notice to-day (January. 6, 1914). A Bengali Christian and his wife had brought with them their two children, one a baby, the other a boy of seven. Again a vow. For why do you think was the boy wearing such long tresses, something like a jogi's matted head of hair? Because in the time of his illness, his parents had vowed never to let scissors, razor or other sharp instrument injure his head, till he came to the age of reason, and now he was 7 years old. Therefore they had come, all the way from Barisal, visiting every church in Calcutta, and keeping Bandel as their seventh and last station. The Padre Sahib would now cut one of the pretty boy's ugly, tortuous, rattan-twisted tresses, and the barber in the Bazar would do the rest. Oh, a happy day for the boy and his parents! Their days of grief and penance were over at last, and joy and happiness would sit down once more at the fire side.

Rank superstition! someone will say. A Hindu practice, no doubt. Let him call it what he likes, but not superstition. What does he call superstition? Can he define? Does he call superstition every form of worship to which he is not himself addicted? What shall we call so many practices of his, worse than bondage, which we abominate? Let him set his house in order first, sweep out of doors his belief in lucky horse-shoes and tigers' claws, in spirit-

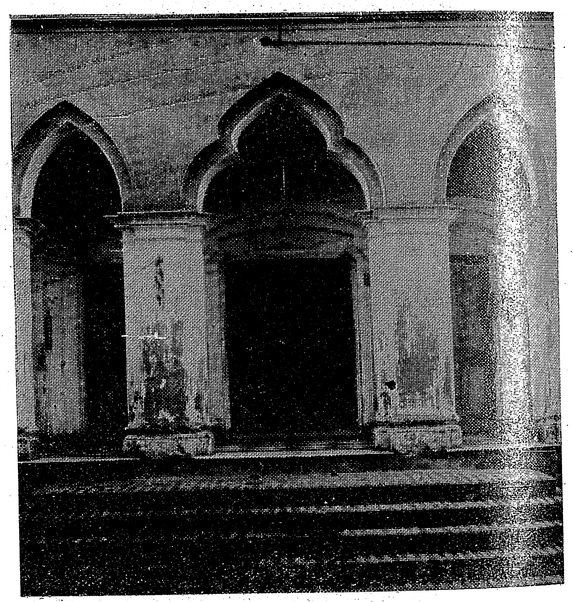

উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাঠ

rapping and table-turning, in astrology and palmistry, in masonic triangles, John-from-over-the-water, mahatmas or the Dalai Lama. The saffron-clothed Jogi with matted hair, who shakes his Vishnu trident in the streets and mumbles his prayers on the 108 beads of his rosary, has more piety in him, even if he misdirects his worship, than the dandy with neatly trimmed moustache who humbugs the Creator by thinking him too great for his prayers and his bowing his knees. Grief and penance sits down on the dung-hill in sackcloth and ashes. It shows itself in the long dishevelled hair of the Nazarite. It is symbolised in cropped head of the Hindu widow lamenting her husband's death. Her short hair are her widow's weeds, and she will carry them with her to the grave. Such practices and the like are not Hindu, nor Asiatic. They are mundial, for they are human. They have their reason in the heart of man, and man can give reason for his belief in them, but not for your modern forms of witchcraft."

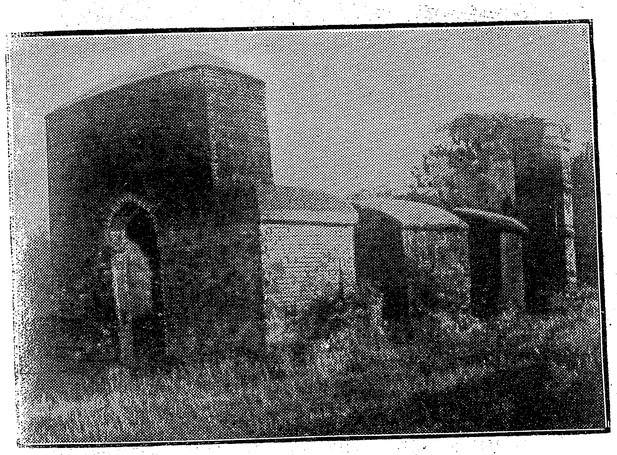

সপ্তগ্রাম মসজীদ (১৫২৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত)

দেবোদ্দেশে সন্তান উৎসর্গ করা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল—সেই জন্যই দেবদাসী প্রভৃতির সৃষ্টি। রোমান ক্যাথলিক সমাজেও কঠিন পীড়া বা অন্য কারণে সন্তান উৎসর্গের প্রথা আছে। তবে এখানে সচরাচর "দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতে" নিয়মের অনুসরণ করা হয়। ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার এইরূপ একটি ঘটনার কথা হোষ্টেন সাহেব (H. Hosten, S. J.) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জনৈক মাদ্রাজী মহিলা খড়্গপুর হইতে তাঁহার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রকে ব্যাণ্ডেল গির্জ্জায় উৎসর্গ করিতে লইয়া আসেন। তিনি পাদরী সাহেবকে বলেন "বালক শৈশবে কঠিন পীড়াক্রান্ত হওয়ায় সে আরোগ্য লাভ করিলে গির্জ্জাকে দান করিব এইরূপ মানস করিয়াছিলাম। সে আরোগ্য হইয়াছে; আমি তাহাকে এখানে আনিয়াছি; আপনি গ্রহণ করুন।" তদুত্তরে পাদরী বলেন "আমি ইহাকে গ্রহণ করিলাম।" গির্জ্জায় দীর্ঘকাল ধরিয়া সুগন্ধি ধূপ ধূনা ও বর্ত্তিকা প্রদান ও পূজা অর্চ্চনার পর বালকের মাতা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন—বালকও তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। পাদরী বলিলেন "ও কোথায় যাইবে, আমি যে উহাকে লইয়াছি, বালকটি যে আমার।" মহিলাটি বলিলেন "কিন্তু বাবা....." পাদরী বলিলেন "কিন্তু মা তোমার মানসিক কি ছিল?" মহিলাটি বলিলেন "ভাল, বালকটিকে ক্রয় করিয়া লইবার জন্য আমরা কোনও দ্রব্য আনিয়াছি।" "তোমরা যা এনেছ, সেটা কি?" "একটি ছাগ-শিশু।"

তাহার মূল্য বালকের সমতুল্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল।

পর্ত্তুগীজেরা হুগলীতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের পূর্ব্ব-গৌরবের পুনরুদ্ধার হইল না। তাহাদের পতনের অব্যবহিত পরে ইংরাজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে আবির্ভূত হওয়ায়, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য একেবারে নষ্ট হইয়া গেল। অনন্যোপায় হইয়া তাহারা দলে দলে মোগল সেনাভুক্ত হইতে লাগিল। অনেকে অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির কুঠীতে পাঁউরুটী, পনির, চাটনি, মোরব্বা, সুতি ও পশমের মোজা প্রস্তুত করিয়া তাহার বিক্রয় লব্ধ অর্থে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিল। আবার অনেকে জীবিকার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে লাগিল। ঐতিহাসিক অর্মে (Orme) বলেন, বঙ্গের নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা অবরোধ কালে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গে দুই সহস্র পর্ত্তুগীজ পুত্র-কলত্র লইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। তখনও হুগলীতে পর্ত্তুগীজের বাস ছিল। কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন কালে সিরাজউদ্দৌলা হুগলীর পর্ত্তুগীজগণের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র মুদ্রা জরিমানা আদায় করেন। পর্ত্তুগীজেরা এদেশীয় নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া এক বর্ণসঙ্কর জাতির সৃষ্টি করে। হুগলীতে বর্ত্তমানে কোনও পর্ত্তুগীজের বাস নাই। তাহাদের বংশধরেরা এখন কলিকাতায় বহুবাজার, বৈঠকখানা ও তালতলা অঞ্চলে বসবাস করিয়া আছে। পর্ত্তুগীজ শক্তি লুপ্ত হইলেও পর্ত্তুগীজ ভাষা য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতিগণের মধ্যে সাধারণ-চলিত ভাষা রূপে পরবর্ত্তী কালেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনন্দে একটি সর্ত্ত ছিল যে, ভারতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণকে কর্ম্ম গ্রহণের এক বৎসর মধ্যে পর্ত্তুগীজ ভাষা শিক্ষা করিতে হইবে। প্রথম প্রোটেষ্টাণ্ট মিশনরী কারনাণ্ডার সাহেব পর্ত্তুগীজ ভাষায় ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ইংরাজী অপেক্ষা পর্ত্তুগীজ ভাষা তাঁহার নিকট সহজ-বোধ্য ছিল।

ব্যাণ্ডেল গির্জ্জা পর্ত্তুগীজদিগের শেষ স্মৃতি অদ্যাপি জাগরূক রাখিয়াছে। এই গির্জ্জাভ্যন্তরে "লেডী অফ্ দি রোজারী" ও অন্যান্য দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। গির্জ্জার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে উচ্চ চূড়ার পূর্ব্ব দিকে পূর্ব্বোক্ত মাতৃ-মূর্ত্তি (Lady of our Happy Voyage) স্থাপিতা হইয়াছেন। মাতৃ-মূর্ত্তি শিশু যিশুকে ক্রোড়ে করিয়া দণ্ডায়মানা আছেন। গির্জ্জা সংলগ্ন অনাথাশ্রম ও খৃষ্টীয়

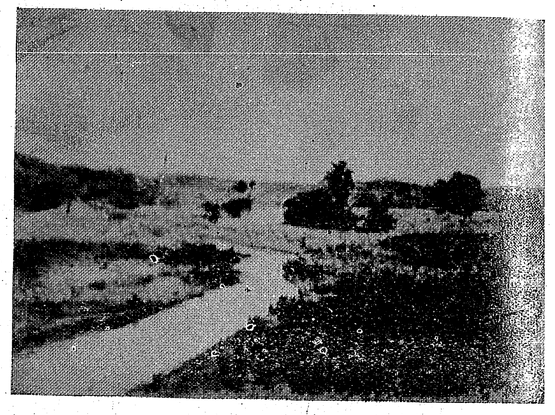

সরস্বতী-তীর

নান্ বা কুমারী তপস্বিনীগণের জন্য আশ্রম ছিল। নাও পোলো উদ্যানে জেসুইটদিগের একটী কলেজও প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখন কেবল মাত্র ব্যাণ্ডেল গির্জ্জাটি সংস্কৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। গির্জ্জাতে একজন "প্রায়র" (Prior) উপাধিধারী পাদরী থাকেন। তিনি মেলিয়াপুর ও গোয়ার প্রধান ধর্ম্মাচার্য্যের অধীনে কার্য্য করেন। সম্রাট শাহজাঁহা প্রদত্ত ৭৭৭ বিঘা ভূমির মধ্যে বর্ত্তমানে ৩৮০ বিঘা জমি ব্যাণ্ডেল গির্জ্জার অধীনে আছে। তাহার বার্ষিক আয় ১২৪০৲। শত বর্ষ পূর্ব্বেও ব্যাণ্ডেলে অনেক সুন্দর সুন্দর বাটী ছিল। কলিকাতা অঞ্চল হইতে এক জোয়ারে আসা যায় বলিয়া, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অনেক কলিকাতাবাসী 'সপ্তাহ শেষ' (Week end) এখানে অতিবাহিত করিয়া যাইতেন। এখন ব্যাণ্ডেল ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট জঙ্গলময় স্থানে পরিণত হইয়াছে।

পাদরী লং সাহেব এসিয়াটিকাসের (Asiaticus) লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাণ্ডেলের দুর্নীতিপরায়ণতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"The lascivious damsels of this once gay city now slumber under its ruins, when pomp withdrew from hence, debauchery vanished, poverty now stalks over the ground. Where once beguiling priests led the unwary stranger in the morning to the altar of God, and in the evening to the chamber of riot ; regardless of their Sacredotal robes here Priests for gold were the Factors of Pleasure."

পর্ত্তুগীজরা পূর্ব্বে ধর্ম্মে, শৌর্য্য-বীর্য্যে, ধনে-মানে অদ্বিতীয় ছিল। তাহাদের পরাক্রম এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে, তাহাদের নামেই ভীতির সঞ্চার হইত ; কিন্তু কাল ক্রমে সকল সদ্‌গুণ বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা অধর্ম্মাচরণে, ব্যভিচারে ও সকল প্রকার পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হইল ; এবং ক্রমে ক্রমে জগতের ঘৃণিত ও হেয় জাতি রূপে পরিণত হইল। পাপের ফলে আজ তাহাদের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত। ব্যাণ্ডেল গির্জ্জাটি মস্তকোত্তোলন করিয়া অতীত যুগের ও পাপের ভীষণ প্রায়শ্চিত্তের স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছ মাত্র। তখন ব্যাণ্ডেলের পাদদেশ বিধৌত করিয়া যে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত, এক দিন যে ভাগীরথী-তীর পঞ্চবিংশ সহস্রাধিক পর্ত্তুগীজ-সন্তানের কলরবে মুখরিত ছিল, এখনও সেই ভাগীরথী কুলকুল রবে সাগরোদ্দেশে সেই রূপই ছুটিয়াছে, নাই কেবল পর্ত্তুগীজেরা। অতীতের সাক্ষীস্বরূপ গির্জ্জাটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গির্জ্জাটি যত দিন থাকিবে, তত দিন পর্ত্তুগীজ-দিগের স্মৃতি দেদীপ্যমান থাকিবে। গির্জ্জাটির সঙ্গে সঙ্গে পর্ত্তুগীজ স্মৃতি কালের অনন্ত গর্ভে একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে।

মুক্তি-বাঁধন

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

যাই যবে স্নিগ্ধ শ্যামাঙ্গন ছাড়ি' তব—
হে আমার বঙ্গভূমি! রূপ অভিনব,
ম্লান হ'য়ে আসে মম চোখে। বারবার—
তোমা লাগি' ঝরে মম নয়নের ধার ;
মাতৃহারা শিশুর মতন। ত্যজি' মান ;
বাঙ্গালার কিবা হিন্দু কিবা মুসলমান—
কাছে পেলে, আকড়িয়া বলি কাঁদি হাসি—
ভাই ভাই দুইজনে—মোরা বঙ্গবাসী!

সজল নয়নে চাহি একান্ত নীরবে,—
ছেড়ে যাই ভারতের উপকূল যবে,—
তালীবন-রেখাঙ্কিত দিগন্ত-সীমায়,
জননীর স্নেহাঞ্চল ধীরে মিশে যায়,—
অস্ত-রবি-রশ্মি সম। নীল সিন্ধুজল,
বিরহীর বেদনায় উথলে চঞ্চল ;

যদি পাই ভারতের হোক্ না মারাঠী
অথবা পাঠান, শিখ কিবা গুজরাটী—
সাধ যায়, কহিবারে হ'য়ে আগুয়ান ;—
ভাই ভাই মোরা সব ভারত-সন্তান।

দিবসের শ্রান্তি শেষে এক দিন যবে—
মুদিয়া আসিবে মম চোখ দু'টী ভবে!
গন্ধ, গান, রূপ, রস—এ বিশ্ব ধরার—
মুছে দিবে ঘনায়িত সন্ধ্যার আঁধার ;
যদি কারো সনে দেখা হয় লোকান্তরে—
হোক না জনম তার এসিয়ার 'পরে,
অথবা সে ইউরোপে! ধনী কি নির্ধন,
শিশু, যুবা, কিম্বা বৃদ্ধ হোক না সেজন—
কোলাকুলি করি' তারে বলিব সম্ভাষি,—
বিশ্বমানবের ভাই—আমি বিশ্ববাসী!



নারী-প্রসঙ্গে ইস্‌লাম্

মুহম্মদ অব্‌দুল্লাহ

[বর্ত্তমানে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হিন্দু-মুস্‌লিমের মিলন-সংঘটন। অন্যান্য কারণের মধ্যে, আমার মনে হয়, এই দুইটি সমাজের পরস্পর বিরোধিতার একটি প্রধান কারণ—পরস্পরের ধর্ম্ম ও সমাজের বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব। শুধু তাই নহে, নিজের-নিজের ধর্ম্মের সম্বন্ধেও সকলের পর্য্যাপ্ত জ্ঞান নাই। যদি বা হিন্দুর সে বিষয়ে কিছু সুবিধা আছে,—ধর্ম্মের প্রকৃত সত্য জানাইয়া দিবার জন্য বাংলার মুস্‌লিমের প্রায় কেহই নাই। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সংখ্যা নগণ্য। তাহা ছাড়া, একদল লোক ধর্ম্মশিক্ষার নামে হীন স্বার্থসিদ্ধির জন্য অধর্ম্মই শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেই কারণে আমি আমার অযোগ্য হস্তেই লেখনী ধারণ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, এই উপায়ে নিজের ক্ষুদ্র শক্তিমত সামান্য পরিমাণেও দেশ ও সমাজের সেবা করিতে সমর্থ হইব।—লেখক।]

"হে মানবগণ! তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্যের বিষয়ে অবহিত হও, যিনি তোমাদিগকে একমাত্র সত্ত্ব হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন ও একই প্রকার হইতে ইহার জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই দুইটি হইতে বহু নরনারী বিস্তৃত করিয়াছেন;...এবং পরস্পর আত্মীয়তার সম্বন্ধের প্রতি তোমাদের কর্ত্তব্যের বিষয়ে অবহিত হও (৪:১; ৫৩১, ৫৩২)[১]। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, নারী পুরুষের সহজাত অর্দ্ধাংশ।

নারী ও পুরুষের সম্বন্ধের মধ্যে সৃষ্টিক্রিয়া হইতে যে সাদৃশ্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আছে, এবং একতর অন্যতরের সহিত তুলনায় যে কোনক্রমেই ছোট বা বড় নহে, এই বাক্যে তাহাই সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে, এই উভয়ের মধ্যে একজন অন্যের নিরপেক্ষ হইলে চলিতে পারে না; কারণ, বাহ্য আকৃতি দুইটি হইলেও মূল উদ্দেশ্য এক। উভয়েরই লক্ষ্য অভিন্ন, কিন্তু সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন ওণ, কার্য্য ও উপায়ের ভার গ্রহণ করিয়া উভয়েই নিজ-নিজ নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া চলিয়াছে। তথাপি লক্ষ্য সাধনের পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য একে অপরের সহায়তা ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না। এ বিধান শুধু মানবের জন্য নহে,—সমগ্র জীবজগৎ, উদ্ভিজ্জগৎ এবং প্রাকৃতিক জগতের জন্যই এই একই বিধান। তবে মানব বিবেক-সম্পন্ন জীব, তাহার জন্য এই বিধানের মধ্যে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

সৃষ্টিকর্ত্তা নারী পুরুষের সৃষ্টির মধ্যে যে সাম্যের জ্ঞান

১ মৌলবী মুহম্মদ্ অলীর (লাহোর) অনূদিত পবিত্র কুরআনের ইংরাজী সংস্করণ।

নিদর্শন দিয়াছেন, সমাজ-জীবনে মানব-জাতি যদি সাধারণ ভাবে সেই জ্ঞান ও নিদর্শনের মূল্য ও মর্য্যাদা রক্ষা রাখিতে পারিত, তবে মানব-সমাজে কোন দিন নারী ও পুরুষের মধ্যে সঙ্কোচ ও অবিশ্বাসের ফলে কোন রূপ অনাচার ও ব্যভিচার স্থান পাইত না। কিন্তু চিরকাল তাহা যায় না। মানুষ শরীরী জীব, রক্ত-মাংসের দেহই তাহার প্রধান জ্ঞান ও সেবার বিষয়ীভূত। সেই দেহের বাহ্য শক্তিকেই সে শক্তি বলিয়া চিনিয়াছে; এবং সে শক্তি লাভ করিতে নারী অপেক্ষা পুরুষেরই সুযোগ অধিক। অধিক পরিমাণে বাহ্য শক্তি লাভ করিয়া নারী অপেক্ষা পুরুষ অধিক শক্তিমান্ হইল,—নারীও জ্ঞানের অল্পতাহেতু পুরুষের শক্তিমত্তা অস্বীকার করিতে পারিল না। সেই হইতে নারীর অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইতে লাগিল। কাজেই নারীর উপর পুরুষের অযথা কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারও সেই সঙ্গে বাড়িতে লাগিল। তাহার ফলে নারী পুরুষের হাতের পুতুল, লালসার দাসী হইয়া পড়িল।

প্রাচীন যুগে পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই মানব-সমাজের অবস্থা এইরূপ ছিল। তবে কদাচিৎ কোন কোন সভ্য দেশের ইতিহাসে কোন নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আংশিক ভাবে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমাদের প্রাচীন ভারত তাহার মধ্যে একটি।

জগতে মানব-সৃষ্টির আদিকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্মশিক্ষক সকল দেশে এবং সকল যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন (২:১৩৬; ১৭৫)[১]। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত নারীজাতির কল্যাণের ও উন্নতির জন্য কেহই আমাদের পক্ষে সন্তোষজনক সাম্যের বাণী শুনাইয়া যান নাই। সম্ভবতঃ তাহা এই কারণে যে, সে সকল যুগের মানব-সমাজের বুদ্ধি-বৃত্তি যথেষ্ট পরিপক্কতা লাভ করে নাই। যাহা হউক, সে অবস্থা চিরকাল টিকিতে পারিল না। প্রায় তের শতাব্দী পূর্ব্বে মানব-সমাজ হইতে অন্য সকল দোষের ন্যায় এই দোষটিও দূরীভূত করিবার ভার লইয়া আরবের প্রচণ্ড মরুভূমির মধ্যে এক অদ্বিতীয় মহা-পুরুষ এই সাম্য-বাণীর পতাকা হস্তে আবির্ভূত হইলেন। ইনি প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্—তাঁহার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও কল্যাণ বর্ষিত হোক।

যে যুগে প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে যুগের আরব জাতির ইতিহাস একটু জানা আবশ্যক। সে কালে সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সকল অংশই অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল। এ বিষয়ে আরবের অবস্থা ছিল আবার সকলের অগ্রগণ্য। ধর্ম্ম বলিয়া তখন আরব জাতির কোনই জ্ঞান ছিল না। তাহারা পাপময় হিংস্র জীবনকেই গৌরবময় মনে করিত। মারামারি, কাটাকাটি ও যুদ্ধবিগ্রহই ছিল তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক প্রমোদের বিষয়। দেশে সম্পূর্ণ অরাজকতা বিদ্যমান ছিল। যে যতখানি দক্ষতার সহিত বর্শা চালাইতে পারিত, সেই তত অধিক সম্পত্তির অধিকার লাভ করিত (৫৪৪)[১]। একপ্রকার অশ্লীল প্রেমাত্মক কাব্য ব্যতীত তাহাদের মধ্যে প্রায় কোন প্রকার কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শনের চর্চ্চা ছিল না। নারীর প্রতি তাহাদের যে ব্যবহার ছিল, তাহা আরও বীভৎস। নারী তাহাদের সম্ভোগের সামগ্রীতেই পরিণত হইয়াছিল। পিতার পরিত্যক্তা পত্নী (বিমাতা) ও ক্রীতদাসীদিগকে তাহারা অস্থাবর সম্পত্তির মতই ভাগ করিয়া লইত। এদেশে গঙ্গায় সন্তান নিক্ষেপের ন্যায় তাহারা অনেক সময় কন্যাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করিত। এককালে তাহারা অনির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক পত্নী গ্রহণ করিতে পারিত। তাহা ছাড়া, কুলক্রোধের বশে শুক্র-নিধনের প্রবৃত্তি তাহাদের মধ্যে বংশানুক্রমে চলিয়া আসিত। বহুকাল হইতে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় নাই, অনেক সংস্কারকও এই পরিবর্ত্তন ঘটাইতে গিয়া ব্যর্থ-প্রয়াস হইয়াছিলেন। কিন্তু এক দিন তাহাদের এই সমস্ত পাপের মাত্রা চরম সীমায় উপনীত হইল; অবস্থার পরিণতি দেখিয়া বিশ্বপ্রভু সমগ্র জগতের ধর্ম্ম ও সমাজের উপর প্রচণ্ড বিপ্লবের তরঙ্গ নিক্ষেপের জন্য একজন উপযুক্ত সংস্কারক প্রেরণ করিলেন।

প্রেরিত মহাপুরুষ মুহম্মদ্ নারীজাতির উন্নতির জন্য কি করিয়াছেন, সে বিষয়ে প্রথমে কয়েকজন বিখ্যাতনামা মুস্‌লিম্ ও অমুস্‌লিমের মত উদ্ধৃত করিব। স্বনামধন্যা মনস্বিনী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সিংহলে একটি বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন:—"I wonder how many of the Christian ladies here today realise that the first status of honour, the first status of legal right and responsibility, was conferred

on woman by the Islamic Faith. How many of my own co-religionists, how many of the Buddhist people, how many of the Christian communities, understand that thirteen hundred years ago a Prophet rose and said: 'Chattel! Be thou woman and stand upright and face the sun!' That is a very different conception from what the (Christian) missionary writers give of the position of the Islamic womanhood."

"মানবজাতির ইতিহাসে ভ্রাতৃত্বের সম্মেলনে নারী এই প্রথম পুরুষের পার্শ্বস্থিত তাঁহার উপযুক্ত আসন লাভ করিলেন।"—মুহম্মদ অলী (লাহোর)।

"তেরশত বৎসর পূর্ব্বে মুহম্মদ্ মুস্‌লিম্‌দিগের মাতা, পত্নী ও কন্যাদিগকে যে মর্য্যাদা ও সম্মান দিয়া গিয়াছেন, প্রতীচ্যের আইনে আজ পর্য্যন্ত তাহা সাধারণ ভাবে নারীর প্রাপ্য হয় নাই।...নারী ও পুরুষের মধ্যে মুহম্মদ্ সম্পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।"—Pierre Carbites.

"মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে নারী ও পুরুষের আসন পৃথক্ নহে। নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই সৎকার্য্যের অনুরূপ ফললাভ করিবে (৩২:৩৫)[১]। কিন্তু শারীরিক বিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সমাজ-জীবনেও তাহা কতক পরিমাণে আছে; এবং ইহা শুধু সাংসারিক কার্য্য ও কার্য্যক্ষেত্র লইয়া, যাহা নিতান্ত স্বাভাবিক ও যাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। দৈহিক ব্যাপারে যে পার্থক্য আছে, তাহার ফলে কোন কোন বিশিষ্ট গুণের নিমিত্ত পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করে। নারী তাঁহার স্বভাবজাত দৈহিক সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তায় পুরুষকে পরাস্ত করেন, এবং পুরুষের দৈহিক গঠনের দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠতার নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। নারীর ভরণ পোষণের ভার পুরুষকে বহন করিতে হয় এবং নারীও নিজের পালামত অন্য ভাবে তাহার প্রতিদান দিয়া থাকেন। (২:২২৮; ৪:৯৭; ৪:৩৪; ৫:৬)[১]।

ইস্‌লামে মাতা ও কন্যার সম্মান কিরূপে করা হইয়াছে তাহা দেখা যাক। গর্ভধারিণীই প্রকৃত মাতা। পুরুষগণের পক্ষে স্রষ্টিকর্ত্তার পরে মাতা অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধা ভক্তি ও সম্মানের পাত্র আর কোন ব্যক্তিই নহে। অল্লাহ্‌র আদেশ ও উপদেশাদি লঙ্ঘন করিতে না হইলে মায়ের যে কোন আদেশ বা ইচ্ছা মানিয়া চলা প্রত্যেক পুরুষের কর্ত্তব্য। মাকে যে কতখানি গৌরব ও সম্মানের পাত্রী করা হইয়াছে, তাহা প্রেরিত মহাপুরুষের একটি প্রবচন হইতে বুঝা যাইবে। তিনি বলিয়াছেন, স্বর্গ তোমাদের মাতৃগণের চরণতলে অবস্থিত। জননী কেবল স্বর্গাদপি গরীয়সী নহেন, তাঁহার চরণ-যুগলেরই যার স্বর্গের মস্তকে। তাহা ছাড়া তিনি আরও বলিয়াছেন, যে স্বর্গে প্রবেশ করিতে চায়, তাহাকে তাহার মাতা ও পিতাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। জননীকে যে সম্মানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে, পিতাও তাহা হইতে বঞ্চিত। ইস্‌লাম্ সর্ব্বত্রই নারীজাতির প্রতি এইরূপ সুবিচার করিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বর্ব্বর আরবগণের মধ্যে অনেক সময় কন্যাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করিবার নিষ্ঠুর প্রথা ছিল (৮১:৮৯; ২৬:৭৫)[১]। এরূপ কন্যা-হত্যার, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পুত্রবলিরও, বর্ব্বর আরব শতবর্ষ পূর্ব্বেও আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। আরও কত দেশে ছিল, এবং আজ পর্য্যন্ত তাহা চলিতেছে কি না, তাহাও ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু আরব্য সমাজে এই প্রথা দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইলেও, প্রেরিত মহাপুরুষ স্বল্পকালের মধ্যে, মাত্র তেইশটি বৎসরের প্রচারের ফলে, এই বর্ব্বর প্রথা সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন আরব জাতির নিষ্ঠুরতাই গতি-পরিবর্ত্তন করিয়া জ্ঞানের আলোক পরিণত হইল; আরবগণ তখন অন্যান্য বহু দেশের আদর্শ-স্থানীয় হইয়া পড়িল। কন্যাদিগের সম্বন্ধে প্রেরিত মহাপুরুষ বহু প্রকারে আদেশ ও উপদেশ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুইটি এ ক্ষেত্রে উদ্ধৃত হইল:—(১) যাহার কন্যা আছে, সে যদি তাকে জীবন্ত সমাধিস্থ না করে, তিরস্কার না করে, অথবা অন্যান্য সন্তানগণের [অর্থাৎ পুত্রসন্তানগণের] প্রতি পক্ষপাতিত্ব না করে, তবে অল্লাহ্ তাহাকে স্বর্গে স্থান দিবেন। (২) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ কি, তাহা কি আমি তোমাদিগকে বলিয়া দিব না? ইহা তোমাদের স্বামি-পরিত্যক্তা কন্যার প্রতি সদয় ব্যবহার। তিনি তাঁহার কন্যা ফাতিমাকে বড় ভাল

সতেন,—কন্যা স্বামীগৃহ হইতে পিতৃগৃহে আসিলে তিনি তার প্রত্যুদ্গমনের জন্য অগ্রসর হইতেন। কন্যাকে তিনি দর্শ নারী রূপে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এ বিষয়ে Miss ace Ellison লিখিয়াছেন, "স্ত্রী জাতির যাহা কিছু , সুন্দর ও পবিত্র, তাঁহার কন্যা 'স্বর্গের নারী' সে লের আদর্শ ছিলেন।"[২]

পুরুষ যেমন কোন আত্মীয় বা আত্মীয়ার পরিত্যক্ত ত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে, নারীর জন্যও সেই-ব্যবস্থা আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নারী ইচ্ছামত জর সম্পত্তির উপর কর্তৃত্ব বা তাহার ব্যবহার করিতে রবেন, তাহাতে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী বা পুত্র কাহারও ন বাধা দিতে পারিবে না। প্রাগ্-ইস্‌লামী যুগে আরবে চালাইবার দক্ষতা-অনুসারে যে উত্তরাধিকারিত্ব তি হইত, এক্ষণে আর তাহা টিকিল না। ৪:৭; ৫৫৪)[১]

এইবার বিবাহ ও দাম্পত্য-জীবনের কিছু আলোচনা রিব। সামর্থ্য ও যোগ্যতার অভাব না হইলে, নারী ক, পুরুষ হোক, প্রত্যেকেরই বিবাহ করা উচিত,—ই পবিত্র কুর্‌আনের আদেশ (২৪:৩২; ১৭:৩, ৪)[১]। এবং প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, ইস্‌লামে ন্যাসীর-বৈরাগ্য নাই। বিবাহের প্রারম্ভ হইতে বিবাহিত নের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই অধিকার ান। ইস্‌লামে বিবাহ-ব্যাপারে অনাবশ্যক আড়ম্বর ন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই স্বেচ্ছায় াহে নিজ নিজ মত দিতে পারিবে এবং তাহাদের মত তীত বিবাহ হইতে পারিবে না। এই মত-গ্রহণের কোনরূপ উৎপীড়ন করা চলিবে না। স্বামী বা স্ত্রীর উভয়েই ইচ্ছামত পুরুষ বা নারীকে পছন্দ করিয়া তে পারিবে। শুধু তাই নহে, প্রেরিত মহাপুরুষ য়াছেন, বর কন্যাকে বা কন্যা বরকে ব্যক্তিগত ভাবে ঙ্গা করিতে পারিবে যে, সে তাহাকে বিবাহ করিতে করে কি না; কারণ, (তিনি বলিয়াছেন,) তাহাতে তির ভবিষ্যৎ মনোমালিন্যের পথ রুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। তাহা কেবল স্পষ্ট ভাবেই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে; সেজন্য গোপনে অযথা প্রেমালাপ করিবার কোন রূপ সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না।

কিন্তু যদি তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তবে উভয় পক্ষের অভিভাবক দ্বারাই তাহারা বিবাহিত হইতে পারিবে। কিন্তু যদি সে বিবাহে বরের বা কন্যার অথবা উভয়েরই অমত থাকে, তবে বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পর অবিলম্বে তাহার প্রতিবাদ করিলে সে বিবাহ অগ্রাহ্য হইতে পারিবে। এজন্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পরই তাহাদের বিবাহ হওয়া উচিত।

দুশ্চরিত্রতা বা ব্যভিচারের জন্য কেবল নারীকেই সমাজচ্যুত করা হইবে না, এজন্য লম্পট পুরুষও সমাজচ্যুত হইতে বাধ্য। এরূপ কোন পুরুষ বা নারী কোন নির্ম্মল-চরিত্র নারী বা পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিবে না, ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারীকেই বিবাহ করিতে পারে। (২৪:৩; ১৭:৩১)[১]। ইহা ছাড়া কেহই কোন সচ্চরিত্রা নারীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতে পারে না। যে কেহ তাহা করিবে সে অল্লাহ্‌র অভিশপ্ত (২৪:২৩-২৬; ১৭৪৬)[১]। এই ব্যবস্থা যদি কার্য্যে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে সমাজের বিশ্রী কলঙ্ক-কালিমা মুছিয়া যাইতে পারে।

বিবাহের জন্য একমাত্র সর্ত্ত আছে,—স্ত্রীধন বা যৌতুকের ব্যবস্থা। ইহা স্ত্রীর প্রাপ্য। নগদে বা ঋণ-স্বরূপে, যে প্রকারেই হোক ইহার ব্যবস্থা না হইলে বিবাহ হইতে পারে না। (৪:৪)[১]। সাধারণতঃ স্ত্রীকে স্বামীর সমান অবস্থায় তুলিয়া লইবার জন্য ইহার ব্যবস্থা আছে (৫:৩৭)[১]। এই সম্পত্তির উপর স্ত্রীরই একমাত্র অধিকার, স্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বামীও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

"নারীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে" (৪:১৯)[১], ইহাই পবিত্র কুর্‌আনের আদেশ। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন; অল্লাহ্ নারীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, যেহেতু তাঁহারা আমাদের মাতা, কন্যা ও মাসী (বা, পিসী)। যে সকল পুরুষ তাহাদের স্ত্রীগণকে প্রহার করে, তাহারা ভাল ব্যবহার করে না। যে নারীকে বিপথে যাইতে শিক্ষা দেয়, সে আমার পথের পথিক নহে। ইহা সমগ্র নারী-জাতির সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে পবিত্র

Harem, Purdah or Seclusion by M. H. Kidwai.

কুর্‌আনের বাণী ও প্রেরিত মহাপুরুষের প্রবচন হইতে আমরা কি কি আদেশ ও উপদেশ লাভ করিতে পারি, তাহা দেখা যাক। দাম্পত্য-জীবনে পশুর ও মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মানব শুধু প্রকৃতির বিধান অনুসারে নূতন জীবের সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, সে আত্মার খাদ্যরূপে আরও কিছু আশা করে। মহাজ্ঞানী বিশ্বস্রষ্টাও তাহার এই সঙ্গত বাসনা পূর্ণ করিয়া তাহার মধ্যে জ্ঞান ও প্রেমের মহিমা দ্বারা স্বকীয় নিদর্শন স্থাপন করিয়াছেন। "তাঁহার একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদিগ হইতেই তোমাদের জন্য সঙ্গিনীগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে তোমরা তাহাদের মধ্যে হৃদয়ের শান্তি লাভ করিতে পার, এবং তিনি তোমাদের উভয়ের মধ্যে প্রীতি ও সহানুভূতির সৃষ্টি করিয়াছেন; নিশ্চিতই যে জাতি চিন্তা করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য ইহার মধ্যে নিদর্শন আছে" (৩০:২১)[১]। ইস্‌লামে দাম্পত্য-বন্ধন শান্তি, প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধন। যে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে এই বন্ধনের অভাব, তাহার মধ্যে প্রাণ নাই এবং দম্পতি রূপে তাহাদের কোনই মূল্য ও মর্য্যাদা নাই। এরূপ দম্পতি আত্মা-বিহীন দেহের ন্যায়। তাহা দ্বারা সমাজ-শরীরের পুষ্টি হয় না, ক্ষয়ই হইয়া থাকে।

স্বামীর কার্য্যক্ষেত্র সাধারণতঃ গৃহের বাহিরে,—স্ত্রীর তাহার ভিতরে। সুতরাং একে অপরের অপেক্ষা রাখিতে বাধ্য। স্বামী যেমন স্ত্রীর নিকট শান্তি ও প্রেমের আশা করে, স্বামীর নিকট স্ত্রীরও সেরূপ আশা থাকে। পবিত্র কুর্‌আনে উক্ত হইয়াছে, "তাহারা [স্ত্রীরা] তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাহাদের পরিচ্ছদ" (২:১৮৭)[১]। পরিচ্ছদ আবরণের কাজ করে, লজ্জা নিবারণ করে ও শীতাদির কষ্ট দূর করিয়া থাকে। সেইরূপ পরস্পরের দোষ ও লজ্জা নিবারণ করা এবং প্রীতি ও সহানুভূতি দ্বারা হৃদয়ের শান্তি বিধান করা স্বামি-স্ত্রীর কর্ত্তব্য। উভয়েরই অধিকার সমান, তাই নারীর সেই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রেরিত মহাপুরুষ উপদেশ দিয়াছেন, নারীদিগের অধিকার পবিত্র; দেশিও যেন নারীগণের নির্দ্ধারিত অধিকারে তাহাদিগকে রক্ষা করা হয়।

তার পর গার্হস্থ্য জীবনের কথা। স্বামি-গৃহে নারী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী,—ইহাই এ বিষয়ে প্রেরিত মহাপুরুষের মত। গৃহের যাহা কিছু ব্যাপার, সে সকলেরই তত্ত্বাবধান করিবেন গৃহিণী। ইহা অবশ্যই শুধু রান্নাশাল বা টেঁকিশালের কাজ নহে, অনেক ক্ষেত্রে এক-একটি পরিবারের যাবতীয় ব্যাপার বেশ একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অনুরূপ। সকল দিক বজায় রাখিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করা কম ক্ষমতার কাজ নহে, এবং তাহাতে সম্মানের মাত্রাও সামান্য নহে। গৃহের কর্ত্রীর উপরই অন্তঃপুরের সকল কাজের ভার থাকে, গৃহ-স্বামী সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু সকল গৃহিণীর যোগ্যতা সমান নহে; এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অনেকেরই ভুল-ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তখন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত না হইয়া কোমল ভাবে সদুপদেশ দেওয়াই স্বামীর কর্ত্তব্য। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন:—(১) তোমার স্ত্রীকে সদুপদেশ দিবে। যদি তাহার মধ্যে সদ্‌গুণ থাকে, সে অবিলম্বে তাহা গ্রহণ করিবে এবং অনাবশ্যক কথা বলা ছাড়িয়া দিবে, এবং তোমার মূর্খা পত্নীকে ক্রীতদাসের ন্যায় প্রহার করিও না। (২) সেই সকলের চেয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মুস্‌লিম্, যাহার প্রকৃতি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আর তোমাদের মধ্যে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের স্ত্রীর প্রতি শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করে। (৩) অল্লাহ্‌ ও তাঁহার সৃষ্টির সমক্ষে তাহারাই শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহাদের পরিজনদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এ সকল ছাড়া স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পরের কর্ত্তব্যের বিষয়ে আরও অনেক উপদেশ আছে। সে বিষয়ে প্রেরিত মহাপুরুষের কয়েকটি প্রবচন উদ্ধৃত হইল:—(১) মুস্‌লিম্ তাহার স্ত্রীকে ঘৃণা করিতে পারিবে না; যদি সে তাহার একটি অসদ্‌গুণে অসন্তুষ্ট হয়, তবে সে যেন তাহার একটি সদ্‌গুণ দেখিয়া সন্তোষ লাভ করে। (২) সেই আদর্শ স্ত্রী যে যখন তুমি তাহার দিকে তাকাও, তোমাকে সন্তুষ্ট করে; যখন তুমি তাহার প্রতি আদেশ কর, তাহা পালন করে এবং তোমার প্রবাসের সময় নিজের সম্মান ও তোমার সম্পত্তি রক্ষা করে। (৩) স্বামীর প্রতি স্ত্রীর অধিকারের বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যখন তুমি নিজে আহার করিবে, তখন তাহাকেও আহার করাইবে; যখন তুমি নিজে পরিধানের জন্য বস্ত্র ব্যবহার করিবে, তাহাকেও পরিধানের জন্য বস্ত্র দিবে; তাহার মুখে চপেটাঘাত করিতে, এমন কি তাহাকে কটু কথা বলিতেও বিরত

থাকিবে; আর বাড়ীর মধ্যে ছাড়া তোমার স্ত্রী হইতে পৃথক্ থাকিবে না। (৪) তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি ব্যবহারের বিষয়ে অল্লাহ্‌কে ভয় করিবে, কারণ তাহারা তোমাদের সহায়ক; অল্লাহ্‌র অভয় দিয়া তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছ, আর অল্লাহ্‌র বাণী দ্বারাই তাহাদিগকে বৈধ করিয়াছ। (৫) তোমাদের স্ত্রীদের সহিত সদ্বিষয়ে পরামর্শ করিবে, কারণ তাহারা তোমাদের সাহায্যকারী। নারীর মূল্য নির্দ্দেশ করিতে গিয়া তিনি আরও বলিয়াছেন:—(১) পৃথিবী ও তাহার মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তুই মূল্যবান্, কিন্তু পৃথিবীর সকল বস্তুর মধ্যে পুণ্যবতী নারীর মূল্যই সকলের চেয়ে বেশী। (২) গুণবতী স্ত্রী মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

মুস্‌লিমের অন্দর-মহল হরেম বলিয়া পরিচিত। ইহার অর্থ, যাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। এ সম্বন্ধে Von Hammerএর মত একটু উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "হরেম পবিত্র স্থান; অভ্যাগতগণের ইহাতে প্রবেশাধিকার নাই। এবং তাহা যে নারীর প্রতি অবিশ্বাসের কারণে তাহা নহে, বরং তাহার রীতিনীতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য। উচ্চ এশিয়া ও ইয়োরোপে (মুস্‌লিম্ দেশসমূহে) নারীকে যেরূপ সম্মান দেওয়া হয় তাহাই এ কথার স্পষ্টতম প্রমাণ।"[২]

স্ত্রীকে প্রহার করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ইস্‌লামের নামে অভিযোগ করা হয়। ইহা যে আদৌ সত্য নহে—উপরি-উদ্ধৃত প্রেরিত মহাপুরুষের কয়েকটি প্রবচন হইতে তাহা সহজেই সপ্রমাণ হইবে। তবে, যদি কোন স্ত্রী অন্যায় ভাবে স্বামীর অবাধ্য হইয়া কোন অসঙ্গত কার্য্যে লিপ্ত হয় বা তাহার প্রশ্রয় দেয়, তবে তাহা হইতে বিরত হইবার জন্য প্রথমে তাহাকে সদুপদেশ দিতে হইবে। কিন্তু তাহাতে ফল না হইলে তার শয্যা ত্যাগ করা এবং তাহাও বিফল হইলে তাহার শাস্তির ব্যবস্থা করাই বিধান। এই শাস্তির অর্থ—লাঠি, ছড়ি, বা কিল, চড়, ঘুশির দ্বারা প্রহার করা নহে। দাঁতন-কাঠি বা তাহার অনুরূপ 'দণ্ডের' দ্বারা সামান্য আঘাত করিবার অনুমতি আছে। তথাপি কার্য্যতঃ ইহাও দমন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। ফলতঃ, ইহার উদ্দেশ্য প্রহার করা নহে, স্ত্রীর হৃদয়ে আত্মাবমাননা বা আত্মনির্বেদ জাগানই ইহার আসল উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ব্যবস্থা সমাজের সেই স্তরের লোকের জন্য করা হইয়াছে, যে স্তরের লোক (বিচারশক্তি-বিহীন মস্তিষ্কের উত্তেজনার ফলে) কথায় কথায় স্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হয়। (৫৭২)[১]

পবিত্র কুর্‌আনে সন্তানের মাতার আকারে স্ত্রীকে এইরূপে তুলিত করা হইয়াছে—"তোমাদের পত্নীগণ তোমাদের কৃষিক্ষেত্র" (২:২২৩)[১]। নারী যে কেবল পুরুষের সম্ভোগের পাত্রী নহেন, এবং পত্নীরূপে নারী যে সংসারক্ষেত্রে নিতান্ত গুরুতর দায়িত্ব লইয়া অবতীর্ণ হন, এই কথায় তাহাই সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। উদ্ভিদু যেমন ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হয় না, নিজের পুষ্টির জন্যও ক্ষেত্রেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকে, সেইরূপ শুধু সন্তান প্রসব করিলেই জননীর কর্ত্তব্য শেষ না, সন্তানের লালন-পালন ও চরিত্র-গঠনের ভারও তাঁহারই উপর ন্যস্ত থাকে (২৮৮)[১]। জননীর উপর এই মহৎ দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের বোঝা অর্পণ করিয়া পবিত্র কুর্‌আন্ নারীজাতিকে বিপুল সম্মান ও গৌরবে বিভূষিত করিয়াছেন। অধঃপতিত বাঙ্গালীর জননী এই গৌরবময় কর্ত্তব্য-পালনের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া বীরপ্রসূ আখ্যা কত দিনে লাভ করিবেন?

এই প্রসঙ্গে বহু-বিবাহ অর্থাৎ এককালে পুরুষের একাধিক পত্নী গ্রহণের বিষয়ে কিছু বলা দরকার। পুরুষের পক্ষে এককালে একাধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি আছে, (অনেকের বিশ্বাসমত) আদেশ নহে। পুরুষ এককালে দুই, তিন বা চারিটী পর্য্যন্ত পত্নী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু বিনা সর্ত্তে নহে। (৪:৩)[১]। যুদ্ধবিগ্রহ বা ঐরূপ কোন বিশিষ্ট কারণে, বহু পুরুষের প্রাণনাশের ফলে, যদি সমাজের জনশক্তি নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বলিয়া আশঙ্কা থাকে, অথবা সমাজের নৈতিক অধোগতির কারণ ঘটে, তবে এইরূপ বিবাহ বিহিত হইবে। বিগত মহাযুদ্ধের পর ইয়োরোপের সামাজিক অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল; এবং সেইজন্য ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পুরুষদিগের একাধিক পত্নী গ্রহণের বিষয় লইয়া নানারূপ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। তিন বৎসর যুদ্ধ হইবার পর দেখা যায়, জার্ম্মানীর প্রায় সাঁইত্রিশ লক্ষ ও ফ্রান্সের প্রায় বাইশ লক্ষ সৈন্যের প্রাণনাশ হইয়াছিল। তাহার ফলে ফ্রান্সের

অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, সকল নারীর বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রত্যেক পুরুষের ছয়টি করিয়া পত্নী গ্রহণ করা আবশ্যক। তাহার উপর লক্ষ লক্ষ আহত সৈন্য বিবাহের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। Professor Oldenbergএর মতে জার্ম্মানীকেও এই কারণে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। জন্ম ও বিবাহের সংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পাইতেছিল। (*The Herald*—July 28, 1917)[৩]। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এই বিবাহের ব্যবস্থা না হওয়ায় পাশ্চাত্য দেশসমূহে গণিকালয়ের সংখ্যা ও জঘন্য রোগের প্রসার অতিমাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণে তুরস্ক দেশও রুশীয় গণিকাদিগের লীলাক্ষেত্র হইয়া পড়িয়াছিল। আবার কিছু দিন পূর্ব্বে যখন তুরস্কে বহু-বিবাহ বন্ধের আইন প্রণয়ন করা হয়, তখন তথাকার দরিদ্র জনসাধারণ তাহার প্রতিবাদ করে। এই প্রতিবাদের কারণ বলিয়া তাহারা যে বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলে এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা যায়।

যাঁহারা আমাদের জননী ভগিনী, তাঁহারা যে বিবাহের পূর্ব্বেই সন্তানের জননী হইবেন, এই ধারণা প্রেরিত মহাপুরুষ কোন অবস্থাতেই পোষণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার যুগে আরবে বিবাহের নির্দ্দিষ্ট বিধান ও পত্নীর কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। কিন্তু তিনিই বিদ্রোহী হইয়া সেই সকল জঘন্য প্রথা রহিত করিয়া এই সংযত ও উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করেন; একমাত্র পত্নী গ্রহণেরই তিনি বিধান দিয়াছিলেন,—তবে নিতান্ত প্রয়োজনের জন্যই শুধু বহু-বিবাহের অনুমতি মাত্র দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে, যাহারা এককালে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান ব্যবহার করিতে, এবং প্রত্যেকের জন্য পৃথক্ পৃথক্ আবাসের ব্যবস্থা করিতে, আদেশ দিয়াছেন। ইহা কেবল সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত,—পুরুষের স্বৈরাচারের প্রশ্রয়ের জন্য নহে। (৫৩৫ ; ৪ঃ ১২৯)[১]। কিন্তু প্রতীচ্যে এক-বিবাহের নামে এই স্বৈরাচার গুপ্তভাবের ভান করিয়া বেশ চলিয়া আসিতেছে। তাই সে সকল দেশে 'অবিবাহিতা জননী'র সংখ্যা আদৌ বিরল নহে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Schopenhauer বলেন, "There is no arguing about polygamy; it must be taken *de facto* existing everywhere, and the only question is as to how it shall be regulated." ৩ এক্ষেত্রে ইস্‌লামের মতই কি গ্রহণ-যোগ্য নহে?

বিবাহ-বিচ্ছেদের বিষয়েও যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। কারণ তাহাতেও নারী ও পুরুষের অধিকার কিরূপ তাহা জানা যাইবে। বিবাহ-বন্ধনের ন্যায় বিবাহ-বিচ্ছেদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য সৃষ্টির সহায়তা করা ও আত্মার তৃপ্তির জন্য হৃদয়ে শান্তি লাভ করা। যে মিলনে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাকে মিলনই বলা চলে না,—সে মিলনের কোনই মূল্য নাই। নৈতিক হিসাবে তাহাকে মিলন না বলিলেও, সামাজিক প্রথাকে একেবারে অমান্য করা যায় না। তাই যে ভাবে সমাজের বিধান অনুসারে মিলনের বন্ধন হইয়াছিল, মিলনের বিচ্ছেদের জন্যও সেই ভাবে তাহার মতে কাজ করা দরকার।

স্বামী বা স্ত্রীর ক্লৈব্য কিংবা মারাত্মক জঘন্য ব্যাধি থাকিলে (ইহা সুপ্রজননের ঘোর অন্তরায়), অথবা দম্পতির মধ্যে প্রকৃত মিলন সংঘটন অসম্ভব হইলে, প্রধানতঃ বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় সমাজের কল্যাণ এবং দম্পতির নৈতিক স্বাস্থ্য বিচার করিয়া দেখিলে ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যবস্থা কিছুই পাওয়া যায় না। এইরূপ গুরুতর কারণ না ঘটিলে, আজ-কালকার প্রতীচ্য খৃষ্টান সমাজের ন্যায় ইচ্ছামত কথায় কথায় বিবাহ বিচ্ছেদ করিবার কোন প্রকার বিধান নাই, এবং তাহা নিতান্ত গর্হিত ও জঘন্য রুচির পরিচায়ক। (২৯৭)[১]। এ বিষয়ে প্রেরিত মহাপুরুষের প্রবচন এইরূপ :—(১) যাহা বৈধ অথচ অল্লাহ্‌র অপ্রিয় তাহাই বিবাহ বিচ্ছেদ। (২) অল্লাহ্ পৃথিবীতে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে ক্রীতদাসকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা প্রিয়তর তাঁহার নিকট আর কিছুই নাই, এবং বিবাহ বিচ্ছেদ অপেক্ষা অপ্রিয়ও আর কিছুই নাই। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, নিতান্ত দায়ে না

৩ Polygamy by M. H. Kidwai,

গড়িলে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা দেওয়া যাইতে পারে না।

এই বিচ্ছেদ সহজে ঘটিতে পারে না। প্রথমে দুইবার অস্থায়ী বিচ্ছেদ হইবে এবং প্রত্যেক বারে দম্পতির পুনর্ম্মিলনের চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু তাহাতেও যদি মিলন প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বিচ্ছেদের আকাঙ্ক্ষা আকস্মিক ক্রোধাদি উত্তেজনার ফল নহে। সুতরাং তৃতীয় বারে বাধ্য হইয়া স্থায়ী বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২৯৮, ২৯৯)[১]।

উপযুক্ত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের দাবী করিতে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই সমান অধিকার আছে। "নারীদের বিরুদ্ধে তোমাদের যে সমস্ত দাবী আছে, তোমাদের বিরুদ্ধেও তাহাদের ঠিক তেমনিই দাবী আছে" (২ঃ ২২০)[১]। স্বামীর ইচ্ছায় যদি বিচ্ছেদ হয়, তবে সে স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছে, তাহা ফিরাইয়া লইতে, বা তাহার দেয় স্ত্রীধন না দিয়া স্ত্রীকে বিদায় করিতে পারে না। এবং স্ত্রীর পক্ষ হইতে বিচ্ছেদ ঘটিলে স্বামীর প্রদত্ত বা স্বামী হইতে প্রাপ্য যাহা কিছু সমস্তই সে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। বিদায়ের সময় পরিত্যক্তা স্ত্রীর প্রতি কোন রূপ অসদ্ব্যবহার করা চলিবে না, সদয় ভাবে বিদায় দিতে হইবে (২ঃ২২৯)[১]। (বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান ও ব্যবস্থা—২ঃ২২২-২৪২ ও সে সকল শ্লোকের টীকা)[১]।

ভারতীয় মুস্‌লিম্ সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা প্রতি লক্ষ লোকের মধ্যে একটি করিয়া। আফগানিস্তান ও তুরস্কের অবস্থাও এইরূপ। তবে আরব ও মিশরে কিছু বেশী।[৪]

স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হইলে পুরুষ যেমন পুনর্বিবাহে অধিকারী, স্বামীর মৃত্যুতে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে নারীরও সেইরূপ অন্য পতি গ্রহণ করিবার অধিকার আছে (২ঃ২৩৪ ; ৩১০)[১]। কিন্তু স্বামীর মৃত্যু বা বিচ্ছেদের পর পুনর্বিবাহের নিমিত্ত নারীকে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য (সাধারণতঃ প্রথম কারণে চারি মাস দশ দিন ও দ্বিতীয় কারণে তিন মাস) অপেক্ষা করিতে হইবে (২ঃ২৩৪ ; ৩০৯ ; ২ঃ২২৮)[১]। স্ত্রী মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্দ্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে না এবং স্ত্রীধনের প্রাপ্যও তাহাকে দেওয়া হইবে (৪ঃ১২)[১]। স্বামীর মৃত্যু হইলে অথবা স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলে প্রাপ্য স্ত্রীধন ছাড়া সেরূপ কারণ থাকিলে (২ঃ২৪০ ; ৩১৭)[১] নির্দ্দিষ্ট কালের ভরণপোষণের জন্য নারী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত ব্যয় পাইতে পারিবে (২ঃ২৪০, ২৪১ ; ৩১৭, ৩১৮)[১]। বিবাহাদি যে কোন মাঙ্গলিক ব্যাপারে বা উৎসবে ও ব্যসনে বিধবার স্পর্শ, উপস্থিতি প্রভৃতি আদৌ দোষাবহ নহে;—ইস্‌লামে এরূপ কুসংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। বস্তুতঃ বিধবা রূপে নারী কুমারী বা সধবা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহেন,—ইহাই উদার ইস্‌লামের মত। এই সকল বিধান রীতিমত মানিয়া চলিলে, বাঙ্গালী সমাজের বিধবাগণের দুঃখময় জীবনের নিত্য অভিনয় দেখিবার যন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হয় না।

নারীর জন্য কঠোর অবরোধ বা পর্দার অন্যায় ব্যবস্থা করিয়াছে বলিয়া ইস্‌লামের নামে কলঙ্ক আরোপ করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলে, আশা করি, সকলেই ইস্‌লামকে সেই অন্যায় কলঙ্কের হাত হইতে মুক্ত রাখিতে সচেষ্ট হইবেন। এ বিষয়ে সংক্ষেপে স্থূল বিবরণ দিতে চেষ্টা করিব।

ইস্‌লাম্ পর্দা সম্বন্ধে যেরূপ মত দিয়াছে, ভারতবর্ষীয় মুস্‌লিম্ সমাজে, বিশেষতঃ বাংলার তথা কথিত "শরীফ্" (সম্ভ্রান্ত) শ্রেণীর মধ্যে, পর্দার প্রচলন তাহা অপেক্ষা বহু পরিমাণে কঠোর। শয়্‌খ্ মুনীর্ হুসয়ন্ কিদ্‌বাঈ সাহেবের সহিত কথাবার্ত্তার মধ্যে তুরস্কের ধর্ম্মনেতা (শয়্‌খুল্ ইস্‌লাম্) মুসা কাযিম্ আফেন্দী ভারতীয় মুস্‌লিম্ সমাজের নারী অবরোধের অতিরিক্ত কঠোরতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। মুস্‌লিম্ সমাজের পর্দার কঠোরতা ভারতের ন্যায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই।[১] যাহা হউক, পর্দার আবশ্যকতা আছে এবং তাহা নারীরই জন্য, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

যে কোন কর্ত্তব্য ও প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য নারী একাকিনী গৃহের বাহিরে যাইতে পারিবেন। নারীর হাটবাজারে যাইবার অধিকারও ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, তোমাদের নারীদিগকে

৪ Divorce by M. H. Kidwai.

মস্‌জিদে আসিতে বাধা দিও না। কিন্তু পরপুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে দৃষ্টি নত করিতে হইবে। (পুরুষও পরদার দেখিয়া দৃষ্টি নত করিতে বাধ্য)। পরপুরুষের সহিত অতিরিক্ত অবাধ সংমিশ্রণ নারীর পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। (১৭৫০, ১৭৫১)[১]।

বাহিরে যাইতে হইলে নারীকে তাঁহার অলঙ্কার সকল আবরণের মধ্যে রাখিতে হইবে এবং তিনি জোরে পা ঠুকিয়া চলিতে পারিবেন না। হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল ব্যতীত শরীরের অন্য সকল অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং সেজন্য তাঁহাকে ওভারকোট, বোর্‌কো (চলিত কথায়, বোর্‌কা), বা সেইরূপ কোন পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতে হইবে। বুক, মাথা, চুল ও কাণ যাহাতে ভাল রূপে ঢাকা থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। (২ঃ ৩১ ; ১৭৫১ক ; ৩৩ঃ৫৯ ; ২০১১)[১]।

বাহিরে যাইতে হইলে নারীর জন্য chaperonএর সাহায্য না হইলেও ক্ষতি নাই। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, যদি কোন নারী এক দিনের অধিক পথে যাত্রা করে, তবে তাহার কোন পুরুষ নিকট আত্মীয়ের (যাহার সহিত সকল অবস্থাতেই বিবাহ নিষিদ্ধ) সঙ্গে যাওয়া উচিত। এ ব্যবস্থা এইজন্য করা হইয়াছে যে, পথিমধ্যে রাত্রি যাপন করিতে হইলে একাকিনী অবস্থায় নারীর কষ্ট ও বিপদের সম্ভাবনা। প্রাচীনাগণের এসকল বিধান মানিবার প্রয়োজন নাই।

সমাজ-জীবনে নারী সাধারণের কাজ করিবার অধিকার পাইয়াছেন, এবং সেজন্য তাঁহার বাহিরে যাইবার আবশ্যকতা আছে। প্রয়োজন হইলে নারী আদালত প্রভৃতিতে দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহার সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য হইবে না। সমাজে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় চুক্তিনামা ইত্যাদি লিখিত হয়, তাহাতেও নারীর সাক্ষী হইবার অধিকার আছে (২ঃ২৮২, ৩৭৪)[১]। প্রয়োজনানুরূপ আবরণের মধ্যে থাকিয়া এই সকল কাজ করিলে বা সভাসমিতি ইত্যাদির যে কোন ন্যায়সঙ্গত কাজে যোগ দিলে কোনও আপত্তি হইতে পারিবে না।

ইহাই ইস্‌লামের পর্দার বিধান। ইহা অতি সুযুক্তি-পূর্ণ ও সুরুচিসম্পন্ন কি না, নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ তাহার বিচার করিবেন।

শিক্ষা সম্বন্ধেও নারীর অধিকার কোনও রূপে খর্ব্ব করা হয় নাই, শিক্ষায় নারী ও পুরুষের সমান অধিকার। প্রেরিত মহাপুরুষ বলিয়াছেন, নারী-পুরুষ-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক মুস্‌লিমের শিক্ষা লাভ করা কর্ত্তব্য।

শিক্ষা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। গার্হস্থ্য জীবনে গৃহের কর্ত্রী রূপে ও সন্তানের ধাত্রী রূপে নারীর উপর যে সকল দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্যের ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা পালন করিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, সুশিক্ষা লাভে নারীর অধিকার কতখানি। আজকালকার অধঃপ্রাপ্ত মুস্‌লিম্ সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া মুস্‌লিমের উন্নতির যুগে বিশ্ব-মুস্‌লিমের সামাজিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, মুস্‌লিম্ মহিলাগণ কেবল গৃহকর্ম্মে স্বামীর সহায়তা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, জগতের সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান, দর্শনের গৌরব ও সম্পদ্-বৃদ্ধিরও তাঁহারা সহায়তা করিতেন। এমন কি রণক্ষেত্র, রাজনীতিক্ষেত্র এবং বিচারক্ষেত্রের কার্য্যেও তাঁহাদের পারদর্শিতা অল্প ছিল না। ইস্‌লাম্ গ্রহণ যিনি সর্ব্বপ্রথমে গ্রহণ করেন, তিনি একজন নারী,—প্রেরিত মহাপুরুষের পত্নী খদীজা। প্রেরিত মহাপুরুষের সমস্ত প্রবচনের প্রায় সিকি অংশের জন্য বিদুষী আয়েশা-ললনা আয়েশা সমগ্র মুস্‌লিম্-জগতের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্রী। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু পূর্ব্বোক্ত বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "যখন তোমাদের আধুনিক রমণীগণের ন্যায় খৃষ্টান রমণীগণ পর্দায় অবরুদ্ধ থাকিতেন, যখন অজ্ঞানতার পর্দাসমূহ তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া রাখিত, যখন শুধু সন্তান-প্রসব ও আহার যোগান এবং পুরুষের দাসী হওয়াই তাঁহাদের কাজ ছিল, মূরীয় স্পেনের সাহিত্য তখন একটির পর একটি করিয়া এমন সকল নারীর নাম প্রকাশ করিত, যাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক, কবি, গণিতজ্ঞ, জ্যোতিষী, এমন কি, ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের উদার মত সকলের উৎকৃষ্ট প্রচারকও ছিলেন।" এ সকল এখন কেবল গৌরবময় অতীতের দুঃখময় স্মৃতির আকারেই আমাদের হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। বাঙ্গালার মুস্‌লিম্ নারীর (শুধু নারীর নহে, পুরুষেরও) অবস্থা আজ অজ্ঞানতার ঘোর তিমিরে আবৃত। পশ্চিম-ভারতের নারীর অবস্থা তার চেয়ে ঢের ভাল।



সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা বনের ধারে শীতল ছায় ; থাক্‌ত কিছু, পেয়ালা হাতে ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি মোর পাশেতে গুঞ্জে তব মঞ্জু স্বর—; সেই তো সখি স্বপ্ন আমার সেই বনানী স্বর্গপুর!

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওমর খৈয়াম—কান্তিচন্দ্র ঘোষ

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

এক্ষণে নারী-প্রসঙ্গে যাহা বলা হইল, তাহার সারমর্ম্ম এইরূপ :—ইস্‌লামে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন, পুনর্বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে নারীর জন্য পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হইয়াছে। উত্তরাধিকারিত্বেও নারীর প্রাপ্য অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। শিক্ষালাভের বিষয়েও সেইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। মাতৃ-রূপে নারী পিতা অপেক্ষা অধিক সম্মান ও গৌরবের পাত্রী। গৃহই নারীর প্রধান কার্য্যক্ষেত্র হইলেও, বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক রাখা এবং প্রয়োজন হইলে যে কোন কর্ত্তব্য কার্য্যে লিপ্ত হওয়া ও পরপুরুষের সহিত কথাবার্ত্তা কহা নারীর পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। নারীর পর্দা সম্বন্ধে অযথা কঠোরতা নাই। নারীর ন্যায্য অধিকারে কেহই হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। পুরুষের ন্যায় নারী ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া ইচ্ছামত সকল কার্য্য করিবার স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। ইস্‌লামে নারী পুরুষের দাসী নহেন, উপযুক্ত সঙ্গিনী ও সহায় বা বন্ধু। এক কথায়, সুরুচি, সুবিচার ও সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ইসলামের শাস্ত্র নারীর জন্য সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন এবং কোন অবস্থায়ই নারীর মর্য্যাদা, গৌরব ও সম্মান এবং স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনতা কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থা

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ, বি-এল্

হিন্দুসমাজে এমন সব লোক আছেন, যাঁরা মনে করেন যে, হিন্দু ধর্ম্ম সত্যসত্যই সনাতন। এটা তাঁদের কাছে একটা মামুলী কথামাত্র নয়; ইহা তাঁহারা প্রাণের সহিত বিশ্বাস করেন, এবং এই বিশ্বাস তাঁহাদের জীবনের মূলে নিহিত। তাঁরা সত্যসত্যই ভাবেন যে, যাহা সনাতন, তাহা নিশ্চয়ই সব চেয়ে সত্য; সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা এবং শেষ কথা হিন্দু ধর্ম্মে বলা হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, নিজের ধর্ম্মের প্রতি এরূপ আস্থা এবং শ্রদ্ধা যে কেবল বিশ্বাসী হিন্দুরই আছে, এমন নয়; প্রত্যেক বিশ্বাসী ব্যক্তিই নিজের ধর্ম্মের প্রতি এমনি আস্থাবান্। অবশ্যই ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সত্য যদি এক বই দুই না হয়, তাহা হইলে, এই প্রকার গাঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসীর প্রাণের আকুলতা যতটা প্রকাশ পায়, সত্যের জ্ঞান ততটা প্রকটিত হয় না। ধর্ম্মে ধর্ম্মে যেখানে পার্থক্য রহিয়াছে, সেখানে দুটীকেই সমান সত্য বলাও কঠিন, কোনও একটীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পৃথক্ করিয়া লওয়াও কম কঠিন নয়। এ সব ক্ষেত্রে একমাত্র মীমাংসা এই যে, "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—একই সত্যকেই নানা পণ্ডিত ব্যক্তি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ইহার সোজা অর্থ এই যে, সকল ধর্ম্মই প্রকৃত পক্ষে সমান সত্য; তবে, যে যেমন বুঝে, সে তেম্নি ভাবেই একমাত্র সত্য-স্বরূপকে প্রকাশ করিয়া থাকে।

কিন্তু এই মীমাংসায় একটু মুস্কিল এই যে, ইহাতে সকল ধর্ম্মকেই সনাতন বলা হয়। ধীর এবং শান্ত ভাবে বিচার করিবার সময়, এ কথাটা যে কেহ অস্বীকার করিবে, এমন মনে হয় না; কিন্তু ঝগড়ার বেলায় সকলেই যে যার নিজের ধর্ম্মকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বাকী-গুলিকে একেবারে জাহান্নমে যাইবার পথ ভিন্ন আর কিছুই মনে করিতে চাহিবে না। নিজের ধর্ম্মকে যখন সনাতন বলিয়া কেহ বড় গলায় ঘোষণা করিয়া থাকেন, তখন প্রকৃত পক্ষে তাঁহার মনে অন্য ধর্ম্মের প্রতি যে একটু অবহেলার ভাব থাকে না, এমন নয়। অথচ প্রকৃত পক্ষে এটা কিন্তু ভুল।

পরের ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করায় কোনও পুণ্য না থাকিলেও, নিজের ধর্ম্মে একান্ত আস্থাবান্ হওয়ায়ও কোন পাপ নাই। সুতরাং কোনও হিন্দু যদি বাস্তবিকই নিজের ধর্ম্মকে সনাতন মনে করে, তাহাতে তাহার কোন অপরাধ হয় না।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে। যাহা কালে কালে ক্ষয় পায় তাহাকে সনাতন বলে না। খড়ের ঘর-খানা দু'বছরে বিনষ্ট হয়; পাকা বাড়ী একশ' বছরও টিঁকিতে পারে। আবার ভুবনেশ্বরের মন্দিরের হয় ত আরও হাজার বছরেও কিছু হইবে না। কিন্তু এক দিন না এক দিন এ সকলই ধূলিতে বিলীন হইবে। সুতরাং ইহাদিগের

আয়ুর পরিমাণ এক না হইলেও, ইহারা সকলেই বিনশ্বর,—সনাতন কেহই নহে। হিন্দু ধর্ম্মকে যাঁরা সনাতন মনে করেন, তাঁরা কিন্তু একটা বিচারে ভুল করিয়া থাকেন। তাঁরা এক দিকে বলেন যে, উহা সনাতন ধর্ম্ম; আবার একই নিশ্বাসে বলিয়া থাকেন যে, কলিতে উহার একপাদমাত্র রহিয়াছে,—বাকি ত্রিপাদই অন্তর্হিত হইয়াছে! যাহা সনাতন, তাহা কি শুধু সত্য যুগেই থাকিবে, পরে ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে? তাহা হইলে, জগতে অসনাতন কোন্‌ জিনিসটা? কলির প্রভাবে যে সকল পাষণ্ডদের ধর্ম্মমত ক্রমশঃ সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, সেই সব ধর্ম্মমতকেও কি সনাতন বলা যায় না?

বিশ্বাস ও আত্মীক্ষিকী সব সময় হাত ধরাধরি করিয়া চলে না; বিশ্বাসীদের এরূপ যুক্তির ভুল মাঝে মাঝে হইয়াই থাকে। কিন্তু একটা অনুধাবনের বিষয় এই যে, এ ক্ষেত্রে এই ভুলের অর্দ্ধাঙ্গ একটা বিরাট সত্য! ধর্ম্মটাকে সনাতন মনে করা না করা লোকের ইচ্ছা; কিন্তু ধর্ম্মটার তথা ধর্ম্মীদের ক্ষয় যে বেশ দ্রুতই হইতেছে, তাহা সকলকেই মানিতে হইবে।

ধর্ম্মের ক্ষয় হয় দুই প্রকারে; ধর্ম্মীরা যখন ধর্ম্মান্তরের অনুসরণ করে, অন্তবিধ আচার-বিচার গ্রহণ করে, প্রচুর ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ করিতে থাকে, তখনই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় বলিয়া, পুরাতন ধর্ম্মের গ্লানি হয়। আবার ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াও, পূর্ব্বপুরুষদের ধর্ম্মকে একেবারে সনাতন বলিয়া কঠিন আলিঙ্গনে ধরিয়া থাকিয়াও, সংখ্যায় ইহারা ক্রমশঃ শূন্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে; ইহাতেও ধর্ম্মের লোপ হয়। কখনও বা এই উভয় প্রণালীই এক সঙ্গে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ভারতে যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম লোপ পাইয়াছে, তাহাও বোধ হয়, এই দুই উপায়েই হইয়াছে; অনেক স্থলে বৌদ্ধেরা হয় ত হিন্দু ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিয়াছে—অনেক স্থলে আবার হয় ত অত্যাচারে ইহারা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।

হিন্দু ধর্ম্মকে যাঁরা সনাতন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহারা শুধু এইটাই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া থাকেন যে, ম্লেচ্ছ ভাব, পাষণ্ড মত, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি অসনাতন;—এখন যদিও ইহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং পূর্ব্বেও হয় ত ছিল, তথাপি এ সকল তেমন সত্য নয়; রাহুর গ্রাসের মত কখনও কখনও সনাতন ধর্ম্মের নির্ম্মল জ্যোতিঃ যদিও ম্লান করিয়া দিতে পারে, তথাপি দীর্ঘকাল উহাকে গ্রাস করিয়া থাকিতে পারিবে না। রোগের বিকারের মত এই সাময়িক উৎপাত এক দিন না এক দিন দূরীভূত হইবেই।

এমন আশা যুগে যুগে ধর্ম্ম-বিধায়ীরা করিয়া আসিয়াছে। ইহুদীরা করিয়াছে; যারা কল্কি-অবতারের আগমনের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে, তারাও করে। কিন্তু এমন কি লক্ষণ দেখা যাইতেছে, যাহাতে এই প্রতীক্ষাকে বাতুলতা হইতে পৃথক্‌ করা যাইতে পারে?

পক্ষান্তরে, ইহা কি সত্য নয় যে, হিন্দু সংখ্যায় কমিতেছে? আর, ইহাও কি সত্য নয় যে, যারা এখনও হিন্দু আছে, তাদের মধ্যেও অনেকেই তথা-কথিত সনাতন ধর্ম্মের অনেক অংশই ছাঁটিয়া ফেলিতেছে?

সংখ্যায় ঠিক থাকিয়া কোনও সমাজ যদি দুই একটা আচার কিংবা বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই ফেলে, তাহা হইলে, সনাতন-বাদীরা যতই আতঙ্কিত হউক না কেন, ক্ষতিটা খুব বেশী হয় না। রাহুগ্রস্ত শশীর মত সে সমাজ তখন ম্লান হইয়া পড়ে, কিংবা রাহু-মুক্ত চন্দ্রের মত আরও নির্ম্মল জ্যোতিঃ বিকীরণ করে,—সে সম্বন্ধে সকলের ঐকমত্য না হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং ম্লেচ্ছভাবাপন্ন বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজের প্রতি সকরুণ কটাক্ষপাত করিয়া মনু-পরাশরের দোহাই দিয়া সনাতনবাদীরা যতই শুম্ভিত হউন না কেন, প্রকৃত পক্ষে ইহার চেয়ে গুরুতর ক্ষতি যে হিন্দু-সমাজের হইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহারা অন্ধ। তাঁহারা ভয় পাইতেছেন,—বুঝি বা পিতৃ পিতামহদের আচার-অনুষ্ঠান সবই ক্রমশঃ লোপ পাইয়া যাইবে; এবং সেই আচারগুলি রক্ষা করিবার জন্য তাঁরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই বজ্র আঁটুনীর চেষ্টায় গেরো যে অনেক সময় ফস্কিয়া যাইতে পারে, সেদিকে তাঁদের লক্ষ্য নাই। প্রাচীন আচারগুলিকে সমাজে বদ্ধমূল করিতে গিয়া তাঁরা যে বহু লোককে সমাজের বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন, সেদিকে দৃষ্টি নাই। সমাজদেহ ক্রমশঃ যে ভাবে সঙ্কুচিত হইতেছে, তাহাতে মনে হয়, এই সঙ্কোচন যদি অপ্রতিহত ধারায় যায়, তাহা হইলে অদূর-ভবিষ্যতে ইহার বিলোপও হইতে পারে।

হাজার সত্য হউক, সব চেয়ে সনাতন হউক, তথাপি কোন আচারকে যদি কেহ অনুসরণ না করে, তাহা হইলে, শুধুই তাহার সনাতনত্বের দোহাই দিলেই ত চলিবে না। আচার-বিশেষ পরিত্যাগ করিয়া লোক যদি ক্রমশঃই হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাহিরে গিয়া পড়ে, তবে, এই বিরাট সনাতন সত্যের কি যে অবশিষ্ট থাকিবে, তা ত জানি না।

কিন্তু বর্ত্তমানে হিন্দু-সমাজের ইহাই ত একমাত্র ক্ষতি নয়। আস্তে আস্তে নানা কারণে, ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া কিম্বা সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনেকে ত হিন্দু-সমাজ হইতে সরিয়া পড়িতেছেই; তা ছাড়া, যারা হিন্দু থাকিতেছে, তারাও যে সংখ্যায় দিন-দিন হ্রাস পাইতেছে! হিন্দুজাতি যে মরিতে বসিয়াছে, এই রব আজ অনেক দিন উঠিয়াছে। অথচ, এই সোজা সত্যটাও আমরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই; কেননা, হিন্দুধর্ম্ম যে সনাতন! বৃদ্ধি পাওয়াই মানব-সমাজের স্বাভাবিক রীতি। বৃদ্ধি না হইয়া জন্ম-মৃত্যু যদি সমান সমান থাকে, তাহা হইলেই চিন্তার বিষয় হয়। কিন্তু যেখানে জন্মের চেয়ে মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া চলে, সে সমাজ কত দিন সনাতনত্বের বড়াই করিবার জন্য জগতের বুকে দাঁড়াইয়া থাকিবে? অথচ, হিন্দু সমাজের যে এই অবস্থাই ঘটিতেছে!

কিন্তু এইখানেই আমাদের দুঃখের কাহিনী শেষ হইল না। আমরা কেহ দুঃখ করিতেছি সংখ্যায় কমিতেছি বলিয়া, আবার কেহ দুঃখ করিতেছি, সনাতন আচার হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি বলিয়া। কিন্তু

আমরা যে উন্মূলিত বৃক্ষের ন্যায় ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছি এবং পাদ-বিহীন ব্যক্তির ন্যায় পরের কাঁধে আশ্রয় লইতেছি, সে খবর আমাদের জানা আছে কি?

বর্ত্তমানে কেহ যদি সূর্য্যলোক কিংবা চন্দ্রলোক হইতে বাংলাদেশের হিন্দু-সমাজের উপর দৃষ্টিপাত করিত, তবে সে দেখিতে পাইত যে, ভূমি হইতে হিন্দু-সমাজের শিকড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ভূমি যারা চাষ করে, ভূমি হইতে যারা শস্য উৎপাদন করে, তাদের অধিকাংশই অসনাতন, অহিন্দু,—ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসক। হিন্দুরা যে কোন দিন এ দেশের মাটী চাষ করিত না, এমন নয়; কিন্তু ভদ্রলোক হইবার আকাঙ্ক্ষা হিন্দুদের এত প্রবল যে, আয় অনেক কম হইলেও, অনেকেই ক্রমশঃ লাঙ্গল ছাড়িয়া কলম ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মাছ ধরা দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু জেলেদেরই অনন্যসাধারণ উপজীবিকা ছিল। মাছ বিক্রয়ও তারাই করিত। মাছ বিক্রয়ের কাজটাতে ক্রমশঃ মুসলমানেরা প্রবেশ করিলেও, মাছধরার কাজটা এতকাল এক রকম জেলেদেরই হস্তগত ছিল। কিন্তু ভদ্র হইবার লালসা সেদিকেও পরিত্যাগ করে নাই; সুতরাং ইহারাও ক্রমশঃ এই বৃত্তি পরিত্যাগ করিতেছে।

নৌকা বাহকের কাজটা কত দ্রুত হিন্দুদের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে, তাহা সকলে লক্ষ্য করিয়াছেন কি না, জানি না; কিন্তু জলপথে পূর্ব্ববঙ্গের খালে, বিলে, যাদের চলা-ফেরা করিতে হয়, তাদের দৃষ্টি সেদিকে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইয়া থাকিবে।

এইরূপে আরও অনেক বৃত্তি এবং ব্যবসায়ই যে হিন্দুদের হাতছাড়া হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সকলগুলির নাম করিয়া তালিকা লম্বা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এটা কে না জানে যে, যেসব হিন্দু এই সকল তথা-কথিত নীচ কর্ম্ম করিত, তারা, ভদ্রলোক হইবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া, অনেক সময় প্রয়োজন হইলে স্থান পরিত্যাগ করিয়া—এমন কি, উপাধি বদল করিয়াও—কর্ম্মান্তরে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে? যে নৌকা বাহিত, সে বর্ম্মন্ উপাধি গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রোচিত অসির বদলে কায়স্থোচিত মসী-বৃত্তি আরম্ভ করিতেছে। যে ভূমি চাষ করিত এবং 'দে' উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিল, সে এখন 'সরকার' কিংবা 'রায়' প্রভৃতি কাল্পনিক উচ্চ শ্রেণীর উপাধি ধারণ করিয়া চাকরীর উমেদার হইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। যে মাঘের শীতকেও অগ্রাহ্য করিয়া গলাজলে নামিয়া মাছ ধরিত, তাহার সন্ততিরা আজ উচ্চবংশোদ্ভব বলিয়া হাকিম হইবার জন্য জোর দাবী করিতেছে। যাদের উপাধি তাদের বৃত্তির পরিচায়ক, তারা সে-সব উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'রায়', 'বিশ্বাস', 'মল্লিক', 'মজুমদার' প্রভৃতি সর্ব্বব্যাপক উপাধিতে ভূষিত হইয়া ভদ্র-শ্রেণীতে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

ব্যক্তি বা শ্রেণী-বিশেষের উন্নতির পরিপন্থী কোন বিবেচক ব্যক্তিই হন না। কিন্তু এই তথা-কথিত উন্নতির মোহে হিন্দু-সমাজ যে জল হইতে নক্রাশিত এবং ভূমি হইতে বিচ্যুত হইতেছে, এই কথাটাই আমরা বলিতে চাহিতেছি। কেন যে হিন্দু-সমাজকে এই মোহ আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার বিচার স্বতন্ত্র; কিন্তু এটা যে একটা মোহ সে বিষয়ে কি সন্দেহ আছে? দৃষ্টান্তস্থলে দেখান যাইতে পারে যে, মুসলমান-সমাজে এরূপ কোন মোহ নাই। তাদের ভিতর কোনও একটা কাজ করিয়া কেহ 'পতিত' হয় না; এবং সেই জন্যেই যে যে কাজের উপযুক্ত এবং যার যে কাজ করিবার সুবিধা আছে, সে সেই কাজেই ঢুকিয়া পড়ে। তাহার জন্য সময়ান্তরে ভদ্রলোক হইতেও তাঁহার কোন অসুবিধা হয় না।

হিন্দুর হুৎমার্গ তাহার সমাজের এই অবস্থার জন্য দায়ী কি না, বিবেচনার বিষয়। কিন্তু কারণ যাহাই হউক না কেন, সনাতন ধর্ম্মবাদীদের মনে রাখা উচিত যে, এদেশের ভূমির সহিত হিন্দুর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ কিছু নাই। সুতরাং আজ যদি প্রজা-জমিদারে বিলাতের মত কোন বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেটা প্রকারান্তরে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষে পরিণত হইবে।

কেহ হয় ত জিজ্ঞাসা করিবেন, ইহাতে এমন আতঙ্কিত হইবার কি আছে? তাঁহাদের জানা উচিত যে, যে সমাজে 'ছোটলোক' নাই, সবই ভদ্রলোক, যে সমাজের লোক ভূমি চষে না, শারীরিক পরিশ্রমের কাজ কিছুই করিতে চায় না,—সে সমাজের সনাতনত্বে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। হিন্দুরা যদি সবই মনীজীবী ভদ্রলোক হইয়া যায়, আর লাঠি মারিবার সময় যদি অহিন্দুর সাহায্যই সর্ব্বদা লইতে হয়, তাহা হইলে হিন্দু-অহিন্দুর কলহ কোনও দিন উপস্থিত হইলে, হিন্দুর অবস্থা কি হইবে, তাহাও কি বলিয়া বুঝাইতে হইবে?

চাষীরা যদি খাজনা না দেয়, তবে, শুধু জমীদার মরিবে না, মরিবে হিন্দু; কুলি যদি মোট বইতে না চায়, অসুবিধা হইবে শুধু ভদ্রলোকের নয়, হিন্দুর। প্রজায় জমীদারে, কিংবা ভদ্রলোক ইতর লোকে কলহ যে কোন সমাজে ঘটিতে পারে; কিন্তু তাহাতে কোনও একটা শ্রেণীর যতই অসুবিধা হউক না কেন, ধর্ম্মবিশেষের তাহাতে হানি হয় না; বিলাতে যে শ্রমজীবীদের লড়াই চলিতেছে, সেটা খ্রীষ্টান অখ্রীষ্টানের লড়াই নয়; এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান আর এক শ্রেণীর খ্রীষ্টানের বিরুদ্ধেই লড়িতেছে; কাহারও জয়-পরাজয়েই খৃষ্ট ধর্ম্মের বিশেষ কোন হানি হইবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজের অবস্থা স্বতন্ত্র। আজ যদি বাংলা দেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উঠিয়া যায়, তাহা হইলে লোপ পাইবে এক শ্রেণীর হিন্দু; দেশের ভূমি যদি চাষীরই ষোল আনা সম্পত্তি হইয়া যায়, তাহা হইলে বিত্ত লোপ পাইবে হিন্দুর; এবং বর্ত্তমান অবস্থায়ও আত্মরক্ষায় অক্ষমতা যদি কোনও সমাজের আসিয়া থাকে, তবে, সে সমাজটা হিন্দুর।

সুতরাং বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজের অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, ইহাতে ছোটলোক কেহ থাকিতেছে না; ধর্ম্মান্তর কিংবা কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহারা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। ইহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলে, হিন্দুসমাজের যে ক্ষয় হইতেছে, তাহা সুস্পষ্ট; কিন্তু

কর্ম্মান্তর গ্রহণের ফলও প্রত্যক্ষ ভাবে না হইলেও পরোক্ষ ভাবে হানিজনক ; কেন না, ইহাতে সমাজ ক্রমশঃ ভিত্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। ভূমির সহিত হিন্দুর সম্বন্ধ ক্রমশঃ দূর হইতে দূরতর হইয়া পড়িতেছে ; এবং সমাজ রক্ষা করিবার জন্য আরও যে সব বৃত্তি এবং উপজীবিকার প্রয়োজন, যে সবও ক্রমশঃ হিন্দুর হাত হইতে সরিয়া যাইতেছে। যাঁরা ধর্ম্মটাকে সনাতন মনে করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকাইতেছেন, তাঁরা মনু পরাশরের বিধানগুলিকে যতই সনাতন মনে করুন না কেন, হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে, তাহার শক্তি কমিতেছে, বিত্ত কমিতেছে, জীবন-সংগ্রামের ক্ষমতা কমিতেছে এবং কালের করাল গ্রাস তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। বর্ত্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত শাসনযন্ত্রের একটা চক্র আশ্রয় করিয়া সে বাঁচিয়া আছে ; কিন্তু মানুষের সমাজে ভূমিকম্পের মত বিরাট আন্দোলন যে মাঝে মাঝে দেখা যায়, তারই একটা যদি কোন দিন এ দেশে আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মেরও একান্ত তিরোভাব, একেবারে কল্পনার বাহিরে নয়।

পতিতা-সমস্যা

শ্রীশৈলেশনাথ বিশী, বি-এল্

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব ও ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন মহাশয় পতিতা-সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে আলোচনা আরম্ভ করেন। তাহার পর "ভারতবর্ষে" মহলানবিশ মহাশয় ধারাবাহিক ভাবে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। নরেন্দ্রবাবু বলেন, বর্ত্তমানে পতিতার সংখ্যা যে ভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে শীঘ্র যদি তাহাদের এই ক্রম-বর্দ্ধনশীল অবস্থা বন্ধ করা না হয়—তবে সমাজের অশেষ অকল্যাণ হইবে ; কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে এই কার্য্য সম্ভব হইতে পারে, তিনি তাহার কোন পথ নির্দ্দেশ করেন নাই।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেন নরেন্দ্রবাবু অপেক্ষা আর একটু অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি সমাজ-সেবার (Social Service) দিক দিয়া, এই শ্রেণীর মধ্যে সেবার ভাব জাগ্রত করিয়া, ইহাদের আকাঙ্ক্ষা সাধু-পথে চালিত করিলে সুফল হইতে পারে বলিয়াছেন। ইহাতে বেশী সুফল আশা করা যায় না। কারণ, এই সমস্যার মূল কোথায়, তাহা সর্ব্বপ্রথমে জানা আবশ্যক। ইহার মূল কারণ বন্ধ করিতে পারিলে, —ইহাদের সংখ্যা আপনা-আপনি কমিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয়। পতিতা-সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, তাহার প্রসার বন্ধ করিবার জন্য কার্য্যকরী (Practical) উপায় অবলম্বন করিলে, একেবারে না হউক, অনেকটা পরিমাণে, আমরা সমাজের এই ব্যাধির হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব বলিয়া আশা করা যায়।

আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কোন কার্য্যকরী পথ অবলম্বিত হয় নাই। য়ুরোপে বহু দিন হইতে এ বিষয়ে গবেষণা, আলোচনা প্রভৃতি চলিতেছে।

এ কার্য্যে হাত দিবার পূর্ব্বে য়ুরোপের আলোচনার ফলাফল আমাদের জানা আবশ্যক।

আমি সেই জন্য এই প্রবন্ধে য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বর্ত্তমানের অবস্থা মিলাইয়া, কি উপায়ে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে, সে সম্বন্ধে দুই-একটী কথা বলিব।

পতিতা কত দিন হইতে সমাজে আছে, এ কথা সহজে কেহ বলিতে পারে না। তবে জার্ম্মানীর সুপ্রসিদ্ধ ধন-বিজ্ঞানবিদ্ এঙ্গেল্‌স বলেন যে, পৃথিবীতে ধনবাদের প্রচলনের সহিত পতিতা-সমস্যার অঙ্গাঙ্গি ভাবে যোগ আছে। কারণ, পুরুষ নিজের সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারীর জন্য নিজের পরিবার, বা জাতিগত স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য, স্ত্রী জাতির উপর কঠোর আইন-কানুন লিপিবদ্ধ করিয়াছে। অথচ তাহার বহুদার-প্রবৃত্তি নিজের ভার্য্যার একনিষ্ঠ প্রেমে সংযত করিতে পারে নাই। ঘরের পবিত্রতা বজায় রাখিবার জন্য পুরুষ নারীর উপর কঠোর বিধি জারী করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নিজের লালসা-তৃপ্তির জন্য সে বাহিরে নারীর অমর্য্যাদা করিয়াছে ও তাহাকে দূষিত বলিয়া সমাজের বাহিরে চিরদিন স্থান দিয়া আসিয়াছে।

সমাজে পতিতার উৎপত্তির ইহাই অন্যতম সমীচীন কারণ বলিয়া মনে হয়। তাহা ছাড়া, জগতের প্রাচীন ধর্ম্মোপাসনার সহিত গণিকার সংস্রব ছিল। একমাত্র ইহুদী জাতির মধ্যে গণিকার প্রচলন ছিল না। তাহা বাদে মিশর, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, চালদিয়া এবং পারস্যের মন্দিরের সংস্রবে গণিকার স্থান ছিল। ভারতবর্ষের মন্দিরেও দেবদাসী থাকিত। বাইবেলের Old Testamentএ প্যালেষ্টাইন দেশে পতিতার বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বর্ব্বর জাতি-গণের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষে অবাধ যৌন মিলনও জগতে 'পতিতা-নারী' সৃজনে সহায়তা করিয়াছে। কখনও কখনও তাহাকে ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে অঙ্গাঙ্গী ভাবে রাখা হইয়াছে, কখনও বা দেবসেবার দাসীরূপে সে মন্দিরে স্থান পাইয়াছে। সোলনের সময় গ্রীস দেশেই সর্ব্ব-প্রথমে পতিতাদের সংযত করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ হয়। সোলনের বিধি জন-সাধারণের নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই প্রণয়ন করা হয়। ইহাতে পতিতাদিগকে রাষ্ট্রীয় বিধির অধীন করিয়া কতকগুলি সরকারী পতিতা-গৃহ স্থাপন করা হয় এবং তাহাদিগকে নগরের অংশ বিশেষেই আবদ্ধ রাখা হয়।

বর্ত্তমান য়ুরোপে পতিতাদের নাম রেজেষ্টরী করিবার যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তাহা সর্ব্ব প্রথমে রোমের গণতন্ত্রের সময়েই হয়। রোমকগণ পতিতাদের উপর খুব কড়া নজর রাখিতেন। প্রত্যেক পতিতাকে তাহার নাম রেজেষ্টরীর জন্য এডিলের (Ædiles) নিকট দরখাস্ত করিতে হইত এবং তথা হইতে তাহাদের পাশ লইতে হইত।

ইহার পর খৃষ্টীয় যুগ—ঈশার ধর্ম্মের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ য়ুরোপীয় সমাজে বহুল প্রচার লাভ করে এবং সমাজ-পরিত্যক্তা এই নারীদের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর আইন-কানুন তুলিয়া

দেওয়া হয়। ফ্লোরেন্টাস নামক জনৈক নাগরিক পতিতাদের উপর নির্দ্ধারিত জিজিয়া-কর নিজেই বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায়, রোম-সম্রাট থিউডিসিস পতিতা-কর উঠাইয়া দেন।

ইহার পর য়ুরোপের Chivalry বা বীর-যুগ। এই সময় ক্রুসেডের প্রেরণায় নর-নারী বীর ও ধর্ম্মভাব দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে, ও নারী জাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হয়। নাগরিক ও ধর্ম্ম-যাজকদের সম্মিলিত চেষ্টায় য়ুরোপের সর্ব্বত্র পতিতাদের উদ্ধারের জন্য সাড়া পড়িয়া যায়—সমাজ-পরিত্যক্তা নারীদের জন্য উদ্ধারাশ্রম স্থাপিত হয়।

ইহার পর য়ুরোপের মধ্যযুগ। মধ্যযুগে য়ুরোপে জমীদার সম্প্রদায়ের প্রভাব সর্ব্বোচ্চ শিখরে উঠে, এবং ধনবাদের প্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী অন্যান্য কুফলের সহিত পতিতার সংখ্যাও পুনরায় অবাধে বিস্তার লাভ করে।

তাহার পর য়ুরোপের গৌরবময় (Renaissance) নব-অভ্যুদয়ের যুগ। ঠিক এই সময়ে য়ুরোপে অতি ভয়াবহ মড়কের আকারে কুৎসিত ব্যাধি—উপদংশ রোগ দেখা দেয়। ১৫ শত খৃষ্টাব্দে ভিনিসের উপদংশের মড়ক হইতেই জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের নজর এ বিষয়ে খুব কড়া ভাবে পড়ে। এবং এই সময় পতিতাদের উচ্ছেদ-কল্পে য়ুরোপে নানা আইন-কানুন বিধিবদ্ধ হয়। ১৫৬০ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সের প্যারী নগরীতে এক আইন পাশ হয়। তাহাতে পতিতাদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নগর ছাড়িয়া যাইবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। ১৬৩৫ খৃঃ অব্দে প্যারী নগরীর আর এক আইনে এই ব্যবস্থা হয় যে, যাহারা নারীদের কুলত্যাগে সাহায্য করিবে, তাহাদের আজীবন জাহাজের লস্করের কাজ করিতে হইবে, ও ভ্রষ্টা নারীদের মাথা কামাইয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে।

ইংলণ্ডে এই সময় পিউরিটান গোঁড়ামীর প্রভাব। ইংলণ্ডও এই সময় পতিতা নারীদের উপর কম নির্য্যাতন করে নাই। খৃষ্টীয় ১৬।১৭ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপ ও ইংলণ্ডে সমভাবে পতিতা-নির্য্যাতন চলিতে থাকে।

য়ুরোপে ১৭ শতাব্দীর শেষভাগে উপদংশ রোগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। ১৮ শতাব্দীতে পুরাতন রোমীয় প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন হয়। অর্থাৎ পতিতাদের উপর পুলিশের কড়া নজর পড়ে ও তাহাদের প্রত্যেককে নাম রেজেষ্টরী করিতে ও পাশ লইতে বাধ্য করা হয়।

১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত য়ুরোপ যে ভাবে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছে, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, পতিতার সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত সমাজে কুৎসিত ব্যাধির অসম্ভব প্রসারের জন্য জন-সমাজের দৃষ্টি এই দিকে পতিত হয় ; ও তাঁহারা উঠিয়া-পড়িয়া, যাহাতে এই কুৎসিত ব্যাধি সমাজে প্রসার লাভ না করে, তাহার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করেন।

য়ুরোপের অভ্যুদয় যুগে শিক্ষার বহুল প্রচার হওয়াতে, জনসাধারণ ও দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তি সমবেত হইয়া ইহার নিবারণ-কল্পে উঠিয়া-পড়িয়া লাগে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ভারতবর্ষেও মন্দিরের সংস্রবেই সমাজে দেব-দাসীর আবির্ভাব হয়। কিন্তু নানা কারণে উহা অনেক দিন পর্য্যন্ত মন্দিরের চতুঃসীমানাতেই আবদ্ধ থাকে। পররাজ্য জয়, ধনবাদ ও ধনিক-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হওয়ার সহিত, ক্রমে ক্রমে পতিতা ভারতবর্ষের সমাজে তাহার স্থান করিতে থাকে। কিন্তু কোন দিনই আমাদের দেশে পতিতা সমাজে এত ব্যাপক ভাবে দেখা দেয় নাই। মন্দিরের সংস্রবে যাহার জন্ম, তাহা অনেক দিন ধনীর বিলাস-উপকরণের সামিল ই ছিল।

পতিতা—চতুঃষষ্টী কলাবিদ্যায় সুশিক্ষিতা ছিল। তাহার জীবিকা-অর্জ্জনের জন্য কখনও সে দেহ বিক্রয় করিত না এবং সমাজে তাহার সম্মানের স্থান ছিল।

বৌদ্ধযুগে অম্বপালীর মত পতিতা নারী বুদ্ধদেবকে তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং পাটলীপুত্রের পতিতারা বাৎস্যায়নের কামসূত্রের এক টীকা পর্য্যন্ত রচনা করিয়া-ছিল। বৌদ্ধযুগে অনেক পতিতা ভিক্ষুণী হইয়া অর্হতের সম্মান পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছে। তার পর যখন ভারতের গৌরব-রবিকে পরাধীনতার কালরাহু গ্রাস করিল—তখনও—মুসলমান রাজত্বের নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া পতিতা নারী—তয়ফা, মুজরাওয়ালী হইয়া ভারতের সঙ্গীত-ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। সে অবস্থাতেও তাহারা বিবাহ করিয়া সুমধুর দাম্পত্য-জীবন যাপন করিয়াছে। পতিতা নারী ক্বচিৎ কোথাও বা একাধিক পুরুষের সংস্রবে আসিয়াছে ; কিন্তু কখনও এক সময়ে একাধিক পুরুষের অঙ্ক-শায়িনী হইয়াছে, বলিয়া আমরা জানি না। এবং হইলেও তাহাদের সংখ্যা খুব অল্প ছিল।

মুসলমান আমলের অবসানের সময় য়ুরোপ হইতে ওলন্দাজ দিনেমার, ফরাসী ও ইংরেজ প্রভৃতি বণিকরা আগমন করে। তাহাদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বর্ত্তমানের পতিতা শ্রেণী জন্মগ্রহণ করে ও দিন দিন বাড়িতে থাকে। The English brought prostitution to India. "That was not specially the fault of the English,"—said a Brahmin to Jules Bois—"it is the crime of your civilisation. We have never had prostitutes. I mean by that horrible word the brutalised servants of the gross desire of the passerby. We had and we have castes of singers and dancers who are married to trees—yes trees—by touching ceremonies which date from Vedic times ; our priests bless them and receive much money from them. Kings have made them rich. They represent all the arts ; they are the visible beauty of the Universe."

(Jules Bois—Visions de l' Inde, p. 55) quoted from Havelock Ellis—Part VI Page 235.

ইহার দৃষ্টান্ত—নিদানের রোগ-নির্ণয়ের মধ্যে ফেরঙ্গ রোগের উল্লেখ ;

তাহার পূর্ব্বে আমাদের দেশে এ ব্যাধি ছিল না। বর্ত্তমান সময়ের পতিতা অর্থে—যাহারা দেহকে পণ্যে পরিণত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে ও অর্থের বিনিময়ে একই সময়ে একাধিক পুরুষের নিকট আত্মদান করে। গত দেড় শত বৎসরের মধ্যে এই শ্রেণীর পতিতা এত বাড়িয়া চলিয়াছে যে, আজ তাহা প্রকৃতই ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। এবং এই গণিকাবৃত্তির প্রসারের সহিত সমাজে কুৎসিত ব্যাধিও কম প্রচার লাভ করে নাই। (Prostitution and Venereal diseases go hand in hand. Stop Prostitution and you shall have no venereal diseases—Iwan Block) আজ এই ক্রমবর্দ্ধনশীল পাতিত্যের কারণ কি? তিনটী কারণে নারী পতিতা হয়।

১। দারিদ্র্য।

২। সামাজিক নির্য্যাতন।

৩। অতিরিক্ত রিরংসা-প্রবৃত্তি।

দারিদ্র্যের জন্য ভারতবর্ষে পূর্ব্বে কোন দিনই নারী আত্মবিক্রয় করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহা করিতেছে। ইহার কারণ কি?

ইংরেজ আমলের পূর্ব্বে লোকে গ্রামে থাকিত—নিজের দেশ ছাড়িয়া বাহির হইত না। সুতরাং তুলনামূলক জ্ঞান লাভের তাহার কোন সুযোগ ছিল না। ইংরেজী শিক্ষা প্রচারের সহিত গ্রাম ভাঙ্গিয়া শহর গড়িয়া উঠিয়াছে, একান্নবর্ত্তী পরিবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের শত দোষের মধ্যেও সমাজে নারীগণ সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন ও নিজেদের হাজার অসন্তোষ চাপিয়াই রাখিতেন; পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজের অভাব অভিযোগ ভাবিবার সময় পাইতেন না। কিন্তু আজ কাল তাহা হইতেছে না। আজ গ্রাম ভাঙ্গিয়া শহর গড়িয়া উঠায়, নারী তুলনামূলক জ্ঞান লাভের অধিকারিণী হইয়াছেন—নিজের দৈন্য আজ সহস্রফণা নাগের মত তাঁহার চিত্তকে অহর্নিশ দংশন করিতেছে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের বাঁধন না থাকায় নারী আজ অনেকটা স্বাধীন হইয়াছে। বহু দিনের পরাধীন চিত্ত সদ্যোজাত স্বাধীনতাকে সংযত করিতে পারিতেছে না; কুলোকের প্রলোভনে পড়িয়া নারী কুলত্যাগ করিতেছে।

২। সামাজিক নির্য্যাতন—সামাজিক নির্য্যাতন নারীর প্রতি চিরদিনই সমভাবে আছে। পূর্ব্বে তাহা চাপা পড়িত, আজ তাহা হইতেছে না। সমাজে যাহা ইচ্ছা করিবার অধিকার পুরুষের আছে,—নারীর নাই। নারীর কখনও যদি পদস্খলন হয়, তবে আর সমাজে তাহার স্থান নাই,—বাধ্য হইয়াই নারী আজ পতিতা হইতেছে। পূর্ব্বে গ্রামে থাকার জন্য অনেক সময় ভ্রূণ হত্যা করিয়া বা পুরুষের রক্ষিতা হইয়া সে থাকিত,—আজ তার চিত্ত সমাজের নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায় (উচ্চ বর্ণের দেখাদেখি) সমাজে গোপন ব্যভিচার যে কি ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, তাহা ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। গ্রামে যেখানে ভ্রূণ হত্যা করিয়া ধরা পড়িবার ভয় ছিল, সেখানে শহরে আসিবার সুবিধা থাকায় জন্য নারী সহজেই এই পথে আসিতেছে। তাহা ছাড়া, পণ-প্রথার নিষ্ঠুর অত্যাচারে দুই তিনটি মেয়ের বিবাহ দিতে আজকাল বাঙ্গালী প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে। অনেক স্থলে নারী মনোমত পতি লাভে বঞ্চিত হয়। যেন তেন প্রকারেন দুই কন্যার পিতা কোন রকমে দায়-সারা ভাবে এই দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে বাধ্য হয়। যেখানে দায়-সারা কাজ, সেখানে উভয় পক্ষের প্রীতি থাকিতেছে না। তার পর নববধূর ছোটখাট ত্রুটী ধরিয়া, কন্যার পিতার তত্ত্বের পরিমাণে হতাশ হইয়া, অনেক শাশুড়ী মন্দে প্রভৃতি বধূর উপর নির্য্যাতন করিতেছে। সে নির্য্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া কুলোকের প্রলোভনে পড়িয়া নারী এই পথে আসিতেছে। এরূপ ঘটনাও নিত্য হইতেছে। বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

বাংলা দেশের প্রধানতঃ তিন চারিটি কেন্দ্র হইতে এই শ্রেণীর নারী কলিকাতায় আমদানী করা হয়।

যদি কলিকাতায় একটী কেন্দ্রীয় নারী-রক্ষা-সমিতি স্থাপন করিয়া ঐ সব স্থানে শাখা-সমিতি স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে এই প্রলোভনমুখী নারীদের রক্ষার একটা ব্যবস্থা হইতে পারে। পতিতা-জীবনে অভ্যস্ত হইতে অন্ততঃ নারীদের ৩।৪ মাস সময় লাগে। ঐ সময় তাহাদের মন অনুতাপ,—পুরুষের প্রতি অবিশ্বাস ও ভবিষ্যতের অন্ধকারময় জীবনের কথা ভাবিয়া হতাশে পরিপূর্ণ থাকে। এই সময় সহৃদয় ও নিঃস্বার্থ ব্যবহার করিয়া অনেককেই এই পথ হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইতে পারে।

এইখানে দুইটী ঘটনার উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বৎসর খানেক হইল যশোর হইতে একটী স্ত্রীলোক (বিধবা) আসিয়া ইডেন হস্পিটালে প্রসব করেন। এই হতভাগিনী নারীকে কেবল সন্তানের দুগ্ধের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না, সমাজ এক বাক্যে তাঁহার দূষিত সংস্রব বর্জ্জন করিল। অনেকের নিকট পায়ে ধরিয়া রাঁধুনী হইবার জন্য কত অনুনয় করিলেন। যাহার জাতি গিয়াছে—তাহার হাতের জল অচল—কেমন করিয়া তাহাকে রাখা যায়। দাসী-বৃত্তিও তাঁহার জুটিল না। সেই সময় আমেরিকা হইতে টেলার-দম্পতী—Mr. ও Mrs. Taylor আমাদের দেশের পতিতা-সমস্যার আলোচনার জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া আশ্রয় দিতে চাহিলেন। কিন্তু এই নারী জীবনের শেষ অবলম্বন তাঁহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে চাহিলেন না। অবশেষে গত্যন্তর না দেখিয়া তিনি এই পথে আসিলেন। অথচ যে নরপশুর মোহে পড়িয়া আজ তাঁহার এই দুর্দ্দশা, সেই পিশাচ স্বচ্ছন্দে সমাজে বিচরণ করিতেছে। তাহার জাতিও যায় নাই। কুলশীল ও জাত্যাভিমান বজায় রাখিয়া সকলে অবাধে তাহার হাতের জল পান করিতেছে। এই তো সমাজ।

দুর্ব্বলের প্রতি—অসহায়ের প্রতি অত্যাচারই ইহার চিরন্তন প্রথা।

আর একটি ঘটনাও আমাদের জানা আছে। কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর কন্যা বিপথগামিনী হয়। পিতা তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া লইয়া যান। মেয়েটি পুনরায় বিপথে চলিয়া আসে। পরে ঘৃণ্য জীবনে বীতস্পৃহ হইয়া মেয়েটি পুনরায় ঘরে ফিরিয়া যায়। নানা কারণে পিতা আর তাহাকে আশ্রয় দেন না। মেয়েটির কোন সন্তানাদি না থাকায় বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতার জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তারের অধীনে নার্স নিযুক্ত হইয়া সৎপথে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। পথভ্রষ্টা অনুতপ্তা নারীর বহু দৃষ্টান্ত খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে। সমাজে ফিরিবার, এমন কি—সৎভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার সব পথ বন্ধ। এই সব স্ত্রীলোক অকথ্য মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে। অথচ সমাজ কেবল ইহাদের বর্জ্জন করিয়া নিজের শুচিতা রক্ষা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে।

এখন কথা এই—পতিতাদের নাম রেজেষ্টরী ও লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কি না?

য়ুরোপের সর্ব্বত্র পতিতাদের বাধ্যতামূলক নাম রেজেষ্টরী ও লাইসেন্স গ্রহণের আইন আছে। নাম রেজেষ্টরী না করিয়া ও লাইসেন্স না লইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাকে দণ্ড ভোগ করিতে হয়। আমার মতে এই প্রথার প্রচলন আবশ্যক। নাম রেজেষ্টরী করা দরকার এবং বিনা লাইসেন্সে এ বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহার শাস্তিও হওয়া উচিত। তাহা হইলে তাহাদের সংখ্যার দিকে নজর থাকিবে ও কুৎসিত ব্যাধির প্রতিকারের উপায় করায়ত্ত হইয়া আসিবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পতিতাবৃত্তি ও কুৎসিত ব্যাধি এই পথের দুই যমজ সন্তান।

জার্ম্মানিতে কোন কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্তা স্ত্রীলোক এই ব্যবসা করিলে তাহাকে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

খ্যাতনামা চিকিৎসকগণের মত এই যে, একজন ব্যাধিগ্রস্তা স্ত্রীলোক তিন জন পুরুষে এই ব্যাধি সংক্রামিত করে। গত আদমশুমারীর রিপোর্টে কলিকাতায় পতিতা সংখ্যা পনের হাজার। অন্যূন পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক প্রতি বৎসর এই রোগে এক কলিকাতাতেই আক্রান্ত হইতেছে। এই সব কুৎসিত ব্যাধির চিকিৎসা হয় না। প্রথমে লোকে হাতুড়ে, টোটকা প্রভৃতি করে। পরে পেটেণ্ট ঔষধ খায়। ডাক্তার কবিরাজের কাছে ক্বচিৎ কদাচিত যাহারা যায়, তাহাদের সংখ্যাও নেহাৎ কম নহে। এক মেয়ো হাসপাতালে out doorএ গত বৎসর ১২০০ লোক এই সব কুৎসিত ব্যাধির জন্য চিকিৎসিত হইয়াছিল।

তাহা হইলেই বুঝুন, এই ব্যাধি কিরূপ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে ও সমাজের অঙ্গে দুষ্টব্রণ রূপে দেখা দিয়াছে।

যাহাতে পতিতাদের মধ্যে এই ব্যাধি প্রসার লাভ করিতে না পারে, য়ুরোপে সেজন্য নানা আইন-কানুন ও অসংখ্য উপায় অবলম্বিত হইতেছে।

নানা কারণে এদেশে সে সবের কোনটাই সম্ভবপর নহে। য়ুরোপের সর্ব্বত্রই পতিতাদের নিয়মিত ভাবে ডাক্তারের নিকট হাজিরা দিতে হয়। দূষিত রোগগ্রস্তা নারীকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়।

এই প্রথা এখানে অবলম্বন করিলে চারিদিকে হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে। নীতিবাগীশেরা বলিবেন যে, রোগ সারাইয়া যদি তাহাদের কুৎসিত বৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য করা হয়, তবে প্রকারান্তরে এই কুৎসিত কার্য্যে সহায়তা করা হইবে। বাহিরের যুক্তির দিক দিয়া, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া আর দশজনকে ব্যাধিগ্রস্ত করিতেছে, তাহা তো নিবারণ করিতে হইবে। একমাত্র সেই যদি তাহার কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিত, তবে কোন কথাই ছিল না। য়ুরোপে পুলিশের কড়া পাহারা এ বিষয়ে আছে। সেই জন্য অনেক সময় জুলুম হয় এবং নিরপরাধিনীর উপর অত্যাচারও হয়।

আমাদের দেশে যদি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপালিটি প্রভৃতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, তবে এই সব কুৎসিত রোগের প্রসার অনেকটা বন্ধ করা যাইতে পারে।

বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে একটী বা দুইটী লেডী ডাক্তার নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহারা ঐ সব স্থানে গিয়া এই সব কুৎসিত রোগের ভয়াবহ পরিণাম ইত্যাদি কথায় ও ম্যাজিক লণ্ঠন সাহায্যে বুঝাইয়া দিলে অনেকটা সুফলের আশা করা যায়। কারণ, একমাত্র শিক্ষা ব্যতীত লোককে কুপথ হইতে ফিরাইবার অন্য উপায় নাই।

এই সঙ্গে, যাহারা সৎপথে আসিতে চাহে, তাহাদের কার্য্যকরী স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের জন্য শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সম্প্রতি জনৈক ডাক্তার সদস্যের চেষ্টায় কলিকাতা কর্পোরেশন এই কার্য্যের জন্য দুইজন লেডী ডাক্তার নিযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন, ও একটী কুৎসিত ব্যাধির হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা চলিতেছে। বর্ত্তমানে আলিপুরে ঐ সব রোগের একটী পৃথক্ ওয়ার্ড আছে। তাহাতেই রোগী সংখ্যা ৮০।৯০ জন।

আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, পাপের প্রতিই আমাদের বিদ্বেষ—পাপীর প্রতি নহে।

সহরের এই মোটামুটি ব্যবস্থা ছাড়া—গ্রামের দিকেও নজর দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

আমরা বাহির হইতে অবশ্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বরে দিন দিন মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিতেছি। তাহা খুবই সত্য; কিন্তু এই সব কালাজ্বর, ম্যালেরিয়ার আবরণ ভেদ করিয়া যদি দেখি, তবে কি দেখিতে পাই? গ্রামের শতকরা ৯৯ জন কৃষক কোন না কোন কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত। গ্রাম্য মেলায় গিয়া সস্তায় তাহারা এই রোগ কিনিয়া আনে। দেশের যেখানে বড় বড় মেলা হয়, তাহার সঙ্গে পতিতাদের আমদানী করা হয়। সেই সব মেলায়—সোশ্যাল সার্ভিস বা

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে লোক পাঠাইয়া বক্তৃতা ও সামাজিক লঠনের সাহায্যে নিরক্ষর গ্রাম্য চাষাকে এই সব রোগের ভয়াবহ পরিণাম চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান উচিত।

দিন দিন বাঙালী নির্বীর্য্য হইতেছে। কিছু দিন এই ভাবে চলিলে বাঙালীর অস্তিত্ব আর থাকিবে না। বহু গ্রাম শ্মশান হইয়াছে। যাহা আছে তাহাও হইতে বসিয়াছে। এখনও সময় আছে।

আমি যতদূর পারিয়াছি—সংক্ষেপে এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছি। এদিকে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমার কথাগুলি দয়া করিয়া তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন —আমার কথা অতিরঞ্জিত কি না। এই সমস্যা আমাদের জাতির মরণ-বাঁচনের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয়ে আর আমাদের নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না।

হিন্দী ভাষা ও কবি-সমাদর

লেফ্‌টেনাণ্ট শ্রীসূর্য্যপ্রসন্ন বাজপেয়ী চৌধুরী

গেল বছরের পৌষের "ভারতী"তে প্রকাশিত "হিন্দী সাহিত্য ও ভাষা" শীর্ষক প্রবন্ধের এক জায়গায় লিখেছিলাম, "হিন্দী ভাষায় কাব্যগ্রন্থ ও কবিতা অজস্র আছে। অনেক বড় বড় কবি বহু প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। নানা ছন্দের এত কবিতা বোধ হয় অন্য ভাষাতে কমই আছে। পূর্ব্বে কবিগণের সম্মান ও আদর যে কত বেশী ছিল, এবং লোকে যে তাদের কি শ্রদ্ধার চোখে দেখ্‌ত, তা জান্‌লে এ দেশকে শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। রইস্ ও রাজাদের সভায় বরাবরই একজন করে প্রসিদ্ধ কবি থাকতেন। এক একটি নতুন ছন্দের জন্য একজন কবি ছত্রিশ লাখ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার পেয়েছেন।".....

হিন্দী ভাষার পুরানো ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে, কবিদের প্রতি জনসাধারণের অবিচলিত শ্রদ্ধা, অপরিসীম সমাদর ও অগাধ সহানুভূতি। দারিদ্র্য ও নানা প্রকারের সাংসারিক কষ্ট যাতে কবিকে না সইতে হয়, নিরুদ্বিগ্ন মনে যাতে তাঁরা কবিতা রচনা কর্‌তে পারেন, তার জন্য ধনী-গরীব সবাই মিলে নানা প্রকারের বন্দোবস্ত কর্‌ত। এ কবি-সমাদর যেমনি অসীম ছিল তেমনি আন্তরিক ছিল।

হিন্দী ভাষার অতীত যুগ অত্যন্ত উজ্জ্বল ও গৌরবের ছিল। এক এক জন মহাকবি তাঁদের অমর কাব্যগ্রন্থ রচনা করে লোকের নিকট চির আদরণীয় হয়ে রয়েছেন।

কবিদের মধ্যে কবিবর ভূষণ সকলের চেয়ে বেশী সম্মান ও সমাদর পেয়েছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেব বাদশার আমলের কবি। তাঁর অপূর্ব্ব কাব্যরচনা শক্তি দেখে তখনকার পণ্ডিতগণ তাঁকে কবিভূষণ উপাধি দিয়েছিলেন। তখন থেকেই তিনি এত বেশী লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন যে, তাঁকে সবাই ভূষণ কবি বলে ডাক্‌ত। আসল নাম তাঁর এখনও অনাবিষ্কৃত। এঁরা ছিলেন চার ভাই—চিন্তামণি, ভূষণ, মতিরাম ও নীলকণ্ঠ। চারজনই অসাধারণ কবি ছিলেন; কিন্তু তার মধ্যে ভূষণ ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আওরঙ্গজেব বাদশার দরবারে থেকে তাঁকে কবিতা রচনা করতে হোতো। সেখানে তাঁর ভাই চিন্তামণিও থাক্‌তেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব হিন্দু-বিদ্বেষী হওয়ার দরুণ তিনি তাঁর সভা ত্যাগ করে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের সভা-কবি নিযুক্ত হন্। শিবাজী তাঁর কবিতা শুনে তাঁকে লক্ষ লক্ষ টাকা ও বহু জায়গীর দিয়েছিলেন। শিবাজীর দরবার থেকে বাড়ী ফিরবার সময় একবার ভূষণ বুন্দেলার মহারাজা ছত্রশালের বাড়ী গিয়েছিলেন। মহামান-ভাজন ভূষণ কবির যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করে বিদায় দেওয়ার সময় মহারাজা কবির পাল্‌কীর দণ্ড নিজ স্কন্ধে ধারণ করেছিলেন। ভূষণ কবির রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে "ভূষণ হজারা" ও "ভূষণ উল্লাস" ইত্যাদি।

কবিবর হরিনাথ শাজাহান বাদশার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। হরিনাথের কবিতা শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে যেতেন এবং বহু ধন ও জায়গীর তাঁকে দান করে পুরস্কৃত করেছিলেন। শাজাহান বাদশা তাঁকে অনেকবার হাতী, ঘোড়া, পাল্কী ও রথ দান করেছিলেন। হরিনাথ যেমনি অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী কবি ছিলেন, তেমনি মহাপ্রাণ দাতা ছিলেন। একবার তিনি অম্বরের রাজা সেওয়ার মানসিংহকে কবিতা শুনিয়ে মহা খুশী করেছিলেন। পথে ফিরবার সময় এক গরীব ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়। সে একটী কবিতা মুখে মুখেই রচনা করে কবিকে শুনিয়ে বল্লে। রাজা মানসিংহ কবিকে এক লাখ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। কবি হাতীতে চড়ে যাচ্ছিলেন। গরীব ব্রাহ্মণের কবিতা শুনে তিনি তখনই হাতীর হাওদা থেকে নেমে, তাঁর সাথে যা ছিল, সব ঐ গরীব ব্রাহ্মণকে দান করে দিলেন, আর নিজে রিক্ত হস্তে বাড়ী ফিরে এলেন।

কবিবর গঙ্গ আকবর বাদশার সময়ের কবি এবং রাজ দরবারে গঙ্গ কবির প্রতিষ্ঠা ছিল। দেশের রাজা-রাজড়া ও ধনী ব্যক্তিগণের অনেকেই গঙ্গ কবিকে কাব্য রচনার জন্য নানাপ্রকারের পুরস্কার দিয়েছিলেন।

আকবর বাদশার "নবরত্নে"র অন্যতম রত্ন নবাব আবদুল রহীম খান্‌খানা সাহেবের সঙ্গে গঙ্গ কবির গভীর সৌহার্দ্দ ছিল। রহীম নিজে একজন হিন্দী ভাষার বিখ্যাত কবি ছিলেন। তাঁর রচিত কবিতা অতি উচ্চ ধরণের। সম্রাটের পরম প্রিয়, সাম্রাজ্যের একজন উচ্চ পদাধিকারী, দানবীর, ভক্ত, রসিক কবি রহীমের কীর্ত্তির কথা লোক-মুখে আজও শ্রদ্ধার সহিত বর্ণিত হয়ে থাকে। গঙ্গ কবির কবিতা শুনে একবার রহীম এতই মুগ্ধ হন্ যে, তিনি তাঁকে ছত্রিশ লাখ টাকা দান করেছিলেন! এত বড় দান আর কোনো কবির ভাগ্যে জুটেছে বলে শোনা যায় নি।

পারসী ও আরবীর একটি শব্দ ব্যবহার না করে বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল

হিন্দীতে তিনি অবাধে কবিতা রচনা করে যেতেন। তাঁর রচিত "রহীম সতসই" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

কবি কেশোদাস হিন্দী ভাষার আর একজন মহাকবি ছিলেন। ওড়ছার মহারাজা রামসিংহ তাঁকে নিজের সভা-কবি নিযুক্ত করে-ছিলেন। মহারাজার ভাই ইন্দ্রজিৎ সিংহের সহিত কবির পরম মিত্রতা ছিল। মহারাজা বীরবল এঁর রচিত একটি কবিতা শুনে ছয় লাখ্ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। বীরবল নিজেও একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। কবিদের অনেকেই দেশবাসীগণের নানা প্রকার উপকার করার চেষ্টাও করতেন। নরহরি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তখন আকবর বাদশা দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন। কয়েকটী ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সহরে কসাইরা অসংখ্য গো-বধ ক'রে, দেশের গোধন কমিয়ে দিচ্ছিল। একবার কসাইর হাত থেকে কোনো রকমে পালিয়ে একটি গাই এসে নরহরির বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেয়। গরুটির অবস্থা দেখে কবির খুব দয়া হোলো এবং দুঃখও হোলো। তিনি এক টুক্‌রা কাগজে দু'লাইন এক কবিতা লিখে গরুর গলায় ঝুলিয়ে তাকে একে-বারে আকবর বাদশার দরবারে হাজির করিলেন। বাদশা প্রকৃত ঘটনাটি জান্‌তে পেরে এতই দুঃখিত হয়েছিলেন যে, তিনি গো-বধ-প্রথা একেবারে উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

আওরঙ্গজেব বাদশার পুত্র শাহজাদা মুয়জ্জমের প্রিয় কবি ছিলেন আলম। ইনি নানা রকমের সমস্যা পুরণের কবিতা রচনা করতেন। একবার তাঁর বাঁধার পাগড়ীটি রং করবার জন্য, এক টুকরা কাগজে মুড়ে শেখ বলে এক রংওয়ালীর (হিন্দীতে বলে রংরেজিন) দোকানে পাঠিয়ে দেন। সেই পাগড়ী বাঁধা কাগজে কবি আলমের রচিত কবিতার একটি লাইন লেখা ছিল—অনেক চেষ্টা করেও তিনি ঐ কবিতার পরের লাইনটি লিখে কবিতার মিল করতে পারেন নি। শেখ পাগড়ীর মোড়ক খোলবার সময় ঐ কাগজ দেখলে এবং পরের লাইনটি তৎক্ষণাৎ রচনা করে আলমের লিখিত লাইনটির নীচেই লিখে দিলে। তার পর নূতন রংকরা পাগড়ী ঐ কাগজে মুড়ে কবিবর আলমের কাছে পাঠিয়ে দিলে। কবি পাগড়ী খোলবার সময় কাগজে দেখলেন যে, তাঁর সেই রচিত কবিতাটির এক লাইনের নীচেই কে আর এক লাইন লিখে কবিতার মিল ঠিক করে দিয়েছে।

তিনি শেখ রংরেজিনের দোকানে গিয়ে সব জান্‌তে পার্‌লেন এবং ভারী খুশী হয়ে পাগড়ী রং করার বাবদ এক আনা আর কবিতা-পূরণের জন্য এক হাজার টাকা শেখকে দান করে এলেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্টতা হোলো এবং অবশেষে তা বিবাহে পরিণত হোলো।

আলম-শেখ মিলিত হয়ে হিন্দীতে অনেক কবিতা রচনা করে গেছেন। একই কবিতা ভাগাভাগি করে দুজনেই লিখেছেন। দুজনের কবিতাই প্রেমের কথায় ভরপুর।

আলম-শেখের একটি ছেলে হয়েছিল—তার নাম রাখা হয় 'জাহান'। অপূর্ব্ব প্রতিভাময়ী কবি শেখের যেমনি অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তি ছিল, তেমনি আশ্চর্য্য বাক্‌চাতুর্য্যও ছিল। একবার শাহজাদা মুয়জ্জম ব্যঙ্গ করে শেখের কাছে জিজ্ঞেস্ করেন,—"আলম কী আওরাত আজ হি হাঁয়?" উত্তরে শেখ বল্লেন, "জাহাপনাহ, জাহান্ কি মা ময় হিঁ হু।" শাহজাদার রসিকতা সেখানেই থেমে গিয়েছিল।

সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য অনেক বিখ্যাত কবির কথা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লিখ্‌তে পারি নি। তাদের কথা বল্‌তে গেলে একটি বড় প্রবন্ধও কুলোবে না।

হিন্দী কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে দেশবাসীর অপার আনন্দের ধারা বহুমুখী হয়ে বয়েছে—এ কথা ভাব্‌তে গেলে মন অপূর্ব্ব পুলকে ভরে উঠে। বারান্তরে আরো সর্ব্বজন-সমাদৃত হিন্দী কবির বিষয় উল্লেখ করা যাবে।

কোষ্ঠীর ফলাফল

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৩৩)

একুশ দিনের দিন বেলা আটটার পর গগনভেদী হাহাকার ভেদ করে, মানবের দেহটী মাত্র নিয়ে যখন বাইরে আসা হ'ল,—সামনেই দেখি, আজিজ বজ্রাহতের মত নিস্পন্দ, নিষ্পলক দাঁড়িয়ে। সে আজ হিন্দু-মতে গঙ্গাস্নান ক'রে, শুচি হয়ে, নূতন একখানি নীল লুঙ্গী পরে', নূতন একখানি খানি রংয়ের উত্তরীয় মাত্র গায়ে দিয়ে, খালি পায়ে দোস্তকে দেখবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এসেছিল। তার সেই লম্বা লম্বা চুল বেয়ে মুক্তাধারার মত জল ঝরছিল। অদূরেই তার ভিজে কাপড়, ভিজে ঝোলা—আর তার ওপর তার ছোরাখানি পড়ে আছে দেখলুম আজিজকে দেখাচ্ছিল, যেন নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগারে প্রবেশে প্রস্তুত ইন্দ্রজিৎ।

তার ধীর গম্ভীর কণ্ঠ হতে বেরুল'—"উতারো!" শুনে সকলে চমকে গেল,—সকলে তারিণী জ্যেঠার দিকে চাইলে।

দীনু গাঙ্গুলী বললেন—"তারিণীর দিকে চাইছ কি, —গ্রামের মঙ্গলামঙ্গল ত' ওর একার নয়,—'তোলা মড়া' কি নাবাতে আছে!" নবীন বাবু বললেন—"তাতে এমন দোষটা কি,—লোকটা ওকে ভালবাসত',—একবার দেখতে ইচ্ছে করে; এই যে দূর থেকে যারা আনে, তাদের মাঝে মাঝে ত নাবাতেই হয়।" রাখাল রায় বললেন—"ওঃ—নবীন সিমলের বড় দপ্তরে চাকরী করে কি না!" সিধু ভট্টাচায্যি বললেন—"দূরে থেকে আসলে নাবায়—সেটা আমরাও জানিহে;—তারা নিজের গ্রামে নাবায় কি বল্‌তে পার?" নবীনবাবু বললেন—"যেখানেই নাবাক—কোন' গ্রাম ত' সেটা,—সে গ্রামেও লোক থাকে, তাদেরও ত' মঙ্গলামঙ্গল আছে।"

"ওঃ"—"ইস্" প্রভৃতি শব্দের মধ্যে আজিজ বজ্র-কঠিন কণ্ঠে বললে—"হাম্ দোস্তকো দেখেগা—উতারো!" সকলে চম্‌কে গেল। যারা কাঁধ দিয়েছিল তারা "এই রইল" যেই বলা, তারিণী জ্যেঠা তাড়াতাড়ি—"এই—এই,—এই রাস্তাটায়" বলতে না বলতেই, তারা দোরের পাশেই নাবিয়ে সত্বর দাঁড়াল';—আমি স্পর্শ করে রইলুম।

"দোস্ত!" বলেই আজিজ মানবের মুখের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পোড়লো। মিনিট খানেক তার দিকে নিনিমেষ চেয়ে থেকে বললে—"মেরে যানেসে আগর তোমারে হিন্দু লোগ্ তোমারা তজ্‌বিজ্ (যত্ন) না-করে —তোমকো নফরত্ (ঘৃণা) করে, ইস্ ডর্‌সে হম্ ধোখা খা গেয়া—তোমারে পাশ্ পঁউচ্ না সেকা; নহি তো জান্ দেনে জো তৈয়ার্ থা উস্‌কো কোন্ রুখ্ সেক্‌তা! হম্‌কো মাফ করো, হম্ বড়া ধোকা খায়া। দোস্ত তুম্ হমারা জান্ বাঁচায়া, হাম্ একদফে হাজির ভি না হো সেকা,—হামারা কিস্‌মত্!" তার পর একটু থেমে বললে—"অচ্ছা আব্ এক্ বাত্ কহে যাও ভাই,—তুম্ যাঁহা চলে—হম্ উঁহা তুম্‌সে মিল্ সেকেগা?—উঁহা তো হিন্দু নেহি!—বোলো—বোলো দোস্ত্—তো হাম্"—বলিতে বলিতে কে যেন তাহাকে বাধা দিলে, সে হতাশ ভাবে বল্‌লে,—"লেকিন্ তুম্ হাম্‌কো কহা থা—'হমারা দোস্ত্ না-মরদ্ নেহি হ্যায়,—না মর্দ্দিকে সরম্ শির্‌মে না উঠাও'!—তো হম্ ক্যা করেঁ"—বলেই আশাহত উন্মাদের মত সজোরে মাথা নাড়লে। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখের জল ঠিক্‌রে গিয়ে মানবের ঠোঁট্ ভিজিয়ে যেন তার দোস্তকে দেখবার—এই বিশ দিনের প্রচণ্ড পিপাসা আজ মিটিয়ে দিলে!

ঘনকৃষ্ণ ভ্রূর নীচে আজিজের চোখ দুটি এতক্ষণ যেন পাষাণ-মূর্ত্তির ওপর পালিশ্-করা ইস্পাতের মত ঝক্‌ঝক্ কোরছিল,—এইবার সেই পাষাণ ফেটে ঝর্ণা বেরিয়ে এল। সে মানবের বুকের ওপর মাথা রেখে কি অশান্ত কান্নাটাই কাঁদলে। তার বুকের দুধার বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল। আমার ঠিক বোধ হল—মানবের এই বিশ দিনের বিচ্ছেদ-দগ্ধ বুকটা সে জুড়িয়ে দিলে। তার পর সে মুখ তুলে' যা বললে' তা এই,—"আজ একুশ দিন হল বন্ধু—এই দুষ্মন্ জ্বরের প্রথম দিন তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিতে আসি। তুমি সেলাম করে ভেতরে চলে গেলে, পর-ক্ষণেই দেখি—ছুটে ফিরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করে বল্‌লে—"দোস্ত্—ভুলে গিছলুম্—প্রাণটা কেমন করে উঠল"—বলেই আবার ছুটে ভেতরে চলে গেলে। প্রাণটা আমার ঝাঁৎ করে উঠেছিল, কিন্তু বুঝিনি—তুমি শেষ বিদায় নিলে। "আও দোস্ত্—আজ ছুট্টিকা দিন্ হমারা ছাতিপর্ আও"—বলেই তাকে ন্যাকড়ার পুতুলটির মত বুকে তুলে নিয়ে দাঁড়াল;—দেবতা যেন সত্যব্রত নির্ভীক নিষ্কলুষ "মানব"কে তুলে নিলেন—শিব যেন সতীদেহ নিয়ে দাঁড়ালেন!

আজিজ মানবের বুকে মাথা রাখতেই "ইস্—পর-কালটাও গেল!" প্রভৃতি সময়োচিত ইঙ্গিত কাণে এসেছিল; এখন "হাঁ—হাঁ" শব্দের সঙ্গে "ছোঁড়া জাতিচ্যুত—ধর্ম্মচ্যুত হল" প্রভৃতি স্বজনোচিত গুঞ্জন শোনা গেল;—গুঞ্জনকারীদের পশ্চাতে হুল্‌টা থাকেই,—সেটাও দেখা দিলে—"ও মড়া ছোঁবে কে!"

আজিজ দোস্তকে সযত্নে—সন্তর্পণে শুইয়ে দিয়ে—ব্যাগ্ থেকে দুবার দুমুঠো টাকা নিয়ে তার দুপাশে রেখে, আমার দিকে চেয়ে বললে—"দোস্তকা কোই কাম্‌মে লগে তো অচ্ছা,—নহি তো গরীবোঁকা বাঁট্ দেনা বহাদুর।" তার পর উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বিষাদ মিশ্রিত বিনয়ে বললে—"আব্ যো খুসি করো ভাই।"

প্রবীণেরা তারিণী জ্যেঠাকে ঘিরে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে

ব্যস্ত হলেন। পাঁচ মিনিট পরেই লাস উঠে গেল। আজিজ হাঁটু গেড়ে সেলাম করলে।

মানবের মৃত্যু-সংবাদে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ—বিশেষ কোরে ইতর সাধারণ,—জেলেপাড়া, দুলেপাড়া, মুসলমান-পাড়া ভেঙ্গে পড়েছিল; সকলের মুখেই "হায় হায়—" আর তার কাছে কে কবে কি উপকার পেয়েছিল, কবে কি বিপদে সে কাকে রক্ষা কোরেছিল—সেই সব কথা; সকলের চোখেই জল।

আজিজ এই পাঁচ-সাতশো লোকের সহানুভূতি দেখে উৎসাহে বলে উঠল—তোমারা বাদশা চলা গয়া, "—মরদ অওর নাহি রহা,—আব্ একদফে দোস্তকে সাথ সাথ যাও ভেইয়া" বলে হাতজোড় করতেই, জনতা মন্ত্রচালিতের মত তার সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে চল্‌ল। জমীদার কি রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে এ দৃশ্য দেখিনি! আমি তখন টাকা গুণে তারিণী জ্যেঠার হাতে দিচ্ছিলুম,—তাঁর মিতেরা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজিজ ডাকলে "বহাদুর"! এমন সুমিষ্ট মৃদু-মধুর কণ্ঠ পূর্ব্বেও শুনিনি—পরেও শুনিনি,—যেন শিরায় শিরায় শিরীষ ফুল বুলিয়ে দিলে। ইচ্ছে হল—তার বুকে লুটিয়ে গিয়ে পড়ি। আমার দিকে চাইতেই তার চোখে জল গড়িয়ে এল,—পিঠে হাত দিয়ে বিষাদ-বিষণ্ণ কণ্ঠে বললে "বহাদুর—যাও ভাই, দেখো বাকে—দোস্তকে সব কাম পুরা পুরা ঠিক্ ঠিক্ হোয়ে;—যাও ইঁহা আওর কোন্ কাম্ রহা ভাই! আওর এক বাত—মায়ীকো জরুর দেখনা বাহাদুর"—এই বলে তার ধানি রংয়ের উত্তরীয় দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিলে,—আর "অচ্ছা যাও" বলে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমি অনিচ্ছায় ধীরে ধীরে এগুলুম। তাকে ছেড়ে যেতে আমার পা উঠ ছিল না। মানবের শেষ কথা—"তোর মা নেই লোকেন,—তাই তোকে মা দিয়ে চল্‌লুম" —মনে হয়ে' চোখের জলে কিছু দেখতে পাচ্ছিলুম না।

মানব পাড়ার ছেলেমেয়েদের নিয়ে খেলা করতে ভালবাসত';—খেলায় হার-জিৎ উপলক্ষ কোরে—নিজে হেরে—তাদের ইচ্ছামত খাবার এনে খাওয়াত';—খেলার জিনিসও কিনে দিত। দশ-বারো বছরের ছেলেদের নিয়ে মধ্যে মধ্যে লাফানো, দৌড়োনো, সাঁতার দেওয়া, গাছে ওঠা, আর বাচ্‌খেলার পরীক্ষা হ'ত,—পুরস্কার দেওয়াও হ'ত। তাই সে তাদের উপাস্য বন্ধু ছিল। সেদিন সব ছেলেমেয়েই ছুটে এসেছিল; বন্ধুহীন বিষাদে ছল ছল চোখে চুপচাপ্ দাঁড়িয়ে ছিল;—যাদের জ্ঞান হয়েছে, তারা মাঝে মাঝে চোখ মুছছিল।

আমি চলে গেলে আজিজ তার ঝোলাটি উপুড় করে তাদের সামনে ছড়িয়ে দিয়েই দ্রুত সে স্থান ত্যাগ করে—সে আর পেছু ফিরে চায়নি। সেদিন কেবল বেদানা আর আপেল ছিল—অনেক। ছেলেমেয়েগুলির মনের অবস্থা এমন ছিল যে সে সব কুড়ুতে তাদের উৎসাহই ছিল না,—কেবল ৪।৫ বছরের কয়েকটি ছেলেমেয়ে দু' একটি ফল হাতে কোরেছিল মাত্র;—অমনি উপস্থিত বুদ্ধিমানেরা হুঁকো ফেলে ক্ষুধার্ত্ত কাঙ্গালের মত এসে পড়েন—"ভূতে খেলে আর হবে কি, নারায়ণকে দিলে কাজ হবে" বলে' কোঁচড় ভর্ত্তি করে সত্বর যে যায় বাড়ী ফেরেন।

নবীনবাবু এই ব্যাপার দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চলে যান। আমি এ কথা তাঁর কাছেই শুনেছিলুম। চূড়ামণি মশাই শুনে বলেছিলেন "ওরাই জাতটার মুখ পোড়ালে।"

* * * * *

আমাদের গ্রামের প্রচলিত প্রথা ছিল,—দিনের যে কোন সময়ে সৎকার শেষ হলেও—সন্ধ্যায় "তারা" দেখে স্নানান্তে প্রত্যাবর্ত্তন। তাই সন্ধ্যার সময় স্নান করে যখন উঠি,—তখন অনেকেই গঙ্গার ঘাটে সন্ধ্যা-বন্দনাদি কচ্ছিলেন। সেই সময় সিধু ভটচায্যি চাপা গলায় রাখাল রায়কে বলছেন শুনতে পেলুম—"এখনও একটা রইল!" এই কথাটার কারণটা জানতে চেয়েছিলেন,—এখন বোধ করি বুঝতে পেরেছেন।"

ভদ্রলোকটি ছোট একটী ক্ষীণ "হুঁ" দিয়েই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন—"আজিজের কি হল মশাই?"

বললুম—ফিরে গিয়ে দেখি—তার ভিজে কাপড়গুলি আর ছোরাখানি যেখানে সে ফেলেছিল—সেইখানেই পোড়ে আছে;—ঝোলাটা একটু তফাতে পেলুম। তুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বেড়ার গায়ে শুকুতে দিলুম,—ছোরাখানি তুলে রাখলুম।

পরদিন চারপাঁচজনের কাছে এক কথাই শুনলুম,—আজিজ এক মনে রাস্তার একধার ধোরে যখন দ্রুত চলে-ছিল, তখন তার চোখ ফেটে রক্ত গড়িয়ে বুকে এসে

পড়ছিল! তার এই অবস্থা দেখে আর মানবকে মনে পড়ে, পরিচিত লোকের প্রাণ হুহু করে কেঁদে উঠেছে,—কিন্তু কেউ কোন কথা কইতে সাহস করেনি—অনেকেই সরে গেছে। অপরিচিত লোকে ভেবেছে—উন্মাদ না হয় খুনে। রোড ইন্‌স্‌পেক্টার রাসমোহন বাবু সাইকেল্ ছুটিয়ে থানায় গিয়ে খবর দেন। দারোগাবাবু বড় ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি দুজন কনেষ্টবল নিয়ে রাস্তায় এসে অপেক্ষা করেন। আজিজকে তিনি চিনতেন। তাকে দেখেই তাঁর ধারণা হয়—চোখে নিশ্চয়ই কিছু বিঁধে আছে—না হয় কোন কিছুর খোঁচা লেগেছে; তাই ব্যস্তভাবে বলেন—"একদম কাশীপুর হাঁসপাতালে চলে যাও।" আজিজ কোন্ উত্তর দেয়নি।

তার পর কত খুঁজেছি, কত খবর নিচ্ছি,—দিন গেছে, মাস গেছে, বছরের পর বছর গেছে,—আজিজ আর ফেরে নি। তার কাপড়গুলি এক এক করে গরীব দুঃখীদের দিয়ে দিছি। কেবল তার হাতের ছোরাখানি অন্যের হাতে দিতে পারিনি,—অযোগ্যের হাতেই রয়ে গেছে।

চোখ দিয়ে রক্ত পড়ার কথাটা অনেকেই বিশ্বাস করেনি,—আমিও ও সম্বন্ধে অনেক দিন ভেবেছিলুম।

পাঁচ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ঘেরা মরুধূসর খুন-খেলার—দেশের লোকের প্রাণে এ ভালবাসা—এ প্রেম কোথা থেকে এল,—এর সামনে যে বিশ্ব ভেসে যায়!—এ যে সৃষ্টিও করতে পারে, প্রলয়ও আনতে পারে।

দশ বছর পরে ভেবেচি—পাহাড়ের মুক্তবায়ু, ঝর্ণার মুক্তধারা,—আঙ্গুর-আপেলের সরস যৌবন-সৌন্দর্য্য,—পিচ ফুলের হোলিরাগ,—সৌরভ-মন্দির গোলাপ-কুঞ্জের ঊষা-লাবণ্য,—শূন্যভরা বিহঙ্গ-সঙ্গীত,—সর্ব্বোপরি তার বাধাহীন স্বাধীন জীবনই তার হৃদয়টাকে প্রেম-মধুর করে গড়ে তুলেছিল,—তার বিশাল বুকখানাকে প্রেম-সম্পদে ভরে দিছিলো।

বিশ বছর পরে যখন দেখলুম—প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মশাই বলেছেন,—"কখন-কখন উপাসনার সময় প্রবল হৃদয়াবেগে কেশব বাবুর চোখে রক্ত বেরিয়ে আসত," তখন বিচ্ছেদ-ব্যথা-মথিত প্রেমোন্মত্ত আফগানের 'রক্ত-বেগ-তরঙ্গিত' বুকের রক্ত যে আজিজের চোখ দিয়ে গড়িয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার আর দ্বিধায় অবকাশ থাকেনি।

আজ আমি তাদের দুজনকেই গভীর শ্রদ্ধায় নমস্কার করি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি আর তাঁর সঙ্গী যুবাটি উভয়েই হাত তুলে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোকটি বললেন—"মাফ করবেন—আপনাকে বড়ই মনঃকষ্ট দিলুম,—আমরাও কিন্তু কম পেলুম না।"

বলিলাম—"আমার এই কষ্টের মাঝে প্রকাশের একটা আনন্দও আছে, তা না ত' কি অনাবশ্যক এতটা বকতে পারি,—না শিকার থেকে বিকারে গিয়ে পৌঁছুতে পারি। পূর্ব্বেই আপনাদের বলেছি—মানব কি আজিজের কথায় আমি সব ভুলে যাই—মাত্রাজ্ঞান থাকেনা। তারা যে আজও আমার দিনের চিন্তা—রাতের স্বপ্ন।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন—"হোতেই পারে—আমরাও বোধ হয় ভুলতে পারবনা। তা হোক্—এ ব্যথা বহন করেও সুখ আছে।"

ইহার পর কাহারো আর কোন কথায় উৎসাহ রহিলনা, দু'একটা শোকোচ্ছ্বাসের পর তাঁহারা বিদায় লইলেন।

স্মরণে

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ

আমার ললাটে তব মঙ্গল পরশ
পেয়েছিনু কত দিন প্রভাতে সন্ধ্যায়,
কর্ম্মহীন, খ্যাতিহীন মধ্যাহ্ন অলস
শীতলি' রাখিলে তুমি তব স্নেহছায়।
কত না সুদীর্ঘ রাতি ব'সেছিলে জাগি'—
বাহিরে আঁধার ঘন, ঘরে দীপ জ্বালা,
একটী চরণ-শব্দ শুনিবার লাগি'—
উন্মুক্ত দুয়ার-পাশে একান্ত নিরালা।

আজো আসিয়াছি ফিরে মৌন সন্ধ্যারাতে,
অবসন্ন দেহভার, ক্লান্ত খিন্ন মনে—
দুয়ারে দাঁড়ায়ে নাই গন্ধ-দীপ-হাতে
কল্যাণ মূরতিখানি পূজা সমাপনে।
আমার যা' কিছু চাওয়া—স্নেহ, সেবা, প্রীতি—
তুমি নিয়ে গেছ চলে'—আছে শুধু স্মৃতি!

* * *

বাদল নিশীথে আজো চমকিয়া জাগি'—
রুদ্ধ ঘরে দেখি যেন—ঝঞ্ঝার প্রলয়ে
ফিরে আসিয়াছ তুমি; অপলক-আঁখি—
শিয়রে দাঁড়ায়ে আছ অনিশ্চিত ভয়ে।
স্বপনে ললাট-'পরে নিঃশ্বাস পরশ
পাই যেন মনে হয়—যেন মোর লাগি'
বসে' আছ ধ্যানরতা নিস্পন্দ অবশ—
দেবতা-চরণে মোর শুভ ভিক্ষা মাগি'।

যেন শুনিবারে পাই অশরীরি বাণী—
মরতের স্নেহ-ভীত আকিঞ্চনে ভরা—
সুদূর স্বরগ হতে'—জানি, ওগো জানি—
বহে' আনে বার্ত্তা তব সর্ব্বভয়হরা।
যেন বলিবারে চাহে আমারেই 'যাচি'—
বেঁচে আছি—বেঁচে আছি—আমি বেঁচে আছি।

ভালবেসেছিলে তুমি—চাহ নাই কভু
বিনিময়ে আনন্দের তুচ্ছ আয়োজন;
পাও নাই স্নেহ-স্পর্শ—মেনেছিলে তবু
বিদ্রোহী চিত্তটী—তার নিঠুর শাসন।
শুনেছিলে, স'হেছিলে প্রসন্ন বয়ানে
কত না কঠোর বাণী; বুঝেছিলে মোর
অশান্ত হিয়াটী যাহা ক্ষুব্ধ অভিমানে
জানে নাই—আপনার গরবেতে ভোর।

ফুটেছিল কণ্ঠে তব শেষ আশীর্ব্বাণী,
মরণ-আহত করে স্নেহের পরশ
ল'য়েছিনু শিরে তুলি' পুণ্য বলে' মানি—
শুষ্ক হিয়া অশ্রু মোর রসনা অবশ।
তবু কেন মনে হয়—অন্তিম শয়ানে
মুখানি জাগিয়া ছিল মৌন অভিমানে!

* * *

অপমান-ক্ষত হিয়া—নতশিরে ফিরি'
শূন্য ঘরে বসে' থাকি নীরবে একেলা—
বিশ্বের আনন্দটুকু কল্পনাতে ঘিরি'
কেটে যায় অন্তরের শুষ্ক দীর্ঘ বেলা।
তোমারে তো বলি নাই রুদ্ধকণ্ঠে কভু
ক্ষুব্ধ হিয়াটীর মোর দীর্ঘ ইতিহাস,
গোপন ব্যথাটী তার; বুঝেছিলে তবু—
অভিমানে ছিল কত অতৃপ্ত পিয়াস।

আজি জেগে নাই কারো পথ-চাওয়া আঁখি
মোর গৃহ-বাতায়নে—তপ্ত অশ্রু দিয়া
মুছিতে লাঞ্ছনা-ক্ষত বক্ষপুটে ঢাকি'—
মোর তরে চিররুদ্ধ নিখিলের হিয়া।
অভিমান? কার 'পরে? শুধিব কি দিয়ে—
সর্ব্বহারা আজি আমি সবটুকু নিয়ে!

মহম্মদপুর

শ্রীসুজননাথ মিত্র মুস্তৌফী

(আলোক-চিত্র—শ্রীযুত ললিতাপ্রসাদ দত্ত বর্ম্মণ মহাশয়ের সৌজন্যে)

(২)

সীতারামের দুর্গাভ্যন্তরের কীর্ত্তিগুলি দেখিয়া, দুর্গের বাহিরে তাঁহার যে সকল কীর্ত্তি আছে, আমরা তাহা দেখিতে চলিলাম।

সীতারামের উত্তরের গড়ের উত্তর পাড়ে কামারপাড়া ছিল। তথায় কামান, বন্দুক ও অস্ত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। এখনও তথায় কোঠাবাড়ী, পুকুর ও দেবালয়াদির ধ্বংসা-

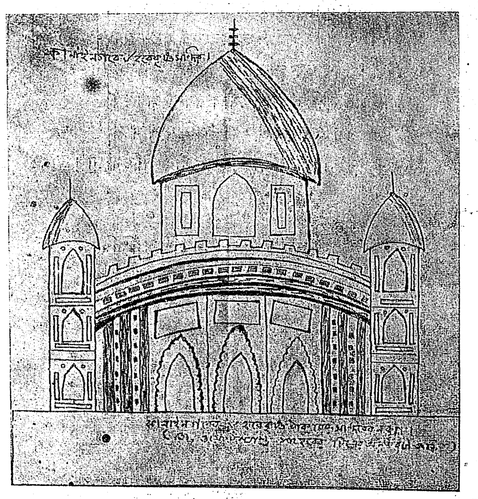

কানাইনগরের ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের মন্দিরের নক্সা।
(জে, ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের চিত্রের অনুকরণে অঙ্কিত)

বশেষ নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে। পূর্ব্বে এইস্থানে দুর্গোৎসব, কালীপূজা ও দোল প্রভৃতি উৎসবে বহু সমারোহ হইত। এক্ষণে তথায় জনমানব নাই, গভীর অরণ্য মধ্যে ব্যাঘ্র, সর্প ও শূকর নির্ভয়ে বাস করিতেছে।

কামারপাড়ার পশ্চিম দিকে নারায়ণপুর গ্রামে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের বাটী ও পুকুরের ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলের মধ্যে লুক্কায়িত আছে।

লোকমুখে শুনিলাম যে, মহম্মদপুরের পূর্ব্বদিকে মধুমতীর জলের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে একটি মোটা লোহার শিক আছে। উহা কি জিনিস, তাহা কেহ জানে না। ইহা শুনিয়া, আমরা পূর্ব্বোক্ত ব্যাঘ্র পরিবার খাঁচার পার্শ্বস্থ ভূষণা যাইবার রাস্তা দিয়া মধুমতী তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, যেখানে নদীর পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে চারি হস্ত পরিমাণ মাটীর নীচে দিয়া একটি মোটা ও অতি দীর্ঘ লোহার শিকের ন্যায় পদার্থ জলের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। উহা টানিলে নড়ে, কিন্তু উঠিয়া আসে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, উহা ইংরাজ আমলের অতি প্রাচীন কালের পরিত্যক্ত টেলিগ্রাফের তার বা কেব্‌ল্ (Cable)। আলকাতরা-সিক্ত ক্যাম্বিস জড়ান তামার তারের চতুর্দ্দিকে গোল করিয়া সাতটি লৌহ শিক বসান আছে। তাহার উপরে উপর্য্যুপরি দুই অঙ্গুলি প্রশস্ত দুইটি করিয়া লোহার পাত মজবুদ করিয়া মুড়িয়া উহাদের মুখ ঝালিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেব্‌লটি এইরূপে বরাবর লোহার পাত দিয়া মোড়া থাকায়, উহা দেখিতে সর্পের খোলসের ন্যায় হইয়াছে, এবং আজিও উহার মধ্যে জল প্রবেশ করে নাই।

তৎপরে আমরা দুর্গে ফিরিয়া আসিয়া, বাজারের পশ্চিম দিকে স্থিত পূর্ব্বোক্ত বাহিরের বড় গড়ে জলভ্রমণের জন্য চলিলাম। বাজারের নীচে জেলে-ডিঙ্গিতে বসিয়া পশ্চিম

দিকে চলিলাম। দুর্গের দক্ষিণ দিকের এই বাহিরের বড় গড়টির উত্তর ও দক্ষিণপাড়ে বেত, যজ্ঞ-ডুমুর, জিউলি জাতীয় হিজল গাছ ও অন্যান্য আগাছার বন হইয়া আছে। উহাদের পাতা পচিয়া এই সুবিশাল গড়ের জল নষ্ট হইতেছে। গড়ের দক্ষিণ পাড়ে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের রথ টানিবার পথ আছে। এই গড় ও ইহার দক্ষিণ পাড় এক্ষণে সলদীর জমিদার পাইকপাড়া রাজবংশের সম্পত্তি।

আমরা এই গড়ের দক্ষিণ দিকের খাল দিয়া ফুরশী বিলে পড়িলাম; ও বিলের ধান গাছের মধ্য দিয়া লগি ঠেলিয়া সীতারামের সুখসাগরের পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করিয়া দক্ষিণ দিক দিয়া উহার বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই সুখসাগরটি প্রায় সমচতুষ্কোণ। ইহার প্রত্যেক দিক অনুমান ১৬০ হাত দীর্ঘ। একটি সমচতুষ্কোণ জলের বেষ্টনীর মধ্যস্থলে একটি চতুষ্কোণ দ্বীপ আছে। পূর্ব্বে এই দ্বীপে হাওয়াখানার ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। তথায় সীতারাম গ্রীষ্মকালে বাস করিতেন। এক্ষণে দ্বীপের মধ্যস্থলে স্থানে স্থানে সেই অট্টালিকার ইষ্টকাদি বনাকীর্ণ হইয়া আছে। দ্বীপের চতুর্দ্দিকে জলের ধার ইষ্টক দ্বারা বাঁধান ছিল, তাহার চিহ্ন এখনও আছে। আমরা বনাকীর্ণ দ্বীপটির সম্মুখে নৌকাসহ উপস্থিত হইবামাত্র, তিন চারিটি অতি বৃহৎ গোসাপ—কুম্ভীর বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না—জঙ্গলের মধ্য হইতে বাহির হইয়া, ক্রোধব্যঞ্জক এক-প্রকার বিশ্রী শব্দ করিতে লাগিল। আমরা নৌকাসহ দ্বীপটি প্রদক্ষিণ করিয়া, উহাতে অবতরণ করিয়া, বেতবন ও জঙ্গল ভেদ করিয়া, ক্ষত-বিক্ষত দেহে দ্বীপের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম। মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ যজ্ঞ-ডুমুরের গাছ আছে। উহাতে নানা জাতীয় লতা আশ্রয় লইয়াছে। শীতাবসানে এই দ্বীপে বিষাক্ত সর্প দেখা যায়।

সুখসাগর হইতে পুনরায় বড় গড়ে ফিরিয়া আসিলাম। উক্ত গড়ের পশ্চিম প্রান্তে কানাইনগর গ্রাম আছে। অতি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের পশ্চিম-প্রান্তে বনের মধ্যে সীতারামের দারুময় হরেকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজাবাটী আছে। উত্তর-পূর্ব্ব কোণার দ্বার দিয়া এই বাটীতে ঢুকিলে মধ্যস্থলে উঠান আছে। এই উঠানের উত্তর দিকে একটি দক্ষিণদ্বারী একতলা কোঠা আছে,—উহা পূর্ব্ব-বর্ণিত রাণী ভবানীর দারুময় বলরাম বিগ্রহের গৃহ। এই গৃহটির ছাদে কড়ি-বরগা দেওয়া আছে। ইহার সম্মুখের দেওয়ালে ইষ্টকের উপরে যৎসামান্য কারুকার্য্য আছে। উঠানের পশ্চিম দিকে ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের সীতারাম কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুউচ্চ পঞ্চচূড় মন্দির আছে। এই মন্দিরের সম্মুখ দিকে মাঝের দরজায় খাঁজ-কাটা খিলানের উপরে দুই পার্শ্বে দুইটি পৌরাণিক যুগের ঘোড়ার ন্যায় মুখবিশিষ্ট কোমর-সরু সিংহ ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ আছে। ইহা ছাড়া সম্মুখের দেওয়ালে সর্ব্বত্র নানারূপ নক্সা ও পুত্তলিকা প্রভৃতি ইষ্টকের উপর উৎকীর্ণ আছে। কোন কোন স্থানের কারুকার্য্য



৺বুড়াশিবের বটাচ্ছাদিত ভগ্ন মন্দিরের পশ্চাৎভাগ

ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া আছে। কিন্তু এই কারুকার্য্য ভাল হইলেও অত্যুৎকৃষ্ট নহে। মন্দিরের সম্মুখ দিকে খিলান-করা ছাদবিশিষ্ট তিন ফোকরযুক্ত বারান্দা আছে। মধ্যের যে ঘরটিতে বিগ্রহ থাকিতেন, উহাতে অসংখ্য চামচিকা বাস করিতেছে। এই বিগ্রহ থাকিবার ঘরের পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এক একটি দ্বার আছে। মন্দিরের উত্তর দিকের বারান্দার পাঁচটি খিলান-করা ফোকরের মধ্যে পূর্ব্ব দিকের দুইটি ইট দিয়া গাঁথিয়া বন্ধ করা আছে, এবং উহার পার্শ্বে অর্দ্ধভগ্ন একটি ক্ষুদ্র একতলা ঘর আছে। মন্দিরের পশ্চাতে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে কোন

দ্বার নাই। দক্ষিণ দিকের বারান্দাটি সর্ব্বপ্রকারে উত্তর দিকের বারান্দার ন্যায় ছিল, কিন্তু এক্ষণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। মন্দিরের উপরে বড় বড় অশ্বত্থ-বট জন্মিয়া উহাকে দ্রুত ধ্বংস-পথে লইয়া যাইতেছে। এই হরেকৃষ্ণের মন্দিরের লুপ্ত স্মৃতি-ফলকে লেখা ছিল :—

বানদ্বন্দাঙ্ক চন্দ্রে পরিগণিত শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী।
মদ্বিশ্বাসভাষোদ্ভব কুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং।
শ্রীসীতারাম রায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমানুৎসসর্জ্জ।

অর্থাৎ বিশ্বাস বংশোদ্ভব সীতারাম ১৬২৫ শকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী হইয়া যদুপতিনগরে অর্থাৎ কানাইনগরে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উঠানের দক্ষিণ দিকে অশ্বত্থ-বটাচ্ছাদিত আর একটি মন্দির আছে। উহার সম্মুখ দিকে

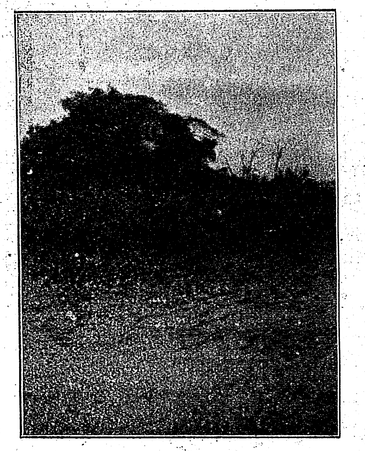

মহম্মদপুর—সুখসাগর।

কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য আছে। মন্দির মধ্যে দারুণ অন্ধকার। উঠানের পূর্ব্ব দিকে আর একটি মন্দিরের সম্মুখের দেওয়ালটি মাত্র দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখের দেওয়ালের গাত্রে ইষ্টকের উপর নানা প্রকার মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য আছে। শেষোক্ত দুইটি মন্দিরে কোন বিগ্রহ ছিল কি না, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, একটিতে ভোগ হইত, এবং অপরটিতে অতিথিশালা ছিল। অশ্বত্থ ও বটের ছায়ার জন্য এই পূজাবাটীতে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করে না। কানাইনগরের এই পূজাবাটীর হরেকৃষ্ণ ও বলরাম ঠাকুরকে নাটোরে লইয়া যাইবার পর হইতে, দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অযত্নে বহুকালের অসংস্কৃত এই মন্দিরগুলি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে এই বিংশে দুইটি দুর্গের মধ্যে ৺রামচন্দ্রের গৃহে আছেন। ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের এই বাটী পূর্ব্বে প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল, এখনও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। এই ঠাকুরবাটীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ভগ্ন দোলমঞ্চের স্তূপ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। বাটীর পূর্ব্ব দিকে ৺হরেকৃষ্ণ ঠাকুরের পুকুর আছে। উহাতে দাম, শ্যাওলা ও তারাজীর গাছ হইয়াছে; সামান্য জল আছে। বাটীর পশ্চিম দিকে আর একটি পুকুর আছে, দাম শ্যাওলার জন্য উহার জল দেখিতে পাওয়া গেল না;—ইহাকে লোকে ৺বলভদ্র বা বলরামের পুকুর কহে। পূর্ব্বে এই ঠাকুর-বাটীর চতুর্দ্দিকে বহু গোয়ালার বাস ছিল,—এখন ৩৪ ঘর গোয়ালা এই ক্ষুদ্র গ্রামে বাস করে।

৺হরেকৃষ্ণ ও ৺বলরাম সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে—কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী বল্লভপুর গ্রামের জনৈক কৃষক একদা রাত্রিকালে তাহার মটরের ক্ষেতে পাহারা দিবার সময় দেখিতে পাইল যে, জ্যোৎস্নালোকে দুইটি বালক তাহার ক্ষেতের মটরশুঁটি তুলিয়া খাইতেছে। ইহা দেখিয়া সে বালক দুইটির পশ্চাদ্ধাবন করিল। বালক দুইটি সরিষার ক্ষেতের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া পলাইল। কৃষক পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কানাইনগর গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, বালক দুইটি ৺হরেকৃষ্ণের ঠাকুরবাটীতে প্রবেশ করিল। কৃষক এই ঘটনা সকলকে বলিবার পর, পূজারি আসিয়া হরেকৃষ্ণ ও বলরামের মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে, বিগ্রহ দুইটির বস্ত্রে সরিষার ফুল ও মুখে মটরশুঁটির অংশ লাগিয়া আছে। এই সংবাদ উক্ত কৃষকের কর্ণগোচর হইলে, সে ভক্তিভরে কহিল যে, ঐ মটরশুঁটির ক্ষেত ও উহার ফসল ৺ঠাকুরের হইল। তৎপরে সে প্রতি বৎসর ঐ ক্ষেতের ফসল নিজ ব্যয়ে উৎপাদন করিয়া ঠাকুরের সেবার জন্য দিত।

হরেকৃষ্ণের মন্দিরের সিকি মাইল দূরে পশ্চিম দিকে একটি ধান্যের মাঠের অপর পারে হরেকৃষ্ণপুর গ্রাম আছে। তথায় কৃষ্ণসাগর নামক উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ সীতারামের

একটি দীঘি আছে। ইহার জলকর প্রায় ৬৫০×২২৫ হাত হইবে, এবং ইহাতে যথেষ্ট সুপেয় জল আছে। বর্ষার পঙ্কিল জলে যাহাতে দীঘির জল খারাপ না হয়, এজন্য দীঘিটি কাটাইবার সময় ইহার মাটী দূরে লইয়া গিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

তৎপরে হরেকৃষ্ণপুর হইতে পুনরায় কানাইনগরের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইয়া, দক্ষিণ দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল যাইয়া গোপালপুর গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রামটি সীতারামের দুর্গ হইতে প্রায় ১।০ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে সীতারামের উত্তরদ্বারী বুড়া শিবের মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ভগ্ন মন্দিরটির উপরের খিলান ও পূর্ব্ব দিকের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। মন্দিরের সম্মুখ দিকের দেওয়ালের ইটের উপর নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও কারুকার্য্য করা আছে। এখানে একটি প্রাচার-বেষ্টিত ঠাকুরবাটী ছিল। ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখের উঠানের উত্তর দিকে একটি ক্ষুদ্র করগেট টীনের ঘরে কৃষ্ণ-প্রস্তরের বুড়াশিব নামক শিবলিঙ্গ আছেন; আজিও শিবের পূজা হয়। বুড়াশিবের ভগ্ন মন্দিরে এক্ষণে বনজঙ্গল জন্মিয়াছে। বুড়া শিবের বাটীর পূর্ব্ব পার্শ্বে বুড়া শিবের পুকুর আছে, উহাতে সামান্য জল আছে।

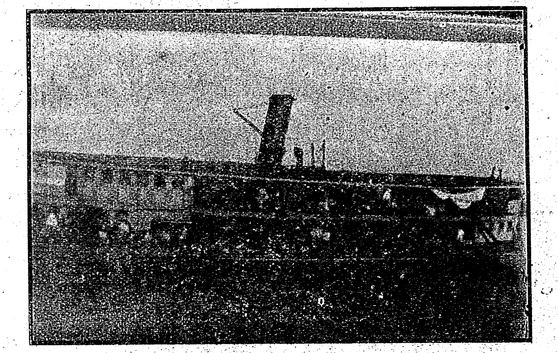

মহম্মদপুর হইতে ফিরিবার পথে ষ্টীমার "দেবলা"

বুড়া শিব দেখিয়া আমরা পূর্ব্বোক্ত বড় গড়ের পশ্চিম প্রান্তে নৌকায় উঠিয়া সীতারামের দুর্গের বেষ্টনী—ভিতরের গড় দেখিতে চলিলাম। বড় গড়ের প্রায় মাঝামাঝি আসিয়া মাধুর খাল দিয়া দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থিত কাতলাসুর বিলে পড়িলাম। তৎপরে বিলের মধ্যস্থ ধান গাছের মধ্য দিয়া লগি ঠেলিয়া পূর্ব্ব দিকে নৌকা চালাইলাম। অতঃপর কাতলাসুর বিল ছাড়িয়া, সীতারামের ভিতরের গড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণা দিয়া গড়ের ভিতরে প্রবেশ করিয়া, দুর্গের উত্তর দিকের গড়ের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। আমাদের ডাইন দিকে দুর্গ মধ্যে সীতারামের নয়া বাড়ী ও অন্যান্য কীর্ত্তি জঙ্গলাবৃত হইয়া আছে। ভিতরের এই গড় দুর্গের প্রত্যেক দিকে অনুমান সিকি মাইল দীর্ঘ ও ২০।২২ হাত প্রশস্ত হইবে; এবং ইহাতে অনুমান ৩।৩।০ হাত জল আছে। গড়ের দুই পাড়ে নানা প্রকার বৃক্ষলতা ও বনজঙ্গল জন্মিয়াছে এবং জলের মধ্যে হিজল ও যজ্ঞডুমুরের গাছ জন্মিয়া অপূর্ব্ব শোভা ও ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা এই ছায়া-সুশীতল জলের পথ দিয়া নৌকা বাহিয়া চলিলাম। দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আসিয়া পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড় দিয়া দক্ষিণ দিকে নৌকা চালাইলাম। এই পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড় দক্ষিণ দিকে অল্প দূর যাইয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে পূর্ব্ব দিকের ভিতরের গড়ের পূর্ব্ব দিকে ও পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়ের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ এই দুই গড়ের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডে সীতারামের পূর্ব্ববর্ণিত কানুনগো কাছারীর ভিটা আছে। তৎপরে আমরা পুনরায় উত্তর দিকে কিঞ্চিৎ ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্ব দিকের খোঁজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাঁকিয়া পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়ে প্রবেশ করতঃ দক্ষিণ দিকে চলিলাম। দক্ষিণ দিকে গড়ের অর্দ্ধেক দূর যাইলে, পূর্ব্ব-পশ্চিমে-দীর্ঘ ভূষণা যাইবার রাস্তা আছে। যেখানে এই রাস্তা পূর্ব্ব দিকের বাহিরের গড়কে অতিক্রম করিয়াছে, সেখানে রাস্তার উত্তর দিকে ও গড়ের পশ্চিম দিকের কোণায় সেনাপতি মেনাহাতীর পূর্ব্বোক্ত সমাধি আছে। এই স্থানে কালীগঙ্গা তটিনী মেনাহাতীর সমাধির পূর্ব্ব দিকে গড়ে আসিয়া মিশিয়াছে। ভূষণার রাস্তার দক্ষিণ পারে এই বাহিরের গড়ের যে অর্দ্ধাংশ দক্ষিণ

দিকে বাজার পর্য্যন্ত গিয়াছে, উহাতে জল না থাকায় আমরা এই স্থান হইতে ফিরিয়া পুনরায় ভিতরের গড় দিয়া দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে, যেখানে কাতলামুর বিলের সহিত গড়ের সংযোগ হইয়াছে, সেখানে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থান হইতে আমরা দুর্গের পশ্চিমের গড় দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিলাম। আমাদের বাম দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিকে বনজঙ্গলের মধ্যে সীতারামের অন্দরমহলের স্তূপ ও সাধুখাঁর পুকুর রহিয়াছে। এ গড়েও জলের মধ্যে হিজলাদি গাছ জন্মিয়া গড়টিকে ছায়াময় করিয়া



মহম্মদপুর—দক্ষিণের বড় গড়

রাখিয়াছে। তৎপরে আমরা দুর্গের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে আসিয়া দক্ষিণ দিকের ভিতরের গড় দিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিলাম। অবশেষে ৺রামচন্দ্রের পুকুরের পশ্চিম দিকে যেখানে এই গড় দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়াছে, সেই স্থানে আসিলাম; এই স্থানটিকে "রসের গলি" কহে। সীতারামের সময় এই স্থানে বেশ্যাদিগের বাস ছিল। এই স্থানটি রামচন্দ্রের পুকুরের পশ্চিম পাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই স্থান হইতে আর পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারা গেল না, কারণ, সে দিকের গড়ে নৌকা চলিবার মত জল নাই। সে জন্য এই স্থানে নৌকা হইতে নামিয়া, পদব্রজে গড়ের বাকী অংশ দেখিয়া, খিড়কী দ্বার দিয়া রামচন্দ্রের ঠাকুরবাটীতে ফিরিলাম।

মহম্মদপুরের সন্নিকটে সীতারামের আরও কতকগুলি কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। মহম্মদপুরের প্রায় তিন মাইল উত্তরে ধুলজুড়ি গ্রামের সন্নিকটে তাঁহার "চিত্ত-বিশ্রাম" নামক বাটিকার ভগ্ন প্রাচীর ও স্তূপ এবং তৎসংলগ্ন একটি পুকুর আছে। মহম্মদপুরের অদূরে সূর্য্য-কুণ্ডে তাঁহার গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানে তাঁহার গড়-বেষ্টিত বাড়ী ছিল। সীতারামের পতনের পরেও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ ও তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ এই স্থানে বাস করিতেন। মহম্মদপুর হইতে পশ্চিম দিকে অনুমান ১৷৷০ ক্রোশ দূরে মাগুরা যাইবার রাস্তার পার্শ্বে শ্যামগঞ্জ গ্রামে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যামসুন্দর বাস করিতেন। শেষোক্ত এই দুই স্থানে সীতারামের সময়ের বাটী, পুকুর ও গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। শ্যামগঞ্জের নিকটে ঘোষপুরে তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত দুইটি আখড়ার একটিতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের ও অপরটিতে গিরিধারী প্রভৃতির বিগ্রহ আছেন। মধুমতীর পরপারে পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে হরিহর-নগর গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক ভিটার ধ্বংসাবশেষ আছে; এখানেও তাঁহার গড়-বেষ্টিত বাড়ী ছিল। মহম্মদপুরের পূর্ব্ব দিকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে শেখর নামক স্থানে তাঁহার একটি দীঘি ও পুকুর প্রভৃতি আছে।

(৩)

ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, রাজা সীতারাম রায় কাশ্যপ-দাসবংশীয় উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। অনুমান ১৪০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার অধীন খড়গ্রাম থানার কুনিয়া বা কনে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে বাস করিতেন। সীতারামের বৃদ্ধ প্রপিতামহ হিমকর মুর্শিদাবাদে কল্যাণগঞ্জ থানার অধীন গিধনা গ্রামে বাস করিতেন। সীতারামের বংশ সম্বন্ধে ঘটকদিগের একটি ছড়া আছে—

"হাল বয় তাল খায় গিধনায় বাস।
তার ছেলে কায়েত হ'ল বিশ্বাস খাস॥"

হিমকরের পুত্র শ্রীরাম দাস নবাব সরকার হইতে "খাস বিশ্বাস" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীরামের পৌত্র উদয়নারায়ণ ফৌজদারের তহশীলদার রূপে ভূষণায় আসেন, এবং তিনি নবাব সরকার হইতে "রায়" উপাধি প্রাপ্ত

হন। এই উদয়নারায়ণের পুত্র সীতারাম। উদয়নারায়ণ মধুমতীর পরপারে হরিহর নগরে বাস স্থাপন করেন। আজিও তাঁহার বংশধরগণ তথায় আছেন। উদয়নারায়ণ এতদঞ্চলে যে সকল তালুক বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন, উহাই সীতারামের পৈত্রিক সম্পত্তি।

নবাব সায়েস্তা খাঁ কোন একটি বিদ্রোহ দমনের জন্য সীতারামকে নলদী পরগণা জায়গীর দিয়াছিলেন। যখন নবাব ইব্রাহিম খাঁ বঙ্গের সুবেদার ছিলেন, সেই সময় দিল্লীর বাদশাহের ও নবাবের সম্মতি অনুসারে চাকলা ভূষণার অনেক স্থান সীতারাম নিজ জমিদারীভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন; ও ক্রমে নদীবহুল সমুদায় ভূষণা পরগণা অধিকার করিয়াছিলেন। আধুনিক ফরিদপুর জেলা ও নলদী পরগণা লইয়া তৎকালের ভূষণা পরগণা গঠিত ছিল। "রিয়াজে" উল্লিখিত আছে যে, সীতারাম সমুদায় সরকার মামুদাবাদ দখল করিয়া লইয়াছিলেন। খুলনার শ্রীপুর অঞ্চলের অধিবাসী ঘোষবংশীয় বঙ্গজ কায়স্থ মুন্সীরাম রায় সীতারামের পরামর্শদাতা ছিলেন। রায়গ্রাম নিবাসী ঘোষ-বংশীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ রামরূপ ঘোষ—ডাক-নাম "মেনাহাতী"—সীতারামের সেনাপতি ও দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত দস্যু-সর্দ্দার বক্তার খাঁ, নিকারী জাতীয় ফকিরা মাছ-কাটা, নমঃশূদ্র জাতীয় রূপচাঁদ ঢালী, মোগল জাতীয় আমল বেগ—ডাক-নাম "হামলা বাঘা"—এবং ক্ষত্রিয় জাতীয় মুন্ময় নামক সীতারামের কয়েকজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বাগজানি মৌজায় খাল ও বিলের মধ্যে সীতারাম তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুরের পত্তন করেন, এবং ১৭০২—৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে রাজোপাধি গ্রহণ করেন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৩।৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পরে, ভূষণার ফৌজদার আবুতোরাপ সীতারামের নিকট কর চাহিলে, তিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাহার ফলে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে আবুতোরাপ প্রাণ হারাইলেন ও সমুদায় ভূষণার উপর সীতারামের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। আবুতোরাপের মৃত্যু-সংবাদে বিচলিত হইয়া নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারাম-দমন জন্য বক্সআলি খাঁকে ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সৈন্যসহ পাঠাইলেন; ও জমিদারদিগের উপর হুকুম দিলেন যে, কেহ যেন সীতারামকে কোন প্রকার সাহায্য বা সুযোগ না দেন ও সর্ব্বপ্রকারে ফৌজদারকে সাহায্য করেন। ফৌজদারের সহিত যে নবাবী বাহিনী চলিল, উহার সেনাপতি হইলেন সংগ্রাম সিংহ। নবাবের প্রিয়পাত্র ও সীতারাম-ধ্বংসের প্রধান উদ্যোগী, নাটোরের রাজা রামজীবন রায় নবাবের অনুমত্যানুসারে জমিদারদিগের আর একটি সৈন্যদল গঠন করিয়া, নিজ দেওয়ান তিলিবংশীয় দয়ারাম রায়কে উহার

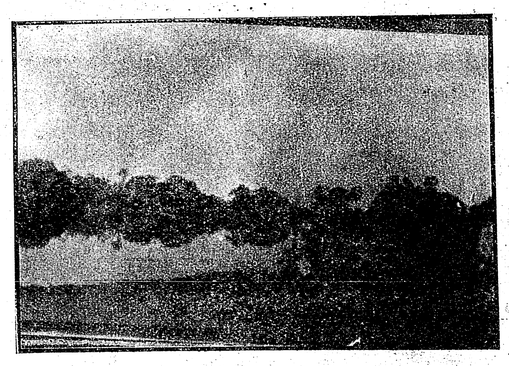

হরেকৃষ্ণপুরে কৃষ্ণসাগর।

পরিচালক করিয়া পাঠাইলেন। এই দয়ারাম রায় দিঘা-পতিয়ার জমিদারীর পত্তন করেন। বক্সআলি ভূষণায় পঁহুছিয়া সীতারাম কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ভূষণা অবরোধ করিয়া বসিলেন। এদিকে দয়ারাম ভিন্ন পথে আসিয়া মহম্মদপুরের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হইলেন। শ্রীযুত হরি-সাধন মুখোপাধ্যায়, তাঁহার "কলিকাতা—সেকালের ও একালের" নামক গ্রন্থে এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "যশোহর-খুলনার ইতিহাসে" লিপিবদ্ধ করিয়া-ছেন যে, দয়ারামের পরামর্শে গুপ্তঘাতকগণ মহম্মদপুর দুর্গের সেনাপতি মেনাহাতীর মুণ্ড কাটিয়া লইয়া পলায়ন করে ও সেই মুণ্ড মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট প্রেরিত হয়।

সেনাপতির মৃত্যু-সংবাদে সীতারাম দুর্গরক্ষার ভার অন্য সেনানীর হস্তে দিয়া, মহম্মদপুর দুর্গে চলিয়া আসিলেন। ক্রমে মহম্মদপুর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। তখন তিনি দুর্গ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক এরূপ আত্মীয়-স্বজন, ও কতক স্ত্রী-পুত্র গুপ্ত-পথে দুর্গের বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার কতক স্ত্রী-পুত্র কলিকাতায় আশ্রয় লইলেন। কথিত আছে যে, তাঁহার দ্বিতীয়া এবং প্রধানা মহিষী শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত দুর্গে ছিলেন। জনপ্রবাদ এই যে, তিনি সর্ব্বশেষে দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন, এবং জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য অন্যরূপ।

দুর্গ রক্ষা করা সম্ভবপর নহে বুঝিয়া, অবশেষে সীতারাম অবশিষ্ট সামান্য সৈন্য লইয়া দুর্গ ত্যাগ করতঃ, শত্রুব্যূহ ভেদ করিয়া, যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় বন্দী



মধুমতী-তীরে (এলেংখালী) ত্যক্ত প্রাচীন টেলিগ্রাফ কেবল্

হয়েন। কেহ কেহ বলেন যে, দয়ারাম তাঁহাকে বন্দী করিয়া নিজবাটী দিঘাপতিয়া হইয়া মুর্শিদাবাদ যাইবার পথে, তাঁহাকে কিছু দিন নাটোরের কারাগারে রাখিয়াছিলেন; পরে তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া, নবাব-সমীপে হাজির করিয়া দেন। কয়েক মাস মুর্শিদাবাদ কারাগারে থাকার পরে, তথায় সীতারামের মৃত্যুদণ্ড বা স্বাভাবিক মৃত্যু হইয়াছিল। "রিয়াজে" উল্লিখিত আছে যে, সেই বীরের মুণ্ড গোচর্ম্মে আবৃত করিয়া তাঁহাকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাঁহার ঝাড়ে-বংশে যে যেখানে ছিল, সকলকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল। আবার "তারিখ বাঙ্গালা" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, তাঁহাকে খুনে দেওয়া হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রাণদণ্ড হউক বা স্বাভাবিক মৃত্যু হউক, তাঁহার মৃত্যু মুর্শিদাবাদে হইয়াছিল বলিয়াই বিশ্বাস হয়। মুর্শিদাবাদে গঙ্গাতীরে তাঁহার শবদাহ ও তাঁহার পুত্র দ্বারা শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

সীতারাম ধৃত হওয়ার কালে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর শ্যামগঞ্জের বাটীতে ও দ্বিতীয় পুত্র সুরনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডের বাটীতে ছিলেন—তাঁহারা বন্দী হয়েন নাই বা পলায়ন করেন নাই। সীতারামের তৃতীয়া স্ত্রী, রামদেব ও জয়দেব নামক দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ও একটি শিশু কন্যা সহ পলায়ন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহারাই মহম্মদপুর হইতে পলায়ন করিয়া কলিকাতায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। নবাবের হুকুমে হুগলীর ফৌজদার কলিকাতার ইংরাজদিগের নিকট সীতারামের পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন চাহিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে ইংরাজগণ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ্চ তারিখে সীতারামের দুইটি শিশু পুত্র, একটি কন্যা, ছয়টি স্ত্রীলোক এবং চারিটি ভৃত্যকে হুগলীর ফৌজদার মীর বকীর খাঁর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সীতারামের প্রথম বিবাহ ভূষণার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী জনৈক মৌলিক কায়স্থ-কন্যার সহিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ বীরভূমের দশপলসা গ্রামের ঘোষ-বংশীয় সরল খাঁর কন্যা কমলার সহিত হইয়াছিল, এবং তিনিই প্রধানা মহিষী বলিয়া গণ্যা ছিলেন। কমলার গর্ভে শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ নামক সীতারামের দুইটি পুত্র হয়। সীতারামের তৃতীয় বিবাহ বর্দ্ধমানের পাটুলী গ্রামে হইয়াছিল। এই স্ত্রীর গর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামক পূর্ব্বোক্ত দুই পুত্রের জন্ম হয়, কিন্তু ইহাদের অকাল-মৃত্যু ঘটে। সীতারামের চতুর্থ স্ত্রী নওয়া রাণী বীরপুর গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

সন ১৩১১ সালের চৈত্র সংখ্যার "কায়স্থ পত্রিকা" হইতে সীতারাম সম্বন্ধে আরও কয়েকটি নূতন কথা জানিতে পারা যায়। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশ যে, "সীতারামের মাতার নাম দয়াময়ী। তাঁহার গর্ভে সীতারাম ও লক্ষ্মী

নারায়ণ নামক দুই পুত্র এবং রঙ্গিণী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়স্থ-সমাজের উন্নতিকল্পে চারিটি সমাজের মধ্যে বিবাহ করেন। তাঁহার প্রথম বিবাহ মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত দাসপলসা গ্রামের উত্তর-রাঢ়ীয় সরল খাঁ ঘোষের কন্যার সহিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহ অগ্রদ্বীপের সন্নিকটস্থ পাটুলী গ্রামের একটি উত্তররাঢ়ীয় কুলীন-কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়। তাঁহার তৃতীয় বিবাহ ভুলুয়া পরগণার ইদিলপুরের বঙ্গজ কায়স্থ রূপনারায়ণ গুহর কন্যার সহিত হয়। তাঁহার চতুর্থ বিবাহ জেলা যশোহরের রায় গ্রামের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের এক দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কন্যার সহিত হয়। এই কন্যা সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতীর আত্মীয়া। তাঁহার পঞ্চম বিবাহ পাবনা জেলার এক বারেন্দ্র কায়স্থ কন্যার সহিত সম্পন্ন হয়।

"রত্নেশ্বর ভট্টাচার্য্য সীতারামের শাক্ত কুলগুরু ছিলেন, এবং কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী তাঁহার বৈষ্ণব গুরু ছিলেন। তিনি বৈষ্ণব গুরুকে শান্তি ও দৈবকার্য্যের পরামর্শদাতা, এবং শাক্ত গুরুকে যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বিষয়ের পরামর্শদাতা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান ও ব্রাহ্মণ-চণ্ডালকে বিদ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া একই চক্ষে দেখিতেন। বিবাহে পণগ্রহণ প্রথা অশাস্ত্রীয় বলিয়া তিনি উহা উঠাইয়া দিতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি শত শত কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যার ভরণপোষণ করিতেন, কিন্তু কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহে কখন অর্থসাহায্য করিতেন না। এইরূপ একটি ছড়া আছে :—

কুলীনে কন্যার দায়ে গেলে রাজা পাশে।
সুবামনে কন্যা দেও বলে রাজা হাসে।
অর্থদানে মুক্তহস্ত কুলদায়ে নয়।
ঢালসড়কি গড়ে রাজা করে অর্থক্ষয়।

তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও মৌলবী পরিবৃত হইয়া শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিতেন। তিনি পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ হইতে বঙ্গোপসাগর এবং নদীয়া জেলার পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে বরিশাল জেলার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

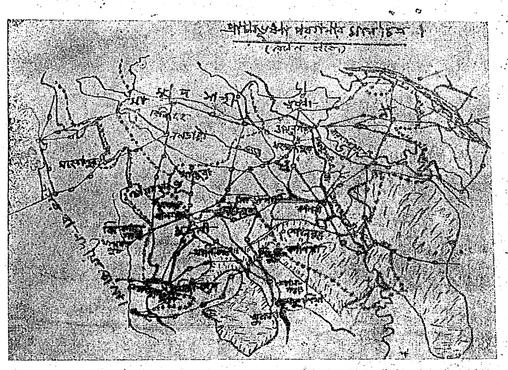

প্রাচীন ভূষণা পরগণার মানচিত্র (রেণেল হইতে)

"বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ সুচতুর মুনীরাম রায় এককালে সীতারামের দেওয়ান ছিলেন। নবাবের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য সীতারাম তাঁহাকে মুর্শিদাবাদে আপন উকীল নিযুক্ত করেন, এবং আপন পুত্রের সহিত মুনীরামের একটি কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন। ইহাতে মুনীরাম ক্রুদ্ধ হন। এই বিবাহের প্রস্তাব শুনিয়া মুনীরামের পুত্র আপন ভগিনীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়া, পিতার নিকট মৃত্যু সংবাদ পাঠাইলেন। সীতারামই তাঁহার কন্যার মৃত্যুর কারণ ভাবিয়া, মুনীরাম বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সীতারামের অভিসন্ধির সকল কথা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নাটোরের রাজা রঘুনন্দন মুনীরামের পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তৎপরে দয়ারাম রায় ও সংগ্রাম সিংহ সৈন্যসহ মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া, সীতারামের ধ্বংস-সাধন করিলেন।"

সীতারামের নিপাত সাধিত হইলে, চাকলা ভূষণা, যাহার অন্তর্গত নলদী, মকিমপুর ও সাতৈর প্রভৃতি পরগণা ছিল, উহা নাটোরের জমিদারীভুক্ত হইল। কথিত আছে যে, মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারামের ধনরত্ন নবাব সরকারে বাজেআপ্ত করিয়া লইয়া, সীতারাম-ধ্বংসের প্রধান উদ্যোগী আপন প্রিয়পাত্র নাটোরের রঘুনন্দনকে পুরস্কৃত করেন ও তস্য ভ্রাতা রামজীবনকে ভূষণার জমিদারী অর্পণ করেন। পরে এই সকল সম্পত্তি রামজীবনের পুত্র রামকান্তের স্ত্রী রাণী ভবানীর তত্ত্বাবধানে আসিয়াছিল।

তৎপরে ঐ সম্পত্তি উক্ত রাণীর পোষ্যপুত্র রামকৃষ্ণের দখলে আইসে। রামকৃষ্ণ একজন মহা শক্তি-উপাসক ও সাধক ছিলেন; এবং সর্ব্বদা হোম, যাগ, যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত থাকিতেন। ফলে, তত্ত্বাবধানের অভাবে ১৭৯৫ হইতে ১৮০২ খৃষ্টাব্দ মধ্যে তাঁহার বৃহৎ সম্পত্তির কতক কর্ম্মচারীবর্গ লুটিয়া খাইল, কতক নিলাম হইয়া গিয়া যৎসামান্য অবশিষ্ট রহিল। এই সময় চাকলা ভূষণা খণ্ড খণ্ড হইয়া পরগণায় বিভক্ত হইয়া নিলাম হইয়া গেল——একজন ক্রেতা নলদী, একজন সাতৈর, একজন মকিমপুর,—এইরূপ একজন এক একটি পরগণা খরিদ করিয়া লইলেন। নিজ মহম্মদপুরে ও উহার আশেপাশে এখনও নাটোরের জমিদারী আছে। নাটোরের রাজগণ মহম্মদপুরের রামসাগর প্রভৃতি ৺রামচন্দ্র জীউর দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; উহাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাজেআপ্ত করিয়া লয়েন ও পরে নাটোরের রাজাকে পুনরায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন।

পূর্ব্বে মহম্মদপুর ভূষণা পরগণার প্রধান সহর ছিল। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ মহামারী জ্বরে ইহা ধ্বংসপ্রায় হয়; পরে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের জ্বরে ইহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিন দিকে বিল ও এক দিকে মধুমতী নদী কর্ত্তৃক সুরক্ষিত দেখিয়া সীতারাম এই স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু কালে এই বিলগুলি অস্বাস্থ্যকর হইয়া যে ব্যাধির সৃষ্টি করিল, তাহাতেই আজি মহম্মদপুর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। শুধু সীতারামের দুর্গটিই মহম্মদপুর নহে; ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল, যথা, পূর্ব্ব দিকের নারায়ণপুর, পশ্চিম দিকের কানাইনগর, শ্যামনগর, গোকুলনগর প্রভৃতি গ্রাম এই মহম্মদপুরের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৪।৫ মাইল ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে প্রায় ৩।৪ মাইল স্থান জুড়িয়া মহম্মদপুর গঠিত ছিল; এক্ষণে ইহার মধ্যে অনেক পাড়া ও মৌজা হইয়াছে। এখানে ব্যাধির মধ্যে ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক,—আজিকালি কালা জ্বর দেখা দিয়াছে। কোন কোন সময় কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রকোপ হয়। এখানকার অধিবাসীগণ একটি ডাক্তারখানার অভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া থাকেন। এখানে একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ও ২।৩ জন কবিরাজ মাত্র আছেন। তাঁহারাই রোগের চিকিৎসা করেন।

সীতারামের দুর্গ মধ্যে এক্ষণে মাত্র ৫।৬ ঘর লোক অরণ্যবাস ও ম্যালেরিয়া ভোগ করেন। দুর্গের বাহিরে চতুর্দ্দিকে কোথাও বিল, কোথাও খাল ও মাঠ আছে। উহার স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। তথায় প্রধানতঃ কৃষিজীবীরা বাস করে। দুর্গ হইতে ১॥০ মাইল দূরে মধুমতী তীরে ষ্টীমার ঘাটের নিকটে কয়েক ঘর ভদ্রলোকের বাস আছে এবং একটি পুলিসের থানা ও একটি মাইনর স্কুল আছে। দুর্গের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৪০ ঘর ব্রাহ্মণ, ৭০ ঘর কায়স্থ, ৩ ঘর বৈদ্য, ও তিলি, শাঁখারী, যুগী, গোয়ালা, কর্ম্মকার, মালাকর, রাজবংশী নমঃশূদ্র মেথর এবং মুসলমান, কলু, মশালচী, সেখ, সৈয়দ ও পাঠানের বাস আছে। একটি পোষ্টাফিস আছে, উহা রামসাগরের তীরে অবস্থিত। উহারই পশ্চিম দিকে সরকারি ডাক বাঙ্গালা আছে।

এক্ষণে মহম্মদপুরে নাটোরের মহারাজার, দিঘাপতিয়ার রাজার, নলদী পরগণার জমিদার পাইকপাড়ার রাজাদিগের, সাতৈর পরগণার ।৵০ আনার মালিক শ্রীমতপুরের গোস্বামীদিগের, ঐ পরগণার ৵০ আনার মালিক মুর্শিদাবাদের রাজা বিজয়সিংহ ধুধুরিয়ার, ঐ পরগণার ॥০ আনার মালিক পাবনা জেলার পার্শ্বডাঙ্গার সাহা চৌধুরীদিগের ও নড়াইলের রায় বাবুদিগের অংশ আছে। এতন্মধ্যে নাটোরের আয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

"বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি Proceedings of the Controlling Council of Revenue at Murshidabad" নামক দ্বাদশ খণ্ড গ্রন্থে দরখাস্ত ও পত্রাদির নকল প্রকাশ করিয়াছেন। উহা হইতে জানা যায় যে, রাণী ভবানীর সময়ে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজগণ নাটোরের জমিদারী ও অন্যান্য রাজাদিগের জমিদারী সমূহ হইতে অত্যধিক হারে কর আদায় করিতেছিলেন, সেই সময় রাজসাহীর সুপরভাইজরের সহকারী গ্লাডউইন সাহেব মহম্মদপুরে থাকিয়া মহম্মদপুরের ও নলদী পরগণার বাঙ্গালা ১১৭৮ সনের কর আদায়ের হিসাব দিতেছেন।"

শুনা যায় যে পূর্ব্বে মহম্মদপুরে ২॥০।৩ লক্ষ লোকের বাস ছিল। এখন আর সীতারামের সে মহম্মদপুর নাই।

সে নিত্য নব-প্রদেশ-জয়ের ও যুদ্ধের উত্তেজনা, সৈনিকদিগের উৎসাহ-কোলাহল, হস্তীর বৃংহতি-ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা-রব, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, কামানের বজ্র-নির্ঘোষ আর নাই। সে শিল্প-কলা, শাস্ত্র-চর্চ্চা, নিত্য-নব-উৎসব, সে সকলের আর কিছুই নাই। নবাবের অনুচরবর্গ এবং ভ্রাতৃঘাতী স্বদেশদ্রোহীদিগের দ্বারা সীতারামের সর্ব্বনাশ সাধিত ও মহম্মদপুর শৃঙ্খলিত হইলে, মহম্মদপুরের ভাগ্য-লক্ষ্মী ধীরে ধীরে বিদায় লইলেন। মহম্মদপুরের গৌরব-রবি অস্তমিত হইতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মহামারী রূপী মহাকালের কটাক্ষে নিভিয়া গেল। এখন মহম্মদপুরের শ্মশানে আছে ধ্বংসের মহান্ দৃশ্য—ভগ্ন-মন্দির, শুষ্কপ্রায় জলাশয়, বন-জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ, ও ম্যালেরিয়া। আর আছে দারুণ নিস্তব্ধতার মধ্যে দিবসে পক্ষীর কূজন, রাত্রে গভীর ঝিল্লিরব, মশক-গুঞ্জন, পেচকের কর্কশ ধ্বনি, ব্যাঘ্র ও সর্পের গর্জ্জন এবং শৃগালের আর্ত্তনাদ। আজিকার মহম্মদপুর লুব্ধ পথিকের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। আজিও মহম্মদপুরের সর্ব্বাঙ্গে রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের কঠিন পদাঙ্ক অঙ্কিত রহিয়াছে।

মহম্মদপুরে সীতারামের কীর্ত্তিগুলির অধিকাংশই এক্ষণে নাটোরের সাহিত্যসেবী ও স্বদেশহিতৈষী মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের সম্পত্তি। মহারাজা যদি সীতারামের ধ্বংসোন্মুখ দেবালয় ও গৃহাদির সংস্কার করিয়া, তথায় পুনরায় বিগ্রহগুলিকে স্থাপন করিয়া সীতারামের কীর্ত্তিসমূহ বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে স্বদেশভক্ত বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন। এখন সর্ব্বাগ্রে সীতারামের ধ্বংসোন্মুখ কীর্ত্তিগুলির এখনও যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা যে-কোন প্রকারে হউক বজায় রাখা কর্ত্তব্য। এজন্য দেশবাসীর নিকট হইতে চাঁদা উঠাইবার প্রয়োজন হইলে, সংবাদপত্রসেবীদিগের অবিলম্বে তাহা করা কর্ত্তব্য।

আমরা মহম্মদপুরে তিন রাত্রি বাস করিয়া চতুর্থ রাত্রে কলিকাতা প্রত্যাগমন জন্য যখন রাত্রি ৯॥০ টার সময় বোয়ালমারীগামী ষ্টীমার ধরিতে যাইব, তখন পথে ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে থাকায়, অগত্যা একঘণ্টা কাল বিলম্ব করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু এই বিলম্বের জন্য ষ্টীমার ধরিতে পারিলাম না। সে রাত্রি ষ্টীমার ঘাটের নিকটে জনৈক ভদ্রলোকের বহির্ব্বাটীর ছেঁচা বেড়ার ঘরে কোন প্রকারে কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া, রাত্রি ৩॥০ টার সময় খুলনা গামী "দেবলা" নামক ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া, পরের দিন আঠারবেঁকী নদী দিয়া চলিয়া সন্ধ্যার পরে খুলনা ঘাটে পঁহুছিলাম। সেই রাত্রেই খুলনা সহর ঘুরিয়া দেখিয়া রাত অনুমান ১০ টার ট্রেণ ধরিয়া পরদিন প্রাতে কলিকাতায় পঁহুছিলাম।

মহম্মদপুরে থাকিবার কালে নাটোর এষ্টেটের নায়েব মহাশয়, জমানবীশ ও সুমারনবীশ মহাশয় এবং পোষ্ট মাষ্টার মহাশয় যেরূপ যত্ন ও সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিয়াছেন, তাহা আজিকালিকার দিনে বিরল। আমরা এজন্য তাঁহাদিগের নিকট এবং ৺রামচন্দ্র জীউর বাটীতে আশ্রয় পাওয়ার জন্য নাটোরের মহারাজা বাহাদুরের নিকট কৃতজ্ঞ আছি।

—গত চৈত্র মাসের ভারতবর্ষের ৫১৯ পৃষ্ঠার বামদিকের স্তম্ভে আমার শুনিবার ভুলের জন্য প্রকাশিত হইয়াছে যে মহম্মদপুরের বাজারের পশ্চিমে দক্ষিণদিকের যে গড় আছে, উহার দক্ষিণ পাড়টি নলদীর জমিদারের অর্থাৎ পাইকপাড়ার রাজ-বংশের সম্পত্তি। সম্প্রতি নাটোরের মহারাজার মহম্মদপুর কাছারির নায়েব মহাশয় পত্র লিখিয়া উক্ত ভ্রম ধরিয়া দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে উক্ত পাড়টি নাটোরের মহারাজার সম্পত্তি এবং তাঁহার দখলে আছে। পাঠকগণের বিদিতার্থে ইহা প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলাম। ইতি—

আমার বাড়ী

শ্রীমানকুমারী বসু

১

আমার বাড়ী কোথায় দেবি, সুধাও ফিরে ফিরে,
বাড়ী আমার অনেক দূরে—সে "মাতৃ-মন্দিরে"।
দেখ্‌লে সে মন্দিরের ছবি,
নীরস পরাণ হয় যে কবি,
শুভ্র-সমীর আতর মেখে সদাই চলে ধীরে।
আমার ঘরে আমার ছাতে,
তপন এসে সুপ্রভাতে,
ছড়িয়ে দেন যে আঁজল ভরি মণি-মুক্তা হীরে;
সোণার বরণ তরুর শাখে,
কোকিল, শ্যামা, দোয়েল ডাকে,
ঝরিয়ে পড়ে সুধার ধারা মন্দাকিনী-নীরে
বাড়ী আমার কাঞ্চনজঙ্ঘা—স্বর্গ-গঙ্গা-তীরে।

২

আমার বাড়ী নিত্য সাঁঝে নীল চাঁদোয়া তলে
সোণার শশী উজ্‌লে হাসি, হীরকের ফুল জ্বলে!
কভু আবার কাদম্বিনী,
সাথে সখী সৌদামিনী,
ঢালেন হেসে সলিল-ধারা আকাশ পড়ে গ'লে!
ভীষণ-ভীষণ বজ্র রবে,
চম্‌কে উঠে প্রাণী সবে,
অমর-অসুর কামান দাগে স্বর্গে রণস্থলে;
প্রবল ধারা, বসুন্ধরা কোথায় ভেসে চলে!

৩

আমার বাড়ী থাকেন লক্ষ্মী নারায়ণের সনে;
চৌদিকে তাই ধানের গোলা, ঘেরা তুলসী বনে।
মা ভারতীর বীণার রাগে,
কালিদাস, মাঘ নিত্য জাগে,
মধু, হেম, আর বঙ্কিম, নবীন—গায় গোবিন্দ সনে।
আমার ঘরে অন্নপূর্ণা
সদাই অমৃতান্ন-পূর্ণা,
মুখটি চেয়ে ভিখারী শিব রহেন ত্রিলোচনে!
ছুটিয়া আসে বালক-বালা,
লুটিতে মা'র প্রসাদ-ডালা,
অন্ধ আতুর মা'র দুয়ারে আসে প্রতিক্ষণে;
এমনি মহোৎসবে রহি আমার নিকেতনে!

৪

তার পরে যা, মনের কথা বলি তোমার সনে—
এই টুকুনি দয়া কোরো কেউ যেন না শোনে—
আমার বাড়ী—মায়ের কোলে
আমারি মা'র স্নেহাঞ্চলে,
ছিল যে এক সত্য যুগে, এই ভব ভবনে।
শুধুই স্নেহামৃত মাখি,
রাখিতেন মা আমায় ঢাকি,
ছিল না কো জানা-শুনা দৈন্য অভাব সনে!
যে দিন ছাড়ি গেলেন মা,
সেই থেকে আর কিছুই না,
গৃহহীন উদাসীন আমি ভ্রমি অনুক্ষণে;
এখন কুড়াই অভিশাপ,
বিরক্তি, দুর্গতি চাপ,
বিশ্ব আমার জীর্ণারণ্য মায়েরি বিহনে!
যশোর, খুলনা, কলিকাতায়,
আমার বাড়ী নাই কো কোথায়,
নাই বাঙ্গালায়—নাই ভারতে—নাই মর্ত্ত্য ভুবনে!
এখন যে মা শ্মশান-কালী
আমায় ডাকেন সদাই খালি,
দিবেন আমায় "আমার বাড়ী" তাঁরই শ্রীচরণে!
শুন্‌লে "আমার বাড়ীর" কথা, বুঝ্‌লে চন্দ্রাননে?

পিয়ারী

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল

৭

জল্পনা করিতে করিতে দুইটা দিন কাটিয়া গেল। বাহির হইবে ভাবিয়া অমল যেই গৃহের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়, অমনি কোথা হইতে যেন কারা আসিয়া তার দুই পা জড়াইয়া ধরে, বলে, ছি, কোথায় যাও? সেই নির্লজ্জা অভিসারিকার কবলে গিয়া পড়িলে লাঞ্ছনার যে আর সীমা থাকিবে না!...অমলও দুশ্চিন্তার ভারে পীড়িত হইয়া ঘরের দ্বারে বসিয়া পড়ে, আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবে, —দিনের সূর্য্য মাথার উপর দিয়া মধ্যগগনে উঠিয়া আবার কখন্ তাহি মাঝে শ্রান্তিভরে লোহিত কিরণচ্ছটায় ভরা দুই হাত বাড়াইয়া পশ্চিমের আকাশে ঢলিয়া পড়ে...! তৃতীয় দিনে কিন্তু এ-সব বাধা-নিষেধ জোর করিয়া ঠেলিয়া সে পথে বাহির হইয়া পড়িল—কিসের লাঞ্ছনা! লাঞ্ছনা করে, করুক!...তা বলিয়া পরের আংটি নিজের কাছেও এমন করিয়া আর রাখা চলে না! কি সে ভাবিতেছে!

অমল সেদিন সহরের পথে পথে ঘুরিয়া দুই-চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া একটা প্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুকিয়া কয়-পা চলিয়া নির্দ্দেশ-মত যে-বাড়ীটার সাম্‌নে দাঁড়াইল,—বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখে, সে যেন এক রাজার প্রাসাদ! ফটক-ওয়ালা বাড়ী,—রাস্তার ধারে দোতলায় দীর্ঘ বারান্দা—বারান্দার বাহারে থামের বুক চিরিয়া পরীর মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে—আর সেই সব পরীর হাতে একটা করিয়া বিচিত্র গাছের ডাল, ডালে নানা লতা-পাতার আবরণের মাঝে টক্‌টকে লাল গোলাপ—আর সেই গোলাপের পাপড়ির মাঝখানে ইলেক্‌ট্রিকের বাতি লাগানো। ফটকে একটা দরোয়ান বসিয়া আছে। অমল গিয়া ভয়ে ভয়ে দরোয়ানকে প্রশ্ন করিল,—এ বাড়ীতে পাপিয়া বিবি থাকে?...

দরোয়ান অমলের বেশভূষা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। এই দীন-বেশ ছোকরাটাও পাপিয়া বিবির সন্ধান করে! সে অমলের পানে তাকাইয়া আবার চোখ ফিরাইয়া নিজের মনে গুখা তৈরী করিতে লাগিল। অমল কহিল,—বল্‌ না দরোয়ানজী, পাপিয়া বিবি এখানে থাকে? এই তাঁর বাড়ী?

দরোয়ান তাচ্ছল্যভরে কহিল,—হাঁ, হাঁ...বিবির কাছে কি দরকার?

অমল বলিল, সে কাশীপুরের বাগান হইতে বিবির কাছে আসিয়াছে—জরুরী খপর আছে। কাশীপুরের বাগান শুনিয়া দরোয়ান আর-একবার অমলের পানে চাহিয়া তাকে ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল; পরে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সে গিয়া এত্তালা দিল পাপিয়ার খাস-দাসী রঙ্গিণীর কাছে—রঙ্গিণী তখন পাণগুলা সাজিয়া রাখিবার উদ্যোগ করিতেছে। দরোয়ানের কাছে শুনিয়া সে ভিতরের একতলার ঘর হইতে জানলা দিয়া একবার বাহিরে উঁকি পাড়িয়া দেখিল, পরে দরোয়ানকে বলিল,—আচ্ছা... দরোয়ান খড়ম-পায়ে খট্‌খট্ করিতে করিতে বাহিরে আসিয়া নিজের টুলে বসিল, এবং অমলকে বলিল,—খপর ভেজা... অমল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রঙ্গিণীর কিন্তু বিবিকে খপর দেওয়ার অবসর মিলিল না। গুপী-বেয়ারাটা কাল রাত্রে আহার সারিয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া সেই যে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, আজ বেশ বেলা হইলেই ফিরিয়াছে; ফিরিয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে! কৈফিয়ৎ দেওয়া দূরের কথা, রঙ্গিণীর সঙ্গে দেখাও করে নাই। তার এত-বড় অপরাধের কৈফিয়ৎ লইবার উদ্দেশে রঙ্গিণী তাই পাণ চিবাইতে চিবাইতে রণ-রঙ্গিণীর মূর্ত্তি ধরিয়া গুপীর ঘরের দিকে চলিল।

অমল সেই পথে দাঁড়াইয়াই আছে! ভিতর হইতে কোন আহ্বান নাই, একটা সাড়া অবধি নাই! পথে কত লোক চলিয়াছে। বহুক্ষণ এমনি দাঁড়াইয়া সে এই লোক-চলাচল দেখিল—পরে হঠাৎ হুঁস হইল, তাইতো, বহুক্ষণ সে দাঁড়াইয়া আছে...হুঁস হইতেই সে দরোয়ানের দিকে

চাহিল, দরোয়ান তখন কি একখানা বই লইয়া সুর করিয়া পড়া সুরু করিয়াছে।

অমল ডাকিল,—দরোয়ানজী, ও দরোয়ানজী...

বিরক্ত হইয়া দরোয়ান মুখ তুলিল। অমল কহিল,—খপর তো এলো না!...আর একটিবার যাও না...

দরোয়ান কহিল,—সময় হইলেই খপর আসিবে। বিবি এখন গোসল করিতেছেন কি না.....

অমল বিরক্ত হইল; একবার ভাবিল, চলিয়া যায় —আবার পরক্ষণেই মনে হইল, এতখানি পথ আসিয়া আংটি ফেরত না দিয়াই চলিয়া যাইবে, সে-ও তো ভালো কথা নয়! সে দরোয়ানের দিকে চাহিল—দরোয়ান তখন আবার বইয়ের পড়ায় মনঃসংযোগ করিয়াছে। সে তখন দরোয়ানের তোয়াক্কা না রাখিয়া তার অলক্ষিতেই আগাইয়া ফটকে ঢুকিল। ফটক পার হইয়া একটা বড় উঠান—উঠানের চারি-ধারে ঘরের শ্রেণী, উপরে দোতলায় বারান্দা, বারান্দার কোলে ঘর। উপরের ঘর হইতে বাদ্যের ঝঙ্কার ভাসিয়া আসিতেছে। অমল উঠানে দাঁড়াইয়া চারিধারে একবার চাহিল।

দাঁড়াইবার একটু পরেই একটা স্ত্রীলোক ঘরের মধ্য হইতে কহিল,—কে গা?

অমল চারিদিকে চাহিল,—কিন্তু কে যে কোথা হইতে কথা কহিল, তার কিছুই দেখিতে পাইল না। সেই স্বর লক্ষ্য করিয়াই সে জবাব দিল,—কাশীপুরের বাগান থেকে আমি আসছি—পাপিয়া বিবির কাছে একটু দরকার আছে।

ঘর হইতে জবাব আসিল,—তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন! ঐ ডাইনে সিঁড়ি—সেই সিঁড়ি ধরে দোতলায় যান্—দেখা হবে।

অমল আর অপেক্ষা না করিয়া ডাহিনের সিঁড়ি ধরিয়া একেবারে দোতলায় গিয়া উঠিল। দোতলায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, বারান্দার দাঁড়ে একটা প্রকাণ্ড কাকাতুয়া, আর একটা ভৃত্য সেই কাকাতুয়াকে খাবার দিতেছে। বারান্দায় অমলকে দেখিয়া ভৃত্যটা তার পানে চাহিল—অমল তাকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিল। ভৃত্য আসিলে অমল কহিল,—পাপিয়া বিবিকে একবার খপর দাও তো...আমি কাশীপুর থেকে আসছি।

ভৃত্য জবাব দিবার পূর্ব্বেই ঘর হইতে কে কহিল,—কে রে বিট্টু...?

অমল সে স্বর চিনিল—স্বর পাপিয়ার।

বিট্টু একটু সরিয়া গিয়া কহিল,—একঠো বাবু আয়ছে, কাশীপুরসে..!

ঘরের মধ্য হইতে পাপিয়া কহিল,—কে বাবু রে?

কথার সঙ্গে সঙ্গেই পাপিয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। অমল বিস্মিত দুই চোখ তুলিয়া দেখে সাম্‌নে রূপের প্রতিমা! মাথায় কোন আবরণ নাই, স্নানের পর দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশের রাশ পিঠের উপর এলানো, টক্‌টকে লাল-পাড় শাড়ী-খানি পরা...অপরূপ রূপসী পাপিয়া তার সাম্‌নে! যেন বহু আঁধার রাত্রির পর ধরাতলে মূর্ত্তিমতী ঊষার এই প্রথম উদয়...! পুলকের দীপ্তির মত, বিস্ময়ের মত পাপিয়া আসিয়া তার সামনে দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া পাপিয়া কহিল,—তুমি...? কবি...?

অমলের বিস্ময় তখনো তাকে এমনি আবিষ্ট রাখিয়াছিল যে, সে কথা কহিয়া উত্তর দিতে পারিল না। সে কেমন মোহাচ্ছন্নের মতই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাপিয়া আসিয়া অমলের হাত ধরিল, কহিল,—এসো। এবং অমলের দিক হইতে কোন সাড়া উঠিবার পূর্ব্বেই পাপিয়া অমলের হাত ধরিয়া একেবারে তাকে লইয়া আপনার ঘরে গিয়া ঢুকিল। পরিপাটী সজ্জিত ঘর; বিলাসের সর্ব্ব-উপাদানই সে ঘরে যথাস্থানে সংরক্ষিত। পাপিয়া শয্যার উপর অমলকে বসাইয়া নিজে মেঝের বিছানায় তার পায়ের কাছে বসিল, এবং অমলের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল,—আমার এখানে...হঠাৎ?...মনে দয়া হলো বুঝি...?

অমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে ঘরটার চারিধারে চাহিয়া পাপিয়ার পানে চাহিল। সে বিদ্যুতের তীব্র হল্‌কা ত এর কোথাও নাই,—কথায় বিদ্যুতের সে গর্জ্জন নাই, দৃষ্টিতেও সে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ নাই! অমল বলিল—একটু দায়ে পড়েই আমি এসেছি—বলিয়া সে পকেট হইতে আংটিটা বাহির করিয়া পাপিয়ার হাতে দিয়া কহিল,—এই আংটিটা সেদিন আমার ঘরে ফেলে এসেছিলে...তাই এটা দিতে এসেছি।

পাপিয়া আংটিটা হাতে লইয়া দেখিল, কহিল,—

এ তুচ্ছ জিনিসটা কি এমন কাঁটার মত ফুট্‌ছিল...না হয়, এটা রেখেই দিতে!...কোনো দিন যদি সেই একটা রাত্রির কথা মনে পড়তো...! তাছাড়া এ আংটি আমি ফেলেও আসিনি তো—রেখে এসেছিলুম।...আমার একটু স্মৃতি মাত্র...তাও সহ্য করতে পারলে না!

পাপিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিল; নিশ্বাস ফেলিয়া তখনি বলিল,—তুমি যে আমার কি করেছ, তা তুমি জানো না, আর তা বুঝতেও পারবে না...এই আমার বড় দুঃখ!...তোমার জন্যে যে কখনো এমন হবো, এ কথা দুদিন আগে এমন অসম্ভব ছিল, যে, সে বলবার নয়!...তোমার কি আছে...? যা আমি চাই, যার নেশায় এতকাল মাতাল হয়ে আছি—তার কিছুই তোমার নেই! তবু তোমার জন্যে এমন হয়েছি যে, পাগলের মত সে-রাত্রে তোমার কাছে ছুটে গেছলুম...! এই তো এত বিলাস ঐশ্বর্য্য দেখচো...এ সব আমার,—তবু তুমি যদি আদেশ কর তো এই দণ্ডে তুচ্ছ ধূলার মত এ-সব ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে চলে যেতে পারি—যেখানে নিয়ে যাবে...বিজন বনে, মরুর প্রান্তে,...এমন কি মরণের বুকে পর্য্যন্ত!—এখন বুঝলে?

অমলের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। সে-রাত্রের যে-উচ্ছ্বাসটাকে সে চরিত্রহীনা নারীর সুরার-নেশার প্রলাপ ভাবিয়া কতক নিশ্চিন্ত ছিল, এখন দেখিল, সেটা নেশা নয়! পাপিয়া নেশা করে নাই...যা বলিতেছে, তা বেশ বুঝিয়াই বলিতেছে!...কিন্তু এ যে আগাগোড়া কি বিশ্রী, কি কুৎসিত! তার সমস্ত মন যেন এ কথায় কালো হইয়া গেল! এ যেন জাগিয়াও সে স্বপ্ন দেখিতেছে! পাপিয়াও বেশ সুস্থ চিত্তেই কি-সব প্রলাপ বকিতেছে...!

অমল উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—ও-সব কথা বলো না আর। ও-সব শোনবার আকাঙ্ক্ষাও আমার নেই...আর কেনই যে তুমি বল...

পাপিয়া বিদ্যুতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল; অমলের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,—কেন বলি, তা বোঝো না, এইতেই আরো আমি ভেঙ্গে যাই!...শোনো বলি, আমি যা বলছি, এ খেয়ালের ঘোর নয়! ক'দিন কেবল এই কথাই ভাবচি...কিছু ভালো লাগচে না। যাদের নিয়ে মত্ত ছিলুম, কাণের কাছে অহর্নিশি যারা স্তব-স্তুতি শোনায়, যে স্তব-স্তুতির নেশায় বিভোর ছিলুম, সেও ভালো লাগে না আর—তাদেরো ক'দিন কাছে ঘেঁষতে দিইনি...তারা আকুল হয়ে চলে গেছে...অনেক দুঃখ জানিয়ে গেছে, ...তবু টলিনি! আর তুমি...?

পাপিয়া অমলের পানে চাহিয়া রহিল। অমল কহিল,—কিন্তু কেন এ পাগলামি করছো! আমি পথের কাঙাল...আমায় কেন যে এ-সব বলছো! দু'বেলা আমার অন্নও ভালো করে জোটে না যে...

পাপিয়া কহিল,—কেন এত দুঃখ পাও তুমি...? এ শুনলে আমার বুক ফেটে যায়! আমি এখানে সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছি—আর তুমি...

অমল কহিল—কিন্তু তোমার এ আকুল হওয়াও যে পাগলামি! আমি কোথাকার কে...তা'ছাড়া এ পৃথিবীতে কত দুঃখী গরিব কাঙাল আছে, যারা আমারি মত—আমার চেয়েও অসহায়...তাদের কথা ভেবেছ কখনো...?

পাপিয়া কহিল—না,...অত কথা ভাববোই বা কেন!

অমল কহিল—তবে আমার জন্যেই বা...

পাপিয়া কহিল—চুপ কর! অমন করে বলো না আর। তোমার জন্যে কি, আর কেন যে এ আকুল হওয়া, তা তুমি বুঝলে এমন করে হতাশ্বাসে আমায় জ্বলে মরতে হতো না...! আমি যা দেখেছি...তোমার নির্ম্মল অনুরাগ, নীরব ধ্যান, আশ্চর্য্য প্রীতি...তাতে আমি পাগল হয়ে উঠেছি। আমি আর কিছু চাই না, অমনি করে আমার জন্যে একটুও যদি ভাবতে..আমার জন্যে ভেবে যদি একটা নিশ্বাসও ফেলতে...তাহলে আমি হাসি-মুখে এই দণ্ডে মরতে পারতুম!...পাপিয়া ক্ষণেক থামিল; থামিয়া নিশ্বাস লইয়া আবার বলিল,—আরো দুঃখ এই যে, যার ধ্যানে তুমি এমন তন্ময়, সে যে কত বড় হতভাগী, কত বড় পাপিষ্ঠা, কত বড় শয়তানী...

বাধা দিয়া অমল কহিল,—থাক্। ও-সব কথায় আমার কোন দরকার নেই। সে শয়তানীই হোক, আর পাপিষ্ঠাই হোক, আমার তাতে কিছু এসে যাবে না।

পাপিয়া কহিল—কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে।... সে এই—এ জেনেও তার কথা তুমি ভাববে—তারই ধ্যানে কবিতা লিখবে...! কখনো না।

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল; বুঝিল, কথা-কাটাকাটি

করিয়া কোন লাভ নাই, ফলও নাই! সে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—আমি তাহলে উঠি...অনেক দূর যেতে হবে...

পাপিয়া কহিল—না, রসো,...একটু বসো। যাবেই তুমি, জানি—ধরে রাখবো না আমি। ধরে রাখবার স্পর্দ্ধাও আমার নেই! কিন্তু তার আগে একটা কথা আছে...

অমল কহিল—কি?

—একটু বসো...আমি এখনি আসছি। ভয় নেই, তোমায় খেয়ে ফেলবো না।...আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত বসবে তো? এইটুকু দয়া...

অমল কহিল,—আচ্ছা, বসছি।

পিয়ারী বাহির হইয়া গেল। অমল ঘরের চারিধারে চাহিয়া দেখিতে লাগিল—এ যে রাজার ঘর! কি-সব জিনিস, কি সব আসবাব-পত্র...! সে যে কল্পনাতেও এমন পারিপাট্য, এমন সজ্জার কথা ভাবিতে পারে নাই কোন দিন!

পাপিয়া তখনই ফিরিল...তার হাতে রূপার রেকাবিতে জল-খাবার। শয্যার পাশে একটা টিপয়ের উপর রেকাবি রাখিয়া সে রূপার গ্লাসে জল গড়াইয়া টীপয়ে রাখিল; তার পর অমলকে কহিল—ওঠো দিকি...

অমল নির্ব্বাক বিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। পাপিয়া কহিল,—হাত-মুখ ধোবে এসো...বলিয়া অমলকে লইয়া পাশের বাথ-রুম দেখাইয়া দিল এবং নিজের হাতে জল লইয়া তার পায়ে ঢালিয়া দিল। পাপিয়া তার পায়ে হাত দিয়া পা রগড়াইতে গেলে, অমল তার হাত ধরিল, কহিল—ও কি হচ্ছে? ছি!

পাপিয়া আকুল নেত্রে অমলের পানে চাহিয়া বলিল—একটা সাধ পোরাতে দাও...লক্ষ্মীটি, তোমার পা ক্ষয়ে যাবে না এতে..

অমল দ্বিরুক্তি করিল না। পাপিয়া অমলের পা ধুইয়া জলের পাত্র অমলের হাতে দিয়া বলিল—মুখ-হাত ধোও... ঐখানে সাবান আছে—হাতটি সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলো। বলিয়া সে ঘরে আসিল,—আসিয়া দেরাজ খুলিয়া খোপ-দোস্ত তোয়ালে বাহির করিয়া আবার বাথ-রুমের দ্বারে ফিরিল। অমলের তখন হাত-মুখ ধোওয়া হইয়া গিয়াছে। তোয়ালেয় হাত-মুখ মুছিয়া ঘরে ফিরিয়া সে শয্যায় বসিল। পাপিয়া তোয়ালেখানা লইয়া কহিল,—এমনি বেহুঁস, পায়ে জল রয়েছে যে—বলিয়া তোয়ালে দিয়া অমলের দুই পা মুছাইয়া দিল, তার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—এবার কিছু মুখে দাও দিকি...অনেক বেলা হয়েছে। কিছু ফেলতে পাবে না!

অমল পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—সেদিন অমন করে আশ্রয় দিয়েছিলে—তার দরুণ কৃতজ্ঞতাও কি একটু প্রকাশ করবো না!... তুমি এ পুরীতে এসেছ, এই যে ঢের! এ যে আমার ধ্যানের অতীত!...নাও, এখন খাও—খেতেই হবে—নাহলে যেতে পাবে না—ছাড়বো না আমি!...খাও... আমি পাণ সেজে দি...বলিয়া সে বাহিরে গেল ও পর-মুহূর্ত্তেই একটা দাসী আসিয়া পাণের বাটা প্রভৃতি রাখিয়া গেল। পাপিয়াও তখনি ঘরে ফিরিয়া মেঝেয় বসিয়া পাণ সাজিতে লাগিল—অমল নিরুপায়ভাবে রেকাবিখানা হাতে তুলিয়া লইল।

আহারের পর পাপিয়া পাণ দিতে গেলে অমল কহিল,—আমি তো পাণ খাই না।

পাপিয়া কহিল,—খাও না?

অমল কহিল,—না।...বলিয়া হাসিল, হাসিয়া আবার কহিল—বলে, অন্ন জোটাই ভার—তার উপর আবার পাণ...।

পাপিয়া বিদ্যুৎ-ভরা দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিল, কহিল,—বেশ, তবে দুটী মশলা দি, খাও...

অমল কহিল—না, পাণই দাও। এক দিন নয় বাবুই সাজা যাক্...

অমল পাণ লইয়া মুখে দিল, কহিল,—তাহলে এবার উঠি...।

পাপিয়া কহিল,—কি করে এলে এখানে...?

অমল কহিল—তার মানে?

পাপিয়া কহিল—হেঁটেই...?

—তা না তো কিসে আবার আসবো?

পাপিয়া কহিল,—কিন্তু হেঁটে ফেরা হবে না। গাড়ী ডাকিয়ে দি', গাড়ী করে যাও...

অমল কহিল,—কোনো দরকার নেই গাড়ীর।

ভগবান পাদুটোর সৃষ্টি করেছেন যে, সে তো চলার জন্যেই...

—তা বলে এতখানি পথ!—পাপিয়া শিহরিয়া উঠিল, কহিল,—তা হবে না। এখান থেকে গাড়ী করেই ফিরতে হবে। এর পর পায়ের সদ্ব্যবহার করো সেখানে গিয়ে, আমি বাধা দিতে যাবো না...

অমল ভৃত্যকে ডাকিয়া গাড়ী আনিবার আদেশ দিল। তখনি গাড়ী আসিল। গাড়ী আসিলে অমল যেমন বাহির হইবার উদ্যোগ করিবে, অমনি পাপিয়া কহিল,—দাঁড়াও...বলিয়াই সে গিয়া দেরাজ খুলিল। এবং একটা রেকাবিতে কয়টা টাকা ও আংটিটা তুলিয়া অমলের পায়ের কাছে রেকাবি রাখিয়া প্রণাম করিল, প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—ওগুলি নিতে হবে।...

অমল সবিস্ময়ে পাপিয়ার পানে চাহিল। পাপিয়া কহিল,—না হলে আমি পূজোর ফল পাবো না। অতিথি দেবতা, তাকে পূজা-অর্ঘ্য না দিলে পূজারীর পূজা নিষ্ফল হয়!...কেন আমার পূজোটাকে নিষ্ফল করবে...সে কি ভালো হবে?

—কিন্তু আংটি...?

—আংটি তো আমি রেখেই এসেছিলুম। ও আর ঘরে ফিরে নেবো না—নিলে পাপ হবে।...ইচ্ছা হয়, রেখো, না হয় গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ো...ঘরের পাশেই তো গঙ্গা!... কোনো দুঃখ থাকবে না।

এ নারী, না, প্রহেলিকা! অমল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর পাপিয়া টাকা কয়টা ও আংটিটা অমলের পকেটে ফেলিয়া দিল।

অমল আপত্তি করিল না; দ্বারে পা দিয়া একবার সে শুধু ফিরিয়া চাহিল, কহিল,—তোমায় আমায় কিন্তু এই শেষ দেখা!—আর কখনো...

পাপিয়া কহিল,—যেতে মানা করছো?...বেশ, তাই হবে। পাপিয়ার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। অমল চাহিয়া দেখে, পাপিয়ার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। সে নিঃশব্দে নীচে নামিয়া গাড়ীতে গিয়া বসিল, বসিয়া বাড়ীটার পানে ফিরিয়া চাহিলও না! যদি চাহিত, তাহা হইলে দেখিত, সেই পরী-ওয়ালা বারান্দায় পাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে—চোখে-মুখে সুগভীর বেদনা মাখিয়া!

গাড়ী চলিয়া গেলে পাপিয়া ঘরে আসিয়া বিছানায় অমল যেখানে বসিয়াছিল, সেইখানটার আর্ত্ত দীর্ণ মন লইয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল। তার দুই চোখে শ্রাবণের ধারা ঝরিল।

৮

ভালো লাগে না, ভালো লাগে না, কিছুই আর ভালো লাগে না। বাড়ী, ঘর, বাগান, দাস-দাসী, ঐশ্বর্য্য...প্রেমের গান, এই মিনতি, আবেদন, বেশ-ভূষা...এ-সব একেবারে তিক্ত হইয়া উঠিল। বিছানায় পড়িয়া পাপিয়া তার নিরাশ ব্যথিত চিত্তকে পাঠাইয়া দিত, দূর বিজন বনান্তরালে, সেই জীর্ণ গৃহের মাঝে...যেখানে সেই খোলা জানলা, আর বাহিরে জানালার নীচে দিয়া নদী বহিয়া চলিয়াছে, ওপারে সেই ছায়ারেখার মত অস্পষ্ট কল্পলোক...আর ঘরের মধ্যে ধ্যান-রত কবি কার ধ্যানে বসিয়া কবিতা লিখিতেছে, জগতের কোন বস্তুতে তার কোন কামনা নাই, কোন বাসনা নাই, জগতের পানে ফিরিয়াও সে দেখিতে জানে না,...দেখিবার তার অবসরও নাই।...মানগোবিন্দ আসিয়া ফিরিয়া যায়, স্তাবকের দল ভৎর্সনা খাইয়া সরিয়া পড়ে!...নির্ম্মম অবহেলার ঘা খাইয়া পাপিয়ার ব্যথিত চিত্ত যখন শ্রান্ত হইয়া সেই জীর্ণ বিজন ঘর হইতে ফিরিয়া আসে, তখন কি হাহাকারেই যে প্রাণ তার ভরিয়া যায়!...

পাপিয়া সেদিন দলিতা ভুজঙ্গিনীর মত শয্যায় উঠিয়া বসিল—চোখের দৃষ্টিতে কোথা হইতে রাজ্যের জ্বালা আসিয়া মিশিল। শয্যা হইতে উঠিয়া সে বাহিরের পানে চাহিল... চপলা! ঐ শয়তানী রাক্ষসীই তো তার সুখের পথে কাঁটার পাহাড় রচিয়া রাখিয়াছে...! কি মোহে, কি মন্ত্রেই যে সে অমলকে ভুলাইয়াছে...অথচ তার পাশে পাপিয়া...

পাপিয়া হাসিল। তুচ্ছ একটুকরা কাচের মোহে ভুলিয়া কি রত্নই অমল পায়ে ঠেলিতেছে!...

পাপিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। কাছেই চপলার বাড়ী। ভৃত্যকে দিয়া গাড়ী ডাকাইয়া তখনই সে চপলার গৃহে চলিল।

বিছানায় পড়িয়া চপলা নিবিষ্ট মনে একখানা বই পড়িতেছিল,—সঙ্গে সঙ্গে হাত-পাও বিচিত্র ভঙ্গীতে নাড়িতেছিল। পাপিয়া ঘরে ঢুকিয়া ডাকিল—চপলা দিদি...

বই রাখিয়া চপলা কহিল,—কে...? ইস্, পাপিয়া যে! হঠাৎ...? কি খপর?

পাপিয়া কহিল,—তুমি যে একা আছ...? ভৃঙ্গরাজ কৈ...?

চপলা কহিল,—একাই আছি। থিয়েটার থেকে ওরা ভারী ধরেছে। তাদের কথা কিছুতেই ঠেলতে পারলুম না। তারা এই নতুন বই খুলছে—সীতার বনবাস। তা আমায় ভারী ধরেছে, অন্ততঃ প্রথম রাত্তিরটাতেও যেন সীতা সাজি। তাই সীতার পার্টটা দেখে নিচ্ছি...

পাপিয়া কহিল,—ভৃঙ্গরাজ অনুমতি দেছে...?

চপলা কহিল—অনুমতি দেবে কি! আমার যা খেয়াল হবে, তাই করবো। তাতে ভৃঙ্গরাজের বাধা দেবার ক্ষমতা থাকতে পারে কখনো?

পাপিয়া হাসিয়া কহিল,—তা বটে!

চপলা কহিল—বোস্ না ভাই। আর এই ক'খানা পাতা আছে—পড়ে নি।...

পাপিয়া বসিল। তার হাসি মুহূর্ত্তে ম্লান হইয়া গেল। ...ওরে কুহকিনী, ওরে ছলনাময়ী অভিনেত্রী,—শুধু স্বরের ভঙ্গীতে কৃত্রিম সুরে আর কৃত্রিম হাবে-ভাবে...তার কি স্বর্গই তুই ছিনাইয়া রাখিয়াছিস্! নিজে তুই সে স্বর্গ জানিলি না, জানিবার প্রবৃত্তিও নাই তোর...তবু তোরই জন্য পাপিয়া আজ পথের কাঙাল...তার দুর্ভাগ্যের আজ আর সীমা নাই...!

চপলা বই পড়িতে লাগিল, আর পাপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাকে দেখিতে লাগিল। বই পড়া শেষ হইলে চপলা কহিল,—তার পর, খপর কি? হঠাৎ মনে পড়লো যে?

পাপিয়া কহিল,—হঠাৎ আমি আসিনি। একটু দরকারেই এসেছি।

চপলা কহিল,—কি দরকার, শুনি?

পাপিয়া কহিল,—তোমায় সেই বলেছিলুম, মনে আছে...আমাদের কাশীপুরের বাগানের কাছে একটি ছোকরা থাকে, তোমার উদ্দেশে কবিতা লেখে...?

চপলা একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল,—হ্যাঁ। তা কি করতে হবে শুনি?

পাপিয়া কহিল—বেচারী কি-রকম পাগল যে তোমার ধ্যানে...তা এক দিন তাকে দেখতে চল না!

চপলা কহিল—আমার তো মাথা খারাপ হয় নি যে চিড়িয়াখানা দেখতে যাবো...

পাপিয়া কহিল—না ভাই, অমন করে বলো না তুমি ...আমার কিন্তু দেখে ভারী মায়া হয়েছে তার উপর...

চপলা হাসিয়া কহিল,—দেখিস, যেন স্বয়ংবরা হোস্নে। বেচারা মানগোবিন্দ তাহলে পাগল হয়ে যাবে...

পাপিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল! সে ভাগ্য যদি তার হইত!

চপলা কহিল,—চুপ করলি যে!...কি ভাবছিস?

পাপিয়া কহিল,—ভাবচি, তুমি কি নিষ্ঠুর!...আহা, কবে থিয়েটারের সেই বিজ্ঞাপনের কাগজে তোমার কি ছবি বেরিয়েছিল···সেখানিকে কেটে খাতায় এঁটে রেখেছে,—সেই ছবিরই কি আদর!...আমি মরছি, সত্যি, তোমার ভৃঙ্গরাজের চেয়েও ঢের-বেশী কামনার ধন...

চপলা কহিল,—তোরও দেখচি নেশা লেগেচে যে!... দূর!···তুই দেখিস্ নে কখনো, ছাখ্—ও-সব নভেলের প্রেম আমার ঢের দেখা আছে।...তা তুই যদি তার যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হোস্ তো তাকে একটা ভালো উপদেশ দিস্ দিকি। তাকে কাজকর্ম্ম করতে বলিস্, ফুড়ের মত ও-সব ছাই-ভস্ম লিখে কোনো তো ফল নেই!...হুঁ, থিয়েটারে থাকতে কত লোকের কত চিঠিই যে পেতুম... কেউ লিখতো তুমি আমার মাথার মণি,...কেউ লিখতো আমার সাধের সাধনা, শূন্য জীবন-বিহারী! কেউ লিখতো, আমার নিষ্কাম ভালবাসা, শুধু দেখেই খুসী হবো! ...ষ্টেজে ফুলের তোড়া পড়লো তারিফ করে,—দেখি, তার মধ্যে মস্ত চিঠি—কি কাঁদুনি আর কি মিনতিতেই তা ভরা!...চপলাসুন্দরী তো কচিখুকী নয় যে ওতে ভুলবে— দু ছত্র চিঠিতে কি চার ছত্র কবিতায়!···বলে, অত বড় জহরৎওলা যে মাধোরাম—তারি একমাস টাকা পেশ করতে দেরী হতে বললুম, পথ ছাখো!...

পাপিয়া কোন কথা কহিল না, চপলার পানে চাহিয়া স্থির হইয়া তার কথা শুনিতেছিল।

চপলা কহিল,—আর এক মজার গল্প বলি, শোন্। সে এই বছর-খানেকের কথা। একটা সামাজিক নাটকে পার্ট করেছিলুম,—এক বৌয়ের। বৌটো স্বামীর হাতে নিত্যি মার খায়,—কাঁদলে ওদিকে শাশুড়ী-ননদ হুঙ্কার দিয়ে

এসে পড়ে, খবর্দ্দার হারামজাদী, বাড়ীতে চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস্!...বৌটোর কোন সুখ নেই! এক দিন বৌটোর শরীর খারাপ ছিল বলে পাতে দুটী ভাত ফেলা গেছলো, এইতে শাশুড়ী তাকে খুব গাল দিয়ে অনেক রাত্রে পথে বার করে সদর-দোর বন্ধ করে দেয়। শীতকাল— বেচারী তো শীতে কেঁপে সারা! তবু শাশুড়ী দোর খোলে না। ...পাড়ার একটি ছেলে তাকে নিজেদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেয়! পরদিন তার মা এসে শাশুড়ী-মাগীকে যাচ্ছে-তাই করে, বৌকে ঘরে দিয়ে যায়। বৌয়ের কিন্তু দুর্দ্দশার সীমা রইল না। ননদ কুচ্ছো করিতে লাগলো।—স্বামীর অত্যাচার চার-পো বাড়লো, আর জটিলে-শাশুড়ী রাম-রাজত্বি সুরু করলে। তখন সেই পাড়ার ছেলেটি তাদের বাড়ী-চড়াও হয়ে তাকে রক্ষা করতে আসতো!···বৌটো তাকেই একমাত্র বন্ধু বলে ভাবতো।...একদিন স্বামীর মার খেয়ে বৌটি হঠাৎ অজ্ঞান হতে সেই ছেলেটি এসে ধমকে বলে, সবাইকে পুলিশে দেবে!···এমনি অত্যাচারে-অত্যাচারে বৌটি মর-মর, শেষে মৃত্যুর সময় সেই ছোকরাও এলো। তা মরবার সময় বৌটি শুধু বলে গেল— ভালোবাসার কাঙাল হয়ে মলুম—একটু ভালবাসাও যদি পেতুম...ছেলেটির পানে চেয়ে তার হাতখানি চেপে ধরে একরকম তারি কোলে মাথা রেখে সে মলো!...তা ভাই, এই বৌয়ের পার্টটিও প্লে করা, অমনি ছোকরার দল চিঠি পাঠাতে লাগলো—ওগো, আমি ভালবাসবো গো—কি-দুখে ভালোবাসার কাঙাল হয়ে তুমি মরবে, এমনি!···সব কাব্য করছেন! ষ্টেজের ঐ রঙ-চঙ আর ঢঙে ওঁরা ভুললেও, আমরা ও-সব ফাঁকা কথায় ভুলি কখনো! হায় রে!

পাপিয়া অবাক হইয়া চপলার কথা শুনিতেছিল। তার এই অবহেলা-উপেক্ষার কথাগুলা পাপিয়ার প্রাণে পাথরের কুচির মত আঘাত করিতেছিল! চপলা শুধু টাকাটাই চিনিয়াছে—আর ঐ টাকার পিছনে তার যে প্রেমের উচ্ছ্বাস—সেটা কি পঙ্কিল গন্ধে ভরা, কি স্বার্থের বিষেই যে জড়ানো! আহা, অমল...বেচারা!...নিজের মনে শুধু সে কবিতা লেখে—কোন দিন চপলাকে দেখিবে বলিয়া তো তার ঘরের দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, পাওয়ার কামনা, সে তো দূরের কথা।

পাপিয়ার হঠাৎ মনে হইল,—সে তো চপলাকে দেখিতে চায়, চপলাও দেখা দিবে না! তা, এই তো থিয়েটারে 'সীতার বনবাস' অভিনয় হইবে, আর চপলা সে বইয়ে সীতা সাজিবে! অমলকে এ খপর দিলে সে হয়তো সীতার বনবাস দেখিতে আসে—অমনি চপলাকেও একবার চোখে দেখিতে পায়!

সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনার কথাও তার মনে জাগিল। অমল যা চায়,...পাপিয়া তাকে তাহারি সন্ধান দিবে... তার পর চপলার পরিচয়ও যাহাতে সে ভালো করিয়া পায়, তাও করিবে...তাহা হইলেও কি চপলার প্রতি এ অন্ধ উন্মত্ত আবেগ তার আর থাকিতে পারে কখনো!... তার উপর যখন অমল জানিবে, অমলের সুখের জন্য পাপিয়াই এই থিয়েটার দেখার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে—তা জানিয়া যদি কোন দিন.....

পাপিয়া কহিল,—তোমাদের এ বই কবে খুলবে?

চপলা কহিল,—কবে আবার! আস্চে শনিবারে! রাস্তায় বড় বড় কাগজ মেরে দেছে, দেখিস্ নে? এই যে কালই রাত্রে আমি দেখছিলুম, ইডন্ গার্ডন্ থেকে ফেরবার সময়...বড় বড় অক্ষরে লেখা সীতার বনবাস, আর তারি ঠিক তলায় লাল কালিতে সীতা—শ্রীমতী চপলাসুন্দরী···কেবল এক রাত্রির জন্য···

কথাটা বলিয়া উচ্ছ্বসিত আনন্দে চপলা পাপিয়ার পানে চাহিল।

পাপিয়া কহিল—না ভাই, আমি অত নজর করিনি। তা বেশ, আজ তাহলে উঠি। তোমায় বিরক্ত করবো না... তুমি তোমার পার্ট ছাখো...

চপলা কহিল,—আর এক দিন আসিস্ না...পাপিয়া! দুপুরবেলায়...মানগোবিন্দ যখন আপিসে থাকে...

পাপিয়া হাসিল, হাসিয়া কহিল,—তোমার ভৃঙ্গরাজ চটে যাবে না?

চপলা তাচ্ছল্যের ভরে কহিল,—চটুক্ গে! মেড়ো কোথাকার!...কি বলবো, পয়সা দেয় বহুৎ, না হলে ওরা কি মানুষ, না, প্রাণে কোনো সখ আছে!...

পাপিয়া কহিল,—নেমকহারামি করো না। যা চাইছো, তাই তো দিচ্ছে...

চপলা কহিল,—তা দেবে না তো কি! আমার একটা কথা, একটুকরো হাসির দাম যে লাখ টাকা!...

ব্যাটা কাপড় বেচে কত লাখ টাকাই যে করেছে... তা যাক্ ও সব কথা। থিয়েটার দেখতে যাবি তো?

—নিশ্চয়। কত দিন বাদে তুমি নাবছো।...তোমার ভুঙ্গরাজ কটা বক্স নিচ্ছে?

—একটা নিয়েছে।...মানগোবিন্দকে বলিস্ না, একটা বক্স নিতে...

—সে আর আমায় বলতে হবে না—নিজে থেকেই নেবে'খন।...সত্যি ভাই, আমরা যাদের চাই না, তারাই আমাদের ঘিরে থাকে সর্ব্বক্ষণ...আর যাদের চাই... পাপিয়ার স্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। সে একটা নিশ্বাস ফেলিল।

চপলা কহিল,—তারা কি...?

পাপিয়া স্বপ্নাভিভূতের মত কহিল,—তারা যে কত দুর্লভ, কত দূরের...

চপলা কহিল,—তোর কি হয়েছে বল্ তো পাপিয়া? ...তুই কি চাস,—যা পাস না...? মানগোবিন্দর দৌলতে তোর অভাবটা কি, শুনি? ও-রকম বেইমানী কথা বলিস্ নে।—এই যে সেদিন বলে গেলি, তোর কোন অভাব নেই—তবে...?

পাপিয়া ঈষৎ আত্মজ্ঞাতভাবে কতক মৃদু কণ্ঠে কহিল,—সেদিন কি জানতুম যে সত্য অভাব কাকে বলে...সত্য পাওয়াটাই বা কি...! তার পর আর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—তা হলে আজ আসি ভাই ...তুমি পার্ট দুরোস্ত কর। (ক্রমশঃ)

নিখিল-প্রবাহ

শ্রীসৌরেন্দ্রচন্দ্র দেব বি-এস্‌সি

নূতন টেলিফোণ



নূতন টেলিফোণ (গৃহকর্ত্তা বাটী ফিরিয়া সংবাদ গ্রহণ ক'রছেন)

সম্প্রতি য়ুরোপের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে একটি নূতন রকমের টেলিফোণ উদ্ভাবন ক'রেছেন, যেটি একজন লোকের বক্তব্য গ্রহণ ক'রে অন্য লোককে সেই সংবাদ শুনিয়ে, আবার তা'র উত্তর গ্রহণ ক'রে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে সেই উত্তর শুনিয়ে দেয়। বাটীর বাহিরে যাবার সময় গৃহকর্ত্তা নিজের অনুপস্থিতি ইত্যাদি এই টেলিফোণ-যন্ত্রে বলে গেলে, যদি কোন ব্যক্তি সেই সময়ে তাঁকে টেলিফোণ করে, তবে টেলিফোণই সেই ব্যক্তিকে বাটীর লোকের অনুপস্থিতির খবর দিয়ে তার কি প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে, এবং সেই সংবাদ গৃহকর্ত্তা ফিরে এলে তাঁকে প্রদান করে। এই যন্ত্রটীর আকার অনেকটা প্রাচীন ধরণের টেলিফোণের মতো।

বুদ্ধির মাপকাটি

কোনও ছাত্র স্কুল বা কলেজের পরীক্ষা শেষ ক'রে যখন উচ্চ বিদ্যা লাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী হয়, তখন তার বুদ্ধিবৃত্তির ও চিন্তাশক্তির কতটা উন্নতি হয়েছে তা' নিরূপণ ক'রবার একটি সুন্দর উপায় কয়েকজন বৈজ্ঞানিক মিলিত হয়ে উদ্ভাবিত করেছেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা পরীক্ষা ক'রবার জন্য তাদের কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। যদি বুদ্ধির মাপকাটিতে নিরূপিত সময়ের



বেতারে নিপুণতা (বেতারে নিপুণতার পরীক্ষা দেবার পর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতার বিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)

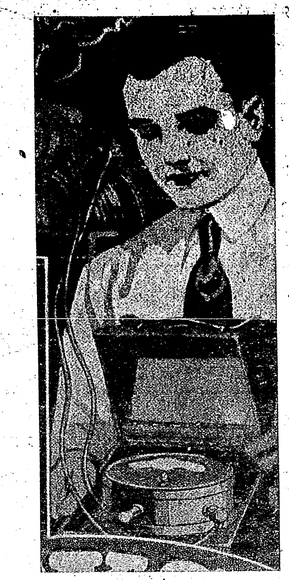

জড় পদার্থ বিদ্যার উৎকর্ষতা (জড়পদার্থ বিদ্যার উৎকর্ষতার পরীক্ষা দেবার পর ইনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জড়-বিজ্ঞান বিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)



চিন্তাশক্তির পরীক্ষা (চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা পরীক্ষা দেবার পর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)



অঙ্কশাস্ত্রে নিপুণতা (অঙ্কশাস্ত্রে নিপুণতা সিদ্ধান্ত হ'বার পর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ত্তবিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)



বুদ্ধির মাপকাটি (বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা পরীক্ষা দেবার পর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে ভর্ত্তি হবার অনুমতি পেয়েছেন)

মধ্যে উত্তর পাওয়া যায়, তবেই সেই ছাত্র উচ্চ বিদ্যালাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। অনেক সময় কেবল তাদের চিন্তাশক্তি দেখেও তাদের উচ্চবিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করা হয়।



কীটের ছল (কীট নিজের জীবনকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা ক'রবার জন্য নিজের গাত্রের বর্ণ বৃক্ষকাণ্ডের মতো ক'রে বৃক্ষকাণ্ডে নিজেকে লুক্কায়িত রেখেছে)



পতঙ্গের ছলনা (পতঙ্গ শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য নিজের গাত্রের বর্ণ বৃক্ষপত্রের মতো তৈয়ারী করে নিজেকে তার মধ্যে লুক্কায়িত রেখেছে)

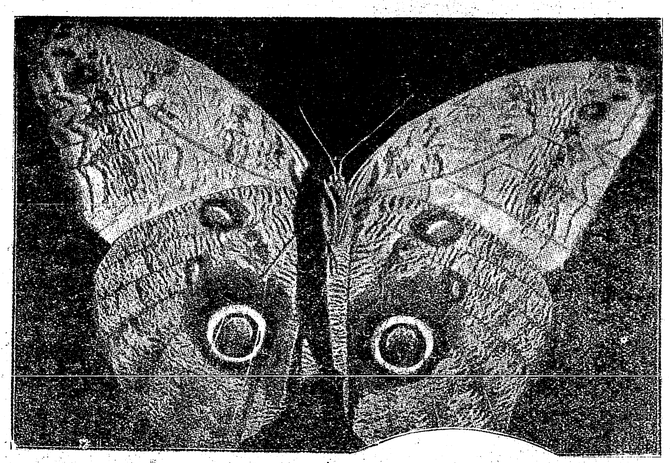

প্রজাপতির কারচুপি (পেচকের নিকট হতে আত্মরক্ষা ক'রবার জন্য প্রজাপতি নিজের ডানার উপর কৃত্রিম চোক তৈয়ারী ক'রে ডানাটিকে পেচকের মুখের মতো তৈয়ারী ক'রে রেখেছে)

প্রকৃতির ছল

অসহায় দুর্ব্বল ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে শত্রুর করাল কবল হ'তে রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতি অনেক প্রকার ছলনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি ঐ সকল প্রাণীর কাহারও গাত্রের বর্ণ বৃক্ষকাণ্ডের মতো, আবার কাহারও বা শুষ্ক বৃক্ষ-শাখার মতো ক'রে রেখেছেন। সুতরাং তারা নিজেদের গাত্রের বর্ণ বৃক্ষপত্র, বৃক্ষ-কাণ্ড বা শাখার সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে থেকে শত্রুর শ্যেন-দৃষ্টিকে অনায়াসে ফাঁকি দিতে পারে।

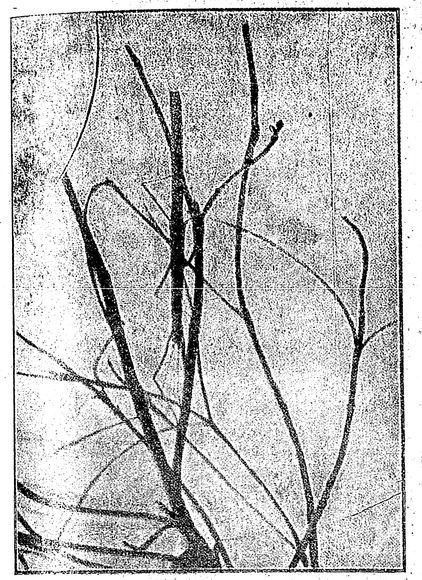

পতঙ্গের কারচুপি (পতঙ্গ বৃক্ষশাখার মতো নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গাত্রের বর্ণ তৈয়ারী করে একেবারে নিখুঁতভাবে তার ভিতরে লুকিয়ে আছে)

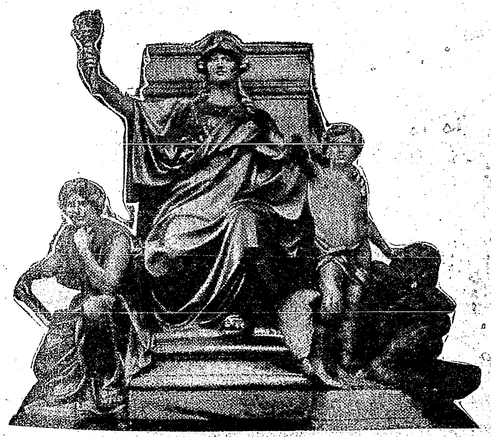

জ্ঞানের আলোক (কলম্বাসের প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে)

জ্ঞানের আলোক

প্রসিদ্ধ ভাস্কর আরন্যাল্‌ডো জোসি (Arnaldo Jocehi) তাঁর সুহস্তরচিত এক সুন্দর ভাস্কর্য্য দ্বারা কলম্বাসের (Columbus) অমরত্বকে আরও গৌরবান্বিত ক'রে দিয়ে গেছেন। কলম্বাসের প্রতিমূর্ত্তির পাদদেশে বিজ্ঞানের একটি কল্পিত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে তিনি জগৎকে দেখিয়ে গেছেন যে, কলম্বাসের পুরুষকারের নিকট বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে হাসিমুখে বর্ত্তিকা ধ'রে তাঁকে ধীরে ধীরে সুদূরের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

প্রাণীতত্ত্ব-বিজ্ঞানে নারী

লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বেকার প্রাচীন যুগের প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রবার জন্য একজন নারী বৈজ্ঞানিক অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রছেন। সম্প্রতি একটী তৈলের খনি খনন ক'রতে ক'রতে কতকগুলি প্রস্তরীভূত প্রাণীর অস্থি পাওয়া গেছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ এইগুলিকে বহু প্রাচীনকালের বলে সনাক্ত ক'রেছেন। এই নারী বৈজ্ঞানিক এখন এইগুলির পরীক্ষা ক'রছেন।



প্রাণীতত্ত্ব বিভাগে নারী (নারী বৈজ্ঞানিক প্রস্তরীভূত অস্থিগুলির পরীক্ষা ক'রছেন)

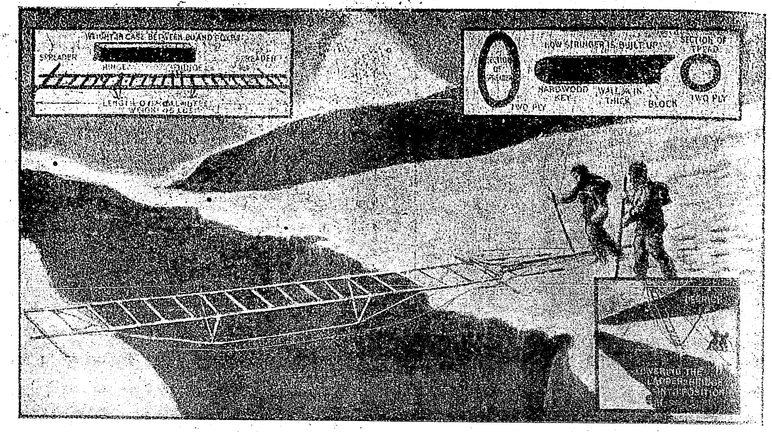

গৌরীশৃঙ্গে অভিযান (বৃহৎ বৃহৎ গর্ত্ত পার হবার সময়কার একখানি চিত্র)

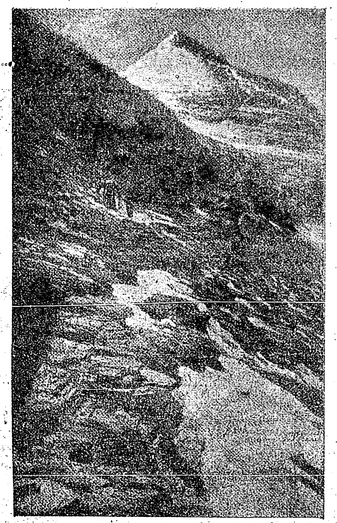

মরণের দ্বারে অভ্রভেদী গৌরী শৃঙ্গের নিকটবর্ত্তী একটি শৃঙ্গের উপর "ক" চিহ্নিত স্থানে বৈজ্ঞানিকগণ উপনীত হয়ে বিশ্রাম ক'রছেন)

গৌরীশৃঙ্গে অভিযান

গৌরীশৃঙ্গে অভিযান ক'রে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নিজেদের জ্ঞান-প্রীতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই অভিযানে তাঁদের জীবন কিরূপ বিপন্ন হয়েছিল, তা' শুন্‌লে দেহ কণ্টকিত হয়ে ওঠে। তাঁরা অভিযানে কৃতকার্য্য না হলেও গৌরীশৃঙ্গের এত নিকটে গিয়েছিলেন যে, তাঁরা ভিন্ন আজ পর্য্যন্ত আর কেহই ততদূর উঠতে পারেন নি। এই অভিযানের প্রধান উদ্যোগী কয়েকজন নেতা এই চেষ্টায় তাঁদের প্রাণ হারিয়েছেন।

দেহজাত বৈদ্যুতিক শক্তি

সম্প্রতি কয়েকজন বৈজ্ঞানিক একটি তথ্য আবিষ্কার ক'রেছেন যে, মানুষের হৃৎপিণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ক'রে সেই বৈদ্যুতিক শক্তি মানবের শরীরে সঞ্চারিত করে। পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্য সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য তাঁরাএকটি খুব সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ম্মাণ করেছেন, যেটা মানবের শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার নির্দ্দেশ করে। এমন কি এই যন্ত্রের দ্বারা হৃৎপিণ্ডে ও দেহের অপরাপর কোনও অংশে কণামাত্র তাড়িৎশক্তি উৎপাদিত হ'চ্ছে কি না তা'ও নিরূপণ ক'রা যেতে পারে।



দেহজাত বৈদ্যুতিক শক্তি (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আরম্ভ করবার পূর্ব্বে যন্ত্রটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখ্‌ছেন)

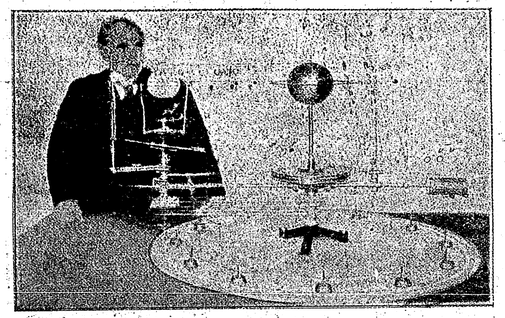

কৃত্রিম সৌরজগৎ (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে কৃত্রিম সৌরজগৎ নির্ম্মাণ করে' সেটিকে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌ছেন)

কৃত্রিম সৌরজগৎ

বিদ্যালয়ে বালকদের সৌরজগৎ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থিতি ও তাদের পথ নিরূপণ এবং চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতির কারণ নির্দ্দেশ ক'রতে গেলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞান কল্পনার বিষয় নয়। সম্প্রতি London বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এই সমস্যার সমাধান ক'রেছেন। তিনি একটি কৃত্রিম সৌরজগৎ তৈরী ক'রে বালকগণকে ভূগোলের মতো সেইটি দেখিয়ে শিক্ষা দেন। আমাদের দেশের বালকগণকে সৌরজগৎ সম্বন্ধে এই ভাবেই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

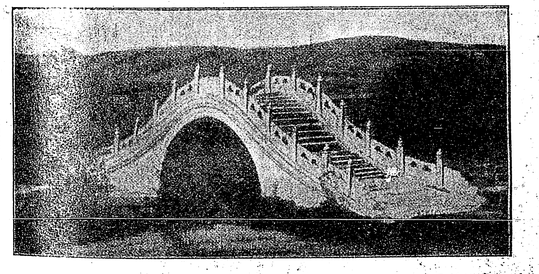

চীনামাটীর সেতু

চীনামাটীর সেতু

দক্ষ শিল্পী চীনবাসীরা একটি চীনামাটীর সেতু তৈরী ক'রে তাদের নিপুণ শিল্প-কার্য্যের অদ্ভুত পরিচয় দিয়েছে। সেতুটীর আগাগোড়া সমস্তই চীনামাটীর তৈরী, কোথাও লৌহ বা কাষ্ঠের চিহ্ন নাই, অথচ এটি এত সুন্দর ও বৃহৎ যে, শীঘ্রই চীনের প্রাকারের মতো এই সেতুটীও পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্যরূপে প্রসিদ্ধি লাভ ক'রবে।

বেতারে দিঙ্‌ নির্ণয়

সমুদ্রবক্ষে জাহাজের দিঙ্‌ নির্ণয়-যন্ত্রটী যদি দৈবাৎ নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে জাহাজ আর দিঙ্‌ নির্ণয় ক'রতে না পেরে বিপথে চালিত হয়। ইহাতে অনেক সময় জাহাজের জলমগ্ন হ'বার সম্ভাবনা আছে। এই অসুবিধা দূর ক'রবার জন্য মার্কনি সাহেব একটি সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করেছেন। জাহাজের বেতার-যন্ত্র থেকেই যাতে জাহাজ ঠিক দিঙ্‌ নির্ণয় ক'রতে পারে, তিনি তা'রই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। জাহাজের চারিদিকে চারিটি aerial থাকে। বিপদের সময় বেতারে চারিদিকে বার্ত্তা

প্রেরণ ক'রলে চারিদিক থেকেই তার উত্তর আসে এবং যে দিকের aerial থেকে বার্ত্তার উত্তর খুব উচ্চে ধ্বনিত হয়, সেই দিকের নিকটেই কোনও দেশ আছে তা' অনুমান ক'রে জাহাজ সেই দিকে নির্ভয়ে অগ্রসর হতে পারে।

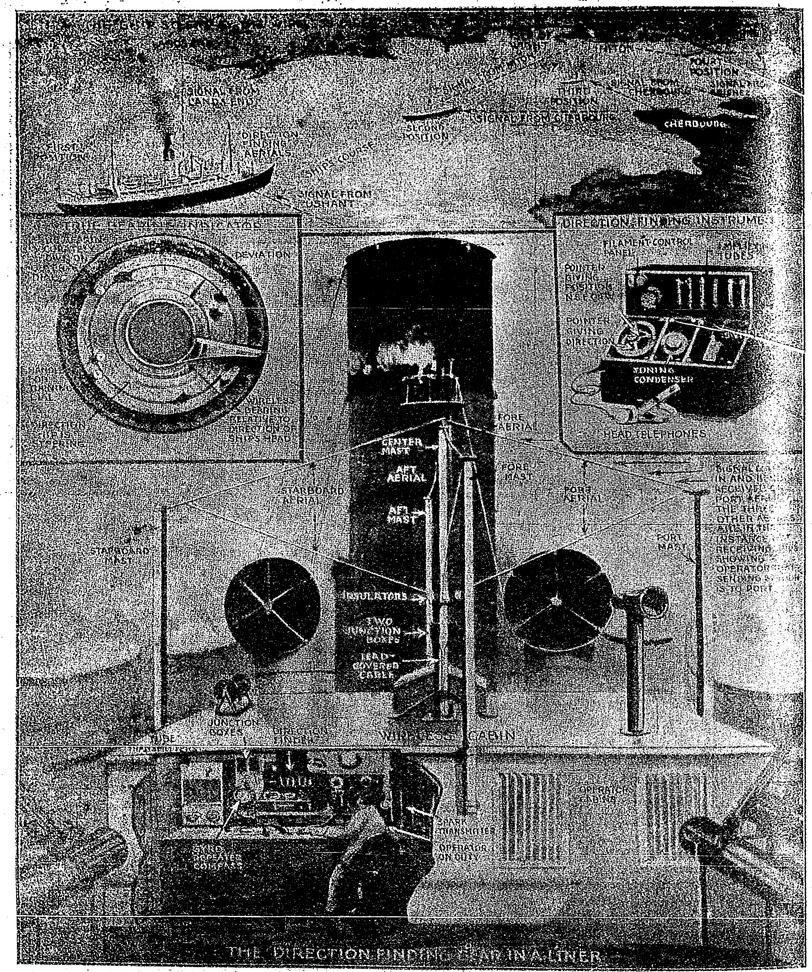

বেতারে দিঙ্ নির্ণয় (জাহাজ বেতার-বার্ত্তা গ্রহণ ক'রবার পর দিঙ নির্ণয় ক'রছে) True Bearing indicator দিঙ নির্ণয় ক'রবার যন্ত্র। বেতার কেবিন। বেতার কেবিনের ভিতরকার দৃশ্য।

বেতার ও মানুষ

মানুষের দেহের সঙ্গেও যে বেতারের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে, তা' Dr. Clawson Barnett তাঁর পরীক্ষাগারে বহুকাল ধরে ক্রমাগত পরীক্ষার পর স্থির ক'রেছেন। তিনি বলেন যে, রেডিওফোণ যেরূপ বৈদ্যুতিক শক্তির তরঙ্গে সাড়া দেয়, সেইরূপ মানুষের দেহও বেতার-তরঙ্গে সাড়া দেয়। তিনি এই ব্যাপারটি তাঁর নবোদ্ভাবিত Oscilloclast যন্ত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন।

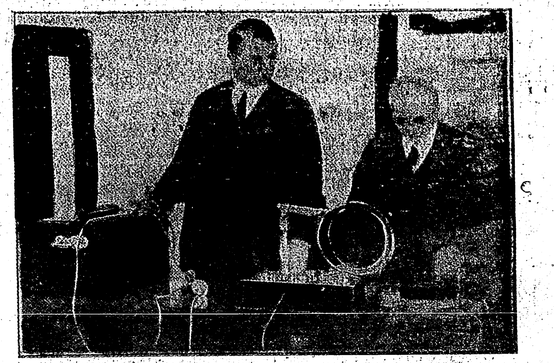

বেতার ও মানুষ (Barnett-সাহেব পরীক্ষাগারে তাঁর নবোদ্ভাবিত যন্ত্রের পরীক্ষা ক'রছেন)

রক্তের টান

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(১)

সে ছিল নেশাখোর, চোর, বদমাইস! তার মতন নেশা করতে তাদের দলে কেউ পারত না। চুরী করতে সে ছিল সিদ্ধহস্ত, বদমাইসিতে সকলের ওস্তাদ। নাম তার হারু। বাপ-মায়ের আদরের শ্রীমান হারাধন, সর্ব্বস্ব হারিয়ে এখন শুধু "হেরো"। পৈতাগাছটা যদিও এখন তার গলায় নাই, আর চেহারাটাতে যথেষ্ট রুক্ষতা মাখানো, কিন্তু সে যে ঐ পটলডাঙ্গায় বড় বাড়ীর মুখুজ্যেদের একমাত্র বংশধর "সবেধন নিলমণি" "হারু"—এ পরিচয় কাহাকেও বলে দিতে হয় না। ঐ অত বড় বাড়ীখানা এখন আর তার নয়, দেনার দায়ে বিক্রি হয়েছে। সরকার, দেওয়ান, চাকর—সবাই চলে গেছে। বাড়ীর বিধবা গিন্নি—হারুর মা, রোগে শোকে সে বছর মারা গেছেন। বাড়ীর বৌ—একটী ১৯ বছরের পরীর মত মেয়ে,—নিরাভরণ অঙ্গে স্বামীর দেওয়া কালসিঠার দাগ, মনে দুঃখ, চ'খে অশ্রু, এই সব নিয়ে দু'বছরের ছেলেটির হাত ধ'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে! আছে কেবল এই সকলের মালিক শ্রীমান হারু, এতখানি পরিবর্ত্তনের মাঝেও আপনার নিশ্চিন্ততা নিয়ে পথে পথে!

রাত তখন প্রায় ১২টা! টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, পথে লোক-চলাচল বন্ধ হ'য়ে গেছে। চোরবাগানের একটা সরু অন্ধকার দুর্গন্ধে-ভরা গলির মধ্যে একটা খোলার বাড়ীর দরজায় ঘা দিতে দিতে একটা লোক চাপা গলায় ডাকলো—"গদা—গদা!"

"কে?"

"আমি হারু—দরজা খোল্।"

যে দরজা খুলে দিল, সে হচ্ছে একজন মোটা, খর্ব্বাকৃতি কালো স্ত্রীলোক। হাতে ছিল তার একটা কেরোসিনের ডিবে, পরনে রামধনু-রংয়ের ছেঁড়া কাপড়। হারুকে দেখে স্ত্রীলোকটা তার মিশি-দেওয়া কাল দাঁতগুলো বার ক'রে, একটু ভঙ্গী ক'রে হেসে বল্লে "এই যে—এসো!... কিছু হ'ল শিকার?" হারু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, তার পাশ কাটিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে, খুব জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলে হাঁপাতে লাগ্‌লো। তার পর আলোয়ানের মধ্য থেকে বার করলে চেইন-সমেত একটা সোণার ঘড়ি ও একটা "মণি-ব্যাগ"। দুটো লোক একটু দূরে একটা

ছেঁড়া মাদুরের ওপর বোসে মদ খাচ্ছিলো। তারা লাফিয়ে উঠে হারুকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "মাইরি হেরো, তোর জন্যই বেঁচে আছি বাবা!" হারু তাদের বিরক্ত ভাবে ঠেলে দিয়ে বল্লে, "সর্ সর্, একটু জিরুতে দে, আজ বড্ড পরিশ্রম হয়েছে—মাইরি!" যে দুটো লোক হারুকে জড়িয়ে ধরেছিল, তাদের একজনের নাম "রমজান", বয়েস প্রায় ৪০। দেখতে খুব বেঁটে, দস্তুর মতন জোয়ান। কাল চোখ দুটো ছোট। মাথায় সামনের দিকটায় ঘোড়ার জুলফির মত একথাবা চুল। অপরটার নাম "গদা", দেখতে কতকটা কাফ্রিদের মত চেহারা—নাকটা খাঁদা, ঠোঁট দুটো পুরু ভাঁটার মত, মদের নেশায় রক্তবর্ণ। রমজান হারুর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে, ছেঁড়া মাদুরটার ওপর বসিয়ে, মদের বোতলটা হাতে করতেই, হারু তার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে ঢক ঢক ক'রে খানিকটা মদ এক নিশ্বাসে খেয়ে, সামনের শালপাতার ঠোঙ্গা থেকে দু'খানা পেঁয়াজের ফুলুরী তুলে মুখে ফেলে দিলে। রমজান "মণি-ব্যাগ"টা খুলে বার করলে চারখানা ১০৲ টাকার নোট, কয়েকটা খুচরা টাকা, শিকি, এক আনি আর কয়েকটা পয়সা এবং একখানা কাটাকাপড়ের দোকানের ৮০৸০ দামের সাড়ির দাম বাবদ রসিদ। রমজান ঘাড় তুলে দরজার দিকে চেয়ে বল্লে, "মুন্না, ওস্তাদকে একবার ডেকে দাও, বিলী হ'য়ে যাক্।" যে স্ত্রীলোকটা হারুকে দরজা খুলে দিয়েছিল, সে একটু হেসে ভিতরে চ'লে গেল! গদা, হারুর পিঠে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কি করে কাজ হাঁসিল করলে মাষ্টার?"

হারু একখানা ফুলুরী খেতে খেতে বল্লে, "আজ ভারি ঝুক্কি গেছে বাবা! আর একটু হলেই কেলো শালা ধরা পড়ে সব মার্ডার করেছিলো আর কি!" রমজান একটু ব্যস্ত ভাবে বল্লে "কি রকম?"

"তবে শোন্—লোকটা কাটাকাপড়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় ট্রামের জন্য অপেক্ষা কচ্ছিলো। কেলোকে টিপে দিয়ে আমি লোকটার পাশে এসে দাঁড়ালুম। কেলো যেন ব্যস্ত হয়ে কোথাও যাচ্ছিলো, হঠাৎ থেমে লোকটার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "মশায়, দেখুন তো এখন ক'টা বেজেছে?—শিয়ালদায় আমাকে ৯টার ট্রেণ ধরতে হবে—পাব তো? লোকটা তার বুক-পকেট থেকে ঘড়িটা বার ক'রে, গ্যাস-পোষ্টের ধারে একটু স'রে গিয়ে ঘড়ি দেখবার সময়, আমি তার পকেট থেকে "মণিব্যাগটা" সরিয়ে ওদিকের ফুটপাথে যাচ্ছি, এমন সময় কেলো চিলের মত ছোঁ দিয়ে চেইন সমেত ঘড়ি নিয়ে দে ছুট্! লোকটা "চোর" "চোর" ব'লে চেঁচিয়ে উঠতেই দেখ্‌তে-দেখ্‌তে সেখানটাতে অনেক লোক জমে গেল।"

বাধা দিয়ে গদা বল্লে, "যাক্ বাবা, ধরা পড়ে নি ত'?"

"না, তবে আর একটু হ'লেই ধরা প'ড়তে! হঠাৎ মার্কাস স্কোয়ারের মোড়ে আমার সঙ্গে তার দেখা হতেই, সে আমার কাছে ঘড়ি চেইনটা দিয়ে বলে তুই যা—আমি যাচ্ছি।...আমরা দেখতে পাইনি যে কাছে খোলার বাড়ীর রোয়াকে একটা পাহারাওয়ালা অন্ধকারে ব'সে ছিলো। তাকে আমাদের দিকে আস্‌তে দেখেই দুজনে দুদিকে দে ছুট্—সে টুকলো কলাবাগানের গলিতে আর আমি এঁকে বেঁকে এলুম এখানে।" হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দ হ'তেই হারু চুপ্ করলো। গদা উঠে দোরের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে বল্লে, "এই যে···কেলো এসে হাজির।" দরজাটা খুলে দিতেই ভিতরে ঢুকলো ৩০।৩২ বছর বয়েসের একটা লোক,—চেহারা কতকটা ভদ্র গোছের। সে কোন কথাবার্ত্তা না ব'লে সটান এসে মাদুরের উপর শুয়ে প'ড়লো। এমন সময় দলের "ওস্তাদ" আব্বাস খলিফা ঘরে ঢুকে বল্লে, "কেলো যে এসেই শুয়ে পড়লো? কি রে কেলো, ব্যাপার কি?" কেলো একটু দম নিয়ে বল্লে, "আর ওস্তাজি আজ এমন তাড় পেছুনে ক'রেছিল··· বাপ!" রমজান তার হাঁটুর উপর এক চাপড় মেরে বল্লে, সাবাস—নে, এক গ্লাস খা।"

"না! আজ আবার লিবারে ব্যথা ধরেছে।"

"তবে এক ছিলিম গ্যাঁজা খা—সব সেরে যাবে।" গদা তার হাতের তলায় গাঁজা টিপ্‌ছিলো,—কুলুঙ্গির ভিতর থেকে একটা ন্যাকড়া-জড়ানো কল্কে এনে, তাতে আগুন দিয়ে চোখ বুজে কসে দু-চার টান মেরে, সেটা দিল আব্বাসের হাতে। সে গোটাকতক টান দিয়ে দিল রমজানের হাতে। রমজান মাথা বেঁকিয়ে ক'সে এক টান দিয়ে সেটা দিল হারুর হাতে। হারু গাঁজা খেলে না—কল্কেটা কেলোকে দিয়ে বল্লে, "নে—তুই খা।" আব্বাস তখন ভাগ ক'রে টাকা বিলি করতেই হারু বল্লে, "আমার

আজ সতেরো টাকা দিলে চলবে না—কিছু বেশী দিতে হবে।" আব্বাস তার চোখ্‌টা একটু ছোট করে, ঘাড় বেঁকিয়ে হেসে বল্লে, 'নাও না মাষ্টার আজকের মতো—আর এক দিন না হয় বেশী নিও।' হারু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, টাকাগুলো আর মদের বোতলটা পকেটে ক'রে বাইরে আসতেই, কেলোও তার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে রাস্তায় জিজ্ঞেস করলে, "কোথা যাবে মাষ্টার এত রাত্রে—আমি ত ডেরায় চল্লুম!"

"দেখি কোথায় যাই" বলে হারু বরাবর চিৎপুরের রাস্তা ধ'রে চলতে আরম্ভ করলো। তখন প্রায় ১টা কি আরও বেশী বেজে গেছে,—পথে লোক-চলাচল বন্ধ হ'য়ে এসেছে। রাস্তার দু-ধারের বাড়ীগুলো অন্ধকারে মাথা তুলে কালো-পোষাকে-আপাদ-মস্তক-ঢাকা প্রহরীর মত সোজা দাঁড়িয়ে আছে। কোলাহলশূন্য সহরের বড় রাস্তা যেন শোক-সমাচ্ছন্ন নীরবতায় স্তব্ধ—উদাস। মাঝে মাঝে কেবল এক-একখানা "ট্যাক্সি" তার মর্ম্মভেদী শব্দে এই গভীর নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ঘুমন্ত সহরের বুকখানার উপর দিয়ে স্বপ্ন-চারণ্যের মত ত্রস্ত গতিতে ছুটছে। কুমারটুলীর কাছ বরাবর একটা খোলার বাড়ীর কাছে এসে হারু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একজন যুবতী স্ত্রীলোক—যেন তখনও পর্য্যন্ত কারো প্রতীক্ষায়! তার সামনে একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বলছিলো। সে আলোকে স্ত্রীলোকটার আহ্বান-কাতর দৃষ্টির ব্যাকুলতা বুঝতে পেরে, হারু একটু তার কাছে সরে এসে জড়িত স্বরে বল্লে, "কি বাবা, এখনও দাঁড়িয়ে আছ, তীর্থের কাকের মত?" যুবতী একটু হেসে ঘাড় দুলিয়ে বল্লে "এস না!' তার পর আলোটা মুখের সামনে তুলে ধরলে। হারু কিছুক্ষণ স্ত্রীলোকটার দিকে চেয়ে থেকে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বল্লে,—"আহা বেচারা···সারাটা রাতই বুঝি পাহারাওলার মত ঘাঁটি আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাকবে!... এই নাও...ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে থাকগে যাও!"—হারুর কাছে যে কয়েকটা টাকা-পয়সা ছিল—মুঠোর ভিতরে নিয়ে হাতখানা স্ত্রীলোকটীর দিকে এগিয়ে দিল। রমণীকে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতে দেখে হারু একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "যা ব'ল্‌ছি শোন...হাত পাত না ছাই!' স্ত্রীলোকটী একটা কথাও কইলে না, মাটির দিকে চেয়ে রইল। আর কে যেন জোর ক'রে তার হাতখানা হারুর সাম্‌নে এগিয়ে ধরলে। হারু তার হাতের মধ্যে টাকা-পয়সাগুলো গুঁজে দিয়ে টল্‌তে টলতে চলে গেল।

(২)

কেলোর আজ ৭ দিন জ্বর। "বসন্তে" তার গা ভ'রে গেছে! সে একখানা খোলার বাড়ীর একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরে, মাটিতে মাদুরের ওপর পড়ে আছে। চারদিকে মাছি ভন্‌ভন্ কচ্ছে, একটা বিশ্রী গন্ধে ঘরখানা ভ'রে রয়েছে; আর তার পাশে চুপ ক'রে বোসে বাতাস কচ্ছে হারু! কেলো একবার কাসতেই তার মুখ দিয়ে খানিকটা রক্তের চাপ উঠলো! হারু তাড়াতাড়ি একখানা ছেঁড়া গামছা দিয়ে কেলোর মুখখানা মুছিয়ে দিয়ে বল্লে, 'হ্যাঁরে, শরীরটা তোর বড্ডই কেমন কচ্ছে, নয়?—আমি একটা ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি!" কেলো হারুর দিকে মুখটা ফিরিয়ে ক্ষীণ স্বরে বল্লে, "আর ডাক্তার!···আমার হয়ে এসেছে রে...বোধ হয় আজই...আমার নিশ্বেস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে যে হেরো!"

"দূর—জ্বরের জন্য অমন হচ্ছে। গায়ে সব বেরিয়ে গেছে—আর ভয় নেই।" কেলো উদাস দৃষ্টিতে হারুর দিকে চেয়ে বল্লে,—"যাক্, তার জন্য ভাবি না...তবে তুই একা"...

হারু একটু রেগে বল্লে, "ছাখ্, তুই যদি বক্ বক্ করবি, তা'হলে আমি এই চল্লুম—থাক্ তুই একা পড়ে!" হারু তার হাতের পাখাখানা ফেলে দিতেই, কেলো হাসবার ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত করে বল্লে, "সে তুই কিছুতেই পারবি না হেরো—এ আমি বেশ জানি! জ্বর হওয়া থেকে সুরু ক'রে আজ'তক রাতদিন আমার পাশে ব'সে আছিস,—নিজে পয়সা খরচ ক'রে পথ্যি যোগাড় কচ্ছিস...চলে কি আর যেতে পারবি আমায় ফেলে"—কেলোর চোখ দুটো দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

"আবার লেকচার? এবার ভাল হ'লে তোকে গোল-দীঘিতে দাঁড় করিয়ে দোব!' কেলোর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দিয়ে চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল! একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে কেলো বল্লে, "শোন্ হেরো, তোকে একটা কথা আজ আমি বলে যাই—আমি ত ম'রে

রেহাই পেলুম, কেউ আর আমার জন্যে বোধ করি কাঁদবে না…কিন্তু তুই আর রেমোদের দলে মিশিস্ নে ভাই…ওরা অতি ছোট লোক্—দ্যাখ, তুই কি ছিলি আর কি হয়েছিস। …কোথায় গেল তোর বাড়ী-ঘর…কোথায় মাগ্ ছেলে…" কেলো আর বল্‌তে পারলে না—হাঁপাতে লাগলো!

"ফের বক্‌বক্ কচ্ছিস্!—থাক্ তুই প'ড়ে, আমি চল্লুম" ব'লে হারু সত্যই ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। কিন্তু তার পা আর চলে না, যেন অবশ হ'য়ে গেছে। সে আজ আশ্চর্য্য হয়ে গেল—এ তার হ'লো কি! আজ কোথা হ'তে বিশ্বের সমস্ত দুঃখ একসঙ্গে দল বেঁধে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এত দিন শত বিপদে, সহস্র দৈন্যের মাঝেও সে আপনাকে অটল রেখেছিল; কিন্তু আজ!—একজন বর্ষিয়সী স্ত্রীলোককে পাশের গলি থেকে বেরুতে দেখে, হারু তাকে বল্লে, "মাসি, কেলোর অবস্থাটা যেন কেমন-কেমন লাগছে—আমি গদাকে চট্ ক'রে একটা খবর দিয়ে আসি—তুমি একটু কেলোর কাছে বোস্‌বে?" স্ত্রীলোকটা বিরক্ত ভাবে বল্লে, "আমার বাছা"…হারু বাধা দিয়ে বল্লে, "একটুখানি বোসো মাসি—আমি ঝাঁ ক'রে এলুম ব'লে…আর এই নাও এই টাকাটা, তোমার নাতি সেদিন সন্দেশ খেতে চেয়েছিল…কিনে দিও।" স্ত্রীলোকটী এবার হেসে টাকাটা নিয়ে বল্লে, "বোসবো বই কি বাবা—তা একটু শিগগির ক'রে এসো যেন।…ছেলেটাকে একা ফেলে এসেছি কি না"…হারু যেতে যেতে বল্লে, "এই এলুম বোলে"—* * * * *

হারু চ'লেছে উদাস, অন্যমনস্ক ভাবে। একটা কানা লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে ধীরে ধীরে যাচ্ছিলো,—হারুর গায়ে ধাক্কা লেগে লোকটা প'ড়ে যাবার উপক্রম হ'তেই, হারু তাকে ধ'রে ফেল্লে। পকেট থেকে একটা শিকি বার ক'রে তার হাতে দিয়ে বল্লে, "কিছু মনে কোরো না বাপু—হঠাৎ লেগে গেছে!" কানাটা শিকি হাতে ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এটা কি বাবু—দিলে যা"…"একটা শিকি" ব'লে হারু চ'লে গেল। কিছু দূর এসে হারুর পা যেখানে অচল হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়ালো, সে হচ্ছে একটা মদের দোকান। হারু একবার কি ভাব্‌লে। তার পর দোকানে ঢুকে এক বোতল মদ কিনে, একটা খালি বেঞ্চের এক কোণে বোসে মদ খেতে লাগলো। পাশেই, আর এক-খানা বেঞ্চের উপর কতকগুলো ইতর মাতাল বোসে ছোলা আর চাল-ভাজা খেতে খেতে বিকৃত সুরে চীৎকার ক'রে মাথা ঝাঁকিয়ে গান গাচ্ছিলো "বন্ বন্ ঢুড়ি সখিয়া রে কাঁহা গৈলে…হোঃ-হো…" হারু তার রক্তবর্ণ চক্ষু তুলে জড়িত স্বরে বল্লে, "এই চোপ্ রাও, ড্যাম, ব্লাডি…!" একটা মাতাল তার ঢুল্‌ঢুলো চোখ দুটো অতি কষ্টে বিস্ফারিত ক'রে, ছেঁড়া জামার হাতায় তার গোঁপে-ঢাকা থুথু-ভরা মুখখানা মুছে উত্তর করলে, "কেন বাবা চুপ ক'রবো? তুমি কি লাট-সাহেব এলে?" হারু মদের বোতলটা শূন্যে তুলে চেঁচিয়ে বল্লে, "আলবৎ—চুপ"—তার পর টপ্ ক'রে বেঞ্চের ওপর উঠে, জামার আস্তিনটা গুটিয়ে হাত নেড়ে বল্লে, "আমি বোল্‌ছি চুপ,…শোন্…সকলে বিস্ময়-আতঙ্কে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে হারুর দিকে চেয়ে রইল। হারু অঙ্গভঙ্গী ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো "এই শোন্, তোদের আমি ভালবাসি…কেন জানিস্? তোরা গরীব বোলে'!…ভালবাসা কি?…সে হচ্ছে…হচ্ছে…কিছু না…সে হচ্ছে কেবল একজনের মন ভাল ক'রে বোঝা…চেনা…দেখা!…কিন্তু কেউ বাবা মন দেখে না…সুধু ওপরটা দেখেই বিচার করে…বুঝলি…এই ত দুনিয়া!"—মাতালগুলো হো হো ক'রে হেসে উঠ্‌তেই, হারু বেঞ্চি থেকে নেমে বল্লে, "দূর, যত সব ছোটলোক,—মুখ্যুর দল, একটা ক্ল্যাপ পর্য্যন্ত দিলি নে"…মদের বোতলটা পকেটে রেখে হারু দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে আবার চল্‌তে লাগ্‌লো। কিছু দূর এসে হারু একটা সরু গলিতে ঢুকে, একটা মারবেল-পাথর-বাঁধানো একতলা ছোট্ট বাড়ীর দালানে উঠে, নত হ'য়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে, মাথা ঠুকে বল্লে, "মা শীতলা, তোমাকে জোড়া পাঁঠা দোব বাবা…দোহাই তোমার—কেলোকে ভালো ক'রে দাও!" একটা লোক একখানা "নামাবলি" গায়ে দিয়ে সেখানে বোসে ছিল, হারুর দিকে চেয়ে সে একটু হাসলে!

"ঠাকুর, এই টাকাটা নাও, মাকে ডাব-চিনি দিয়ে পূজো দিও…আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই, আমি চল্লুম" বলে হারু ঝন্ করে টাকাটা ফেলে দিতেই, ঠাকুর সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বল্লে, "একটু চন্নামেত্ত নেবেন না?"

—"চন্নামেত্ত—হ্যাঁ দিন্…তবে নি' কি করে?…যায়গা আনি নি তো।"

"একটা পাত্তর-টাত্তর কিছু আনেন্ নি?"

"নাঃ…আচ্ছা, একটু জল দিতে পারেন আমায়—

"খাবেন্?

"না কাজ আছে।"

"ও দিক্‌টা যান…ওখানে কলতলা—"

হারু কলতলায় চৌবাচ্ছার কাছে গিয়ে একবার এদিক ওদিক চাইলে। তার পর পকেট থেকে মদের বোতলটা বার ক'রে, মর্দ্দমার ভিতর বোতলের অবশিষ্ট মদটা ঢেলে ফেলে, বোতলটা ভাল ক'রে ধুয়ে নিয়ে, ঠাকুরের কাছে এসে বল্লে, এই এতে দিন…তাতে আর দোষ কি…কি বলেন…হ্যাঁ।…"

পূজারী ঠাকুর হারুর মুখের দিকে একবার চেয়ে তামার বাটি থেকে খানিকটা "চন্নামৃত" বোতলটাতে ঢেলে দিলে। হারু হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে ৺শীতলাকে প্রণাম ক'রে পূজারীকে বল্লে "এখন চল্লুম মশায়—পূজাটা দেবেন কিন্তু…ভুলবেন না।"

হাতিবাগানের মোড়ের বাঁক ফিরতেই হারু দেখলে, তার পরিচিত বদন ডাক্তার গাড়ীতে উঠছে। হারু তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে বল্লে, "ডাক্তারবাবু, একবার চলুন ত…আমার এক বন্ধুর ভয়ানক জ্বর হ'য়েছে…ভারি ছট্‌ফট্ করছে।" বদন ডাক্তার একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "আমার এখন সময় হবে না…আমি একটা urgent callএ (জরুরী ডাক) যাচ্ছি। address (ঠিকানা) দিয়ে যাও, ফেরবার পথে দেখে আসব'খন।" হারু একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "চলুন না মশাই—fee (দর্শনি) পাবেন এখন…এটাও খুব জরুরী Case (রোগী)।"

"রোগী কোথায়?"

"এই কাছেই…শোভাবাজার।"

"আচ্ছা…আমার Caseও (রোগী) ওই quarterএ (মহল্লায়)…তা হ'লে এস" ব'লে ডাক্তারবাবু গাড়ীতে উঠ্‌লে পর হারুও উঠ্‌লো। ডাক্তারবাবু গাড়ীর ভিতর থেকে বল্লেন, "চলো শোভাবাজার"… * * *

গাড়ীখানা একটা সরু গলির মুখে আসতেই, হারু চেঁচিয়ে বল্লে, "এই রোখ্‌খ!" হারুর সঙ্গে বদন ডাক্তার কেলোর ঘরে ঢুকেই খানিকটা পেছিয়ে একেবারে দরজার কাছে স'রে গিয়ে বল্লে, "এর যে দেখ্‌ছি mall Pox …Virulent type!" পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে ডাক্তার তাঁর নাকে চাপা দিলেন। হারু সে কথার কোন জবাব না দিয়ে, কেলোর গায়ের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে বল্লে "গায়ে খুব বেরিয়েছে—দেখ্‌ছেন!"

বদন ডাক্তার কেলোর ফুলো মুখ,—সমস্ত গা-ময় বড় বড় বসন্তের ফোস্কা দেখেই, ঘর থেকে তখন আস্তে আস্তে রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়েছেন!

"জল…একটু জল্…পালা, পালা হেরো…ঐ আস্‌ছে …অ্যাঁঃ…অ্যাঁঃ—" কেলোর তখন ঘোর বিকার! হারু তাড়াতাড়ি মেটে ভাঁড় থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে কেলোর মুখের কাছে নিয়েই, আবার সেটা সরিয়ে নিয়ে, জলটা ফেলে দিয়ে, পকেট থেকে বোতলটা বার ক'রে খানিকটা চন্নামৃত ঢেলে কেলোকে ডাক্‌লে। কেলো একবার পাগলের মত উদাস দৃষ্টিতে চাইতেই, হারু খুব জোরে জোরে বল্লে, "এই নে মায়ের চন্নামেত্ত এনেছি…ভক্তি ক'রে খা, সব সেরে যাবে…এই যে—আসুন ডাক্তার বাবু—এইবার দেখুন…তাকিয়েছে…হাঁ কর না শালা"—হারু কেলোর মুখের ভিতর খানিকটা চন্নামৃত ঢেলে দিতেই, খক্ খক্—গোঁ—গোঁ শব্দ করে কেলো দু-তিনবার তার মাথাটা ঝাঁকালো। তার মুখের দু'পাশ দিয়ে চন্নামৃত গড়িয়ে পড়্‌লো,—তার চোখ দুটো কপালে উঠে গেল।

"ডাক্তারবাবু…ডাক্তারবাবু"…পেছন ফিরে হারু সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলে, সেখানে তখন কেউ নেই! দুঃখে, রাগে হারু দাঁতের ওপর দাঁত রেখে চেঁচিয়ে বল্লে, "শালা আবার ডাক্তার! রুগী দেখে ভয়ে পালায়…এবার দেখ্‌তে পেলে তোর ভুঁড়ি যদি না ফাঁসাই বদ্‌না, তবে আমার নাম হারুই নয়।…ওরে কেলো…কেলো…জল খাবি?"…কেলো চেয়ে আছে অথচ কোন সাড়া দিচ্ছে না দেখে, হারু তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বিশেষ লক্ষ্য ক'রে দেখ্‌লে, দীপ্তিহীন ঘোলাটে একটা পরদা কেলোর দৃষ্টিকে চিররুদ্ধ করে ছেয়ে প'ড়েছে! হারু কেলোর নাকে হাত দিয়ে বুঝ্‌লে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে! আস্তে আস্তে তার কপালে হাত দিয়ে অনুভব করলে—শরীর হিম-শীতল,—কেলো নাই! হারু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে কেলোর পাণ্ডুর মলিন মুখের দিকে স্থির

দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো, আর তার দুই চোখ বেয়ে ঝর্ ঝর্ ক'রে জল পড়তে লাগলো!!

(৩)

অনেক কষ্টে মাত্র জনচারেক লোক জুটিয়ে, হারু যখন কেলোর শব বহন ক'রে নিমতলার শ্মশানে এসে পৌঁছল, তখন রাত প্রায় এগারটা। "বল হরি হরিবোল" ব'লে খাটটা নামিয়ে হারু একখানা দশ টাকার নোট গদার হাতে দিয়ে বল্লে, "এই নে—যা কিছু দরকার সব কিনে কেটে নিয়ে আয়।" গদা একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "সবুর কর বাপু, একটু জিরিয়ে নি। এক টান গাঁজা না টেনে আর কিছু কত্তে পারব না, গা গতর সব বিষিয়ে গেছে।" হারু তার ট্যাঁক থেকে কাগজে-মোড়া একটা ছোট্ট মোড়ক দিয়ে বল্লে, "নে তাহ'লে আর বেশী দেরী করিস না...ওই দিক্‌টাতে গিয়ে সাজ, আমি যাচ্ছি..."

অদূরে কতকগুলি লোক একটি বছর চব্বিশ বয়সের মেয়ের শব চিতায় তুলে দিচ্ছিল। তার সর্ব্বাঙ্গ ফুল দিয়ে সাজানো, মাথায় একরাশ সিঁদুর। কাঠের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রয়েছে টক্‌টকে আলতা-পরানো পা দুখানা ও লাল চওড়া-পেড়ে শাড়ির একাংশ! হারুর দৃষ্টি সেই দিকে পড়তেই, সে এগিয়ে এসে শশুর মুখের পানে চেয়েই শিউরে উঠলো। তার পর কিছুক্ষণ জলন্ত চিতার পানে পলকহীন চোখে চেয়ে রইল। এমনি একখানা মুখ—করুণ, ম্লান! কমলা... কমলা...সেই বিদায়ের বেলা...দু' বছরের ছেলেটির হাত ধ'রে...হারু একটা নিশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এল! হারুর এই চম্‌কে উঠে পেছিয়ে যাওয়া গদা নজর করেছিল। তাই হারুকে সে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "মড়াটা দেখে অমন চম্‌কে উঠলি কেন রে হেরো?" হারু মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল "ওকে দেখতে ঠিক আমার পরিবারের মত!" গদা হেসে বল্লে, "তাহ'লে মাগের জন্যে তোর এখনো মন-কেমন করে?" হারু এ কথার কোন জবাব না দিয়ে, রেজিষ্ট্রারের ঘরে এসে এক পাশে দাঁড়াল। সেখানে তখন অনেক ভীড়। গদা হারুকে বল্লে, "ঐ বুড়োর লেখান হ'য়ে গেলে তুই যাস্, নইলে আরও দেরী করতে হবে—আজ দেখ্‌ছি মরসুম পড়েছে!" কথাগুলো হারুর কাণে গেল কি না কে জানে—সে তখন পেরেকে-আঁটা মাটির পুতুলের মতন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দৃষ্টি উদাস। গদা একটু হেসে বল্লে, "তোর যে দেখ্‌ছি একেবারে ভাব লাগ্‌লো...আচ্ছা, সত্যিই যদি ও তোর পরিবার হ'ত"...বাধা দিয়ে হারু ক্রুদ্ধ স্বরে বল্লে, "থাম্ শালা, মারবো মুখে থাবড়া—মুখ ভেঙ্গে দেব।" হাস্‌তে হাস্‌তে গদা পাশের লোকগুলোকে ধাক্কা দিয়ে স'রে যেতেই, একটা লোক ব'লে উঠল, "মাতলামো করার আর যায়গা পেলে না দেখছি!"

নাকের ডগায় চসমা পরা রেজিষ্ট্রার বাবু একবার চোখ দুটো কপালে তুলে বল্লেন, "এই, গোল করে যে?...হ্যাঁ, কি বলছিলেন—ক'বছরের ছেলে?" বৃদ্ধ উত্তর দিল "আট বছর।"

"কি হয়েছিল?"

"টাইফয়েড্ ফিবার—এই নিন সার্টিফিকেট..."

"...আজ কাল বড্ড টাইফয়েডে মরছে...যাক্—বাপের নাম?"

"হারাধন মুখুজ্যে।"

শব্দটা তীরের মতন হারুর কাণে বিঁধতেই, সে শিউরে উঠলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার উদাস দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হ'য়ে ব্যাকুল কাতরতা এবং উদ্বেগের চিহ্ন তার দুই চোখে ফুটে উঠ্‌লো। সে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ লোকটির কাছে গিয়ে একটা কথা বলতে গেল—কিন্তু পার্‌ল না। তার বিকৃত কণ্ঠের অস্ফুট শব্দে বৃদ্ধটি হারুর মুখের দিকে চেয়ে আশ্চর্য্য ভাবে বল্লে "আপনি...আপনার...আপনাকে"—

"নিন্ মশায়, রসিদ নিন...শুনচেন...এইটে নিয়ে যান, কাঠ ফাঠ সব পাবেন ওদিকে।" বৃদ্ধ রসিদ খানা হাতে নিয়ে যখন পেছনে চাইলে,—হারু তখন একেবারে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে! সকলে যখন লিখিয়ে চলে গেছে, তখন গদা এসে হারুকে জিজ্ঞাসা করলে, "কি রে, লিগিয়েছিস্?" হারু কোন জবাব দিল না। গদা হারুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বল্লে, "কি রে—লেখানো হয়েছে?"—"না...চল্ লেখাই।" গদার সঙ্গে হারু যখন রেজিষ্ট্রারের কাছে এসে দাঁড়ালো, তখন তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো বায়স্কোপের ছবির মত তার অতীত জীবন। হারু তার হাত দুটো চোখের উপর ঢাকা দিল।

"শুন্‌ছ হে...কি নাম বল না ছাই?"

হারুর পিঠে একটা ধাক্কা দিয়ে গদা বল্লে "বল্ না

কেলোর নাম-টাম্ সব।" হারু অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিল "যে মরেছে তার নাম কেলো।"

"হ'য়েছিল কি?"

"বসন্ত।"

"বয়েস?"

"৩০।৩২ হবে"।

"বাপের নাম?"

"বল্‌তে পারি না!"

"আচ্ছা যাও, জমাদারকে দিয়ে রসিদ পাঠিয়ে দিচ্ছি..."

* * * *

রাস্তায় গদা হারুকে বল্লে, "ওদের দিয়ে কাঠ ফাঠ গুলো আনাব 'খন...চল্ আমরা এক পাত্তর টানিগে"—

"তাই চল" বলে হারু তাড়াতাড়ি শ্মশানের ভিতর দিয়ে গঙ্গার ঘাটে এসে, একটা গভীর নিশ্বাস ছেড়ে, অন্ধকার গাছতলায় যেখানে গদার সঙ্গীরা বসে মদ খাচ্ছিলো, তাদের পাশে এসে বোসলো। গদা এসে লোকগুলোকে বল্লে "ব'সে ব'সে শুধু মাল টানলে চলবে না বাবা—এবার তোমরা যাও ও-দিক্‌টায়। চাপরাশি রসিদ দিয়ে গেলে টাকা নিয়ে গিয়ে কাঠ, কল্‌সি, প্যাঁকাটী ...এ সব নিয়ে এস...আমরা একটু জিরুই!" তাদের ভিতরকার একজন বল্লে, "তা মুখাগ্নিটা মাষ্টার তুমিই ক'চ্ছ-ত?"—

হারু ভাঙ্গা গলায় বল্লে—"না—আমি আর ওখানে যাব না...তোরা যে কেউ হয়—দিস!" "বেশ বাবা...তোমার হ'ল বন্ধুলোক—আর মুখে আগুন দোব আমরা!...আচ্ছা... কুচ্ পরোয়া নাই বাবা..." বলে লোক দুটো চলে যেতেই, হারু মদের বোতলটা নিয়ে ঢক্ ঢক্ ক'রে অনেকটা মদ খেয়ে ফেল্লে। গদাই বল্লে, "তোর আজ কি হ'লরে হেরো?" হারু উদাস কণ্ঠে বল্লে, "কি জানি, আমার যেন আজ সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!"

অন্ধকার আকাশে তখন একরাশ নক্ষত্র, গঙ্গার জল কুলকুল শব্দে ঘাটের বাঁধানো লোহার সিঁড়ির উপর আছড়ে প'ড়ছে। দূরে মাঝ-গঙ্গায় ছপ ছপ শব্দে দাঁড়টানা বড় বড় মহাজনি নৌকা বেয়ে মাঝিরা গান গেয়ে চলেছে, আর সেই মিলিত রাগিনীর তান নিশীথের বিরাট স্তব্ধতা ভেদ করে তালে তালে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আস্‌ছে। নির্জ্জন সিঁড়ির এক কোণে ব'সে হারু ভাব্‌ছিল, তার এই ছন্নছাড়া জীবনের একটা পরিচ্ছেদের কথা! এইখানটায় কেলোর জীবনের সঙ্গে তার মেলে নি। কেলো সকলের সঙ্গে হিসাব নিকাশ পরিষ্কার ক'রে ব'সেছিল, কিন্তু তার যে অনেক ঋণ! সকলকে ফাঁকী দিয়ে কেলোর মত জগতের একধারে একা অন্ধকারের এক কোণে, একটু স্নেহস্পর্শ না পেয়ে এক ফোঁটা চোখের জল না নিয়ে কেমন করে সে চলে যাবে!...তার কমলা—তার সতু—সতু—ঝড় তুফানে নৌকা যেমন তীর লক্ষ্য ক'রে ছোটে, তেমনি এই চিন্তাধারার মধ্য থেকে হারু ছুটে চ'লে গেল উপরে যেখানে একটি ছোট ছেলের শব দাহ হচ্ছিল! দীপ্ত আলোকে ছেলেটার মুখের দিকে চেয়ে হারু একটা চীৎকার ক'রে পেছিয়ে আসতেই, কাঠের গুঁড়িতে পা বেধে সে সশব্দে প'ড়ে গেল;...সকলে তাড়াতাড়ি যখন তার কাছে এসে দাঁড়ালো, হারু তখন সংজ্ঞাহীন,—কপালটা কেটে গিয়ে রক্ত ঝরে প'ড়ছে! * * *

কতকগুলো লোককে এক যায়গায় জমা হ'য়ে "জল আন্...জল" ব'লে চীৎকার করতে শুনে, গদা তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়ে হারুকে প'ড়ে থাক্‌তে দেখে, বিস্ময় আতঙ্কে ব'লে উঠলো "হেরো যে!" একটী বৃদ্ধ গদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এ বুঝি তোমাদেরি দলের একজন?"

—"আজ্ঞে"—ব'লে গদা আস্তে আস্তে হারুকে তার কোলের কাছে তুলে বসালো। হারুর মুখখানা তখন একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে গেছে, চোখ দুটো মুদিত, মাথার কাটা স্থান থেকে রক্তের ধারা তখনো গালের এক পাশ বেয়ে ঝরছে! একটা লোক ছোট মেটে ভাঁড়ে ক'রে জল আন্‌তেই, বৃদ্ধটী হারুর চোখে মুখে জোরে জোরে ঝাপ্‌টা দিতে লাগলো। গদা তার গামছা-খানা দিয়ে রক্ত মুছিয়ে বল্লে "শালা লুকিয়ে লুকিয়ে বোধ করি বেশী মাল টেনেছে.....রে হেরো...হেরো".....গদা হারুর গা ধ'রে ঝাঁকুনি দিতেই, বৃদ্ধটী বাধা দিয়ে বল্লে, "আঃ...অমন ক'রে ঝেঁকো না বাপু! ওর কি আর এখন জ্ঞান আছে?...ওহে সতীশ, হ্যারিকেনটা একবার এদিকে আনো তো"...একজন চস্‌মা-চোখে, ফরসা, ছিপছিপে ধরণের ছোক্‌রা একটু বিরক্ত ভাবে বল্লে, "নায়েব মশাইর

যত বাতিক্...দেখছেন না, একটা haggard, idiot, নেশাখোর ছোট লোক"—বৃদ্ধ বিরক্ত ভাবে বলে উঠলো "আঃ, থামো না ছোট বাবু...কৈ হে আলোটা..." সতীশ হ্যারিকেনটা এনে হারুর মুখের কাছে উঁচু ক'রে তুলে ধরতেই, বৃদ্ধটী তার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, সহসা গদার দিকে মুখ ফিরিয়ে, ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা ক'রল, "এ'র কে মরেছে বাপু!"

"বন্ধু—কেলো!"

বৃদ্ধ আর কোন কথা না ব'লে, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে, তার কম্পিত হাতখানা হারুর মুখে, গায়ে বুলুতে লাগলো। দলের একজন সতীশের পিঠে আস্তে আস্তে হাত দিয়ে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা ক'রল, "এ কে হে!"

সতীশ গম্ভীর ভাবে বল্লে "সতুর বাবা"!!

* * * * *

প্রভাতের উজ্জ্বল দীপ্তি যখন ধরণীর বুকে ছেয়ে পড়লো, সতুর সুকোমল দেহ তখন ছাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে গেছে...আর তার চিহ্ন মাত্রও নাই! কেবল সেই ভস্মস্তূপের উপর তখনো কয়েকখানা পোড়া কাঁঠ ছাই ঢাকা আগুন বুকে নিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে চিতার বীভৎসতা সপ্রমাণ করছে। হারু পাথরের মূর্ত্তির মত চিতার পাশে ব'সে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল...সে ত চিতা নয়...ভস্মস্তূপ নয়...দগ্ধাবশেষ কাষ্ঠখণ্ড নয়...মানুষের চিহ্ন গ্রাস করা শ্মশানক্ষেত্র নয়, এ যে সেই অতীতের গৃহ...প্রাঙ্গণ...শয়নঘর...তার খাট বিছানা!...আর তারি উপর ঘুমিয়ে তার "সতু"...ঘুমের ঘোরে হাস্ছে...চাইছে...কথা কইছে...ঐ ত সেই কচি মুখখানায় আধ-আধ হাসি... কমলার আঁচল ধরে ফ্যাল্ ফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে আছে...সতু...সতু...বিকৃতকণ্ঠে চীৎকার ক'রে চিতা থেকে আধপোড়া কাঠখানা তুলে নিয়ে হারু সবলে তার বুকে চেপে ধরলে! সকলে তাড়াতাড়ি হারুর হাত থেকে সেখানা টেনে ফেলে দিল। দেখ্তে দেখ্তে ফরসা বুকখানার উপর একটা লাল ফোস্কা প'ড়ে উঠ্লো! বৃদ্ধ লোকটী বল্লে, "আর পাগলামী ক'রো না বাবা—এস—এক এক কলসী জল চিতের ওপর ঢেলে দাও...ইঃ...। বুকখানায় যে ফোস্কা প'ড়ে গেল!"...

হারু নিঃশব্দে জলভরা কলসীটা নিয়ে চিতার উপর ঢেলে দিল! কলসীটা ভেঙ্গে দিয়ে আর আর সকলে হরিধ্বনি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল! বৃদ্ধ হারুর হাত ধ'রে নিয়ে যাবার সময় হারু আর একবার পিছন ফিরে চাইল... চোখের কোণ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল গড়িয়ে প'ড়ল। বৃদ্ধ হারুর হাতটা টেনে বল্লে "এস বাবা"—যন্ত্র-চালিতের মত হারুর সঙ্গে সঙ্গে গেল। স্নান শেষ হতেই একটা লোক বল্লে "গাড়ী এসেছে।" চসমা-চোখে ছোকরা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে, "দিদি এখন কেমন আছে রে?"

"আজ্ঞে, ভোর থেকে আবার ফিট হচ্ছে।" সকলে গাড়ীতে উঠে বসলে, হারুকে গাড়ীতে তুলতেই সে এক কোণে মাথা নীচু ক'রে ব'সে রইল!

গাড়ীখানা একটা বড় বাড়ীর ফটকে ঢুকতেই, বাড়ীর ভিতর থেকে কান্নার রোল উঠ্লো! সকলে গাড়ী থেকে নেমে আগুন ছুঁয়ে, নিমপাতা, ডাল দাঁতে কেটে, পাশের ঘরে চলে গেল! বৃদ্ধ নায়েব মশাই হারুকে গাড়ী থেকে নামিয়ে নিয়ে এগিয়ে আসতেই, একজন ভদ্রলোক কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছতে মুছতে বাড়ীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন, এবং হারুর দিকে একটা কঠোর বিতৃষ্ণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে মুখ ফিরিয়ে পাশের বৈঠকখানায় চ'লে গেলেন। বৃদ্ধটী কি ভেবে হারুকে নিজের ছোট ঘরখানায় নিয়ে গিয়ে তক্তার উপর বসিয়ে বল্লে "বসুন।"

নায়েব চ'লে গেল। হারু বসে রইল। একটী বছর ১২।১৩ বয়সের মেয়ে এসে হারুর সামনে দাঁড়ালো—হারুর ভ্রূক্ষেপ নাই। মেয়েটী কিছুক্ষণ হারুর পানে চেয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লে "চলুন ওপরে।" হারুকে তার দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে থাকতে দেখে, একটু এগিয়ে এসে তার হাত ধ'রে বল্লে "চলুন।"

মেয়েটি যখন হারুকে নিয়ে একটা ঘরের সামনে এল, হারু ঘরের দিকে চেয়েই পাশের রেলিং টা ধ'রে ফেলে কোন মতে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের ভিতরে মার্ব্বেল পাথরের মেঝের ওপর প'ড়ে ছিল আলুলায়িত-কেশা, পুত্রহারা কমলা!—শিয়রে ব'সে তার মা।

....."সতু রে...ফিরে আয়"।.....

বৃদ্ধা হারুকে দেখে মুখে কাপড় দিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন-বেগ চেপে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল!

মেয়েটি হারুর হাত ধরে ঘরে ঢুকে কমলার পাশে ব'সে ভাঙ্গা গলায় আস্তে আস্তে ডাক্লে "দিদি!"—কমলার সাড়া নাই! হারু কমলার মাথার কাছে নিশ্চল পাথরের মত বোসে।—তার দৃষ্টি উদাস।

....."সতুরে...ফিরে আয়"..... সে আর্ত্তস্বর শূন্যে বাতাসে মিশিয়ে গেল! দূরে...আরও দূরে—শুধু একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট শব্দ.....আয়.....আয়.....আয়!!



নৃতত্ত্বে জাতিনির্ণয়

ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, পিএইচ-ডি, (বার্লিন)

(২)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে পশ্চিম-জার্ম্মাণির অন্তর্গত নিয়াণ্ডার উপত্যকায় (Neanderthal) মনুষ্যের অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইবার কথার উল্লেখ করিয়াছি। এবম্প্রকার মনুষ্য-কঙ্কাল স্পি (Spy), জিব্রালটার, ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থান, ও ক্রোয়াসিয়ার (বর্ত্তমান যুগো-স্লাভিয়া দেশের অন্তর্গত প্রদেশ) ক্রাপিনা (Krapina) নামক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই অস্থি-কঙ্কালসমূহের অধিকারীরা প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানব ছিল। এবম্প্রকার প্রাচীন ধরণের মনুষ্যের মস্তক আর প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। এই জন্য এই জাতীয় মনুষ্যকে Homo-Neandertalensis অথবা Homo-primi-genius বলিয়া অভিহিত করা হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এই কঙ্কালের মস্তকের লক্ষণসমূহ অতি প্রাচীন ধরণের, এবং বর্ত্তমানের মানব-জাতির সদৃশ নয়। এই জন্যই এই কঙ্কালের অধিকারীকে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্যজাতির প্রতিনিধি বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

এবম্প্রকার অস্থি-কঙ্কালের আবিষ্কারের পর, জার্ম্মাণির হাইডেলবার্গের নিকট মাওয়ার (Mauer) নামক স্থানে মানবের নিম্ন দিকের দন্তপাটির ন্যায় একটী নীচের চোয়াল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই চোয়ালের Canine teeth নামক দন্তগুলি মানবের সেই নামধারী দন্তের সদৃশ বটে; কিন্তু চোয়ালের অস্থির আকার মানবশ্রেণীর বহির্ভূত। এই জন্য এই বিষয়ে নানাবিধ তর্কবিচার সত্ত্বেও, ইহার জাতি-নির্ণয় আজ পর্য্যন্ত অনিশ্চিত রহিয়াছে। তৎপরে আধুনিক কালে দক্ষিণ আফ্রিকায় (Broken Hill-mine, Rhodesia) একটী অতি প্রাচীন অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম Homo-Rhodensiensis দেওয়া হইয়াছে। এই কঙ্কালের মস্তকের নকল দেখিয়া ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে, তাহা নিয়াণ্ডারতাল মনুষ্য-জাতির অন্তর্গত বলিয়াই বোধ হয়, এবং তাহা বর্ত্তমান মেলানেসিয় (Melanesian) ও অষ্ট্রেলিয় আদিম অধিবাসীদের

মস্তকের অনুরূপ। বোধ হয় ইহা সুদূর অতীতে আণ্টার্টিক (Antarctic) ভূখণ্ডের সহিত সম্বন্ধের পরিচায়ক। কিন্তু সন্দেহের বিষয় এই যে, এই নর-কঙ্কালের সঙ্গে যে সব জন্তুর কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা আধুনিক। তৎপরে এই কঙ্কালের সংলগ্ন অন্য অস্থিসমূহের কোন সংবাদ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। এই জন্য সুধিমণ্ডলী এই বিষয়ে অধিক মতামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই।

এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে, এই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের (palaeolithic stone age) সহিত মনুষ্য-জাতির কি সম্বন্ধ? Gustav Schwalbe ও অন্যান্য অনেকে এই জাতিকে বর্ত্তমানের জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্যজাতির (Homo sapiens) সহিত এক জীবতাত্ত্বিক শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য করেন না। কিন্তু Ion Luschan বলেন যে, এই প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মনুষ্য হইতে বর্ত্তমানের মানবজাতির উৎপত্তি বিভিন্ন বলিয়া অনুমান করিবার হেতু নাই। কারণ, যাঁহারা সমগ্র মানব-জাতিকে এক বংশোদ্ভব বলিয়া গণ্য করেন (monogenist), তাঁহারা বলেন যে, এই নিয়াণ্ডারতাল মানবই ক্রম-বিকাশের দ্বারা বর্ত্তমানের জ্ঞানবিশিষ্ট মানবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই মতের বিপক্ষে উপরিউক্ত প্রথম দলের পণ্ডিতদের আপত্তি উত্থাপন করিবার কারণ এই যে, বর্ত্তমানের ইয়োরোপীয় ও ভূমধ্য সাগর-কূলবর্ত্তী দেশসমূহের জাতিগুলির উত্তর-পুরুষ Cro magnan জাতির সহিত নিয়াণ্ডারতাল জাতির কোন সম্পর্ক দেখিতে পাওয়া যায় না। এই উভয় জাতির আবির্ভাবের সময়ের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান রহিয়াছে; এবং এই দুইটি জাতিকে জাতি-সম্পর্কে সংযুক্ত করিবার ক্রম-বিকাশের শৃঙ্খল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

কিন্তু যাঁহারা মানব-জাতির উৎপত্তির একতা-রূপ মতের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন যে, যদিও প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানবের সহিত বর্ত্তমানের মানবের সম্পর্ক পরিষ্কার রূপে এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই, তথাচ বর্ত্তমানের বিভিন্ন মানব-জাতির মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা প্রাচীন প্রস্তর-যুগের নিয়াণ্ডারতাল মানবের নিকট সম্পর্কীয়। কারণ, অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীদের মস্তকের লক্ষণ নিয়াণ্ডারতাল মানবের ন্যায়। এই জন্যই এক্ষণে নৃবৈজ্ঞানিকেরা অতীতের নিয়াণ্ডারতাল মানবকে ও বর্ত্তমানের অষ্ট্রেলিয়াবাসী কৃষ্ণকায় জাতিকে ঘনিষ্ট সম্পর্কে সম্বদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। কিন্তু এই স্থলে কথা উঠে যে, উত্তর-ইয়োরোপের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানব-জাতির সহিত অষ্ট্রেলিয় জাতির এক-বংশীয়তা অর্থাৎ এক স্থলে ও এক বংশে উদ্ভব কি প্রকারে সম্ভব হইল? ইহার উত্তরে স্বভাবতই বলিতে হয় যে, এক কালে এই দুই জাতির সম্বন্ধ ছিল এবং তাহারা এক যায়গায় জন্ম গ্রহণ করিয়া, কালে বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, অষ্ট্রেলিয়া মনুষ্য-জাতির আদিম জন্মস্থান। লুসান বলেন যে, জিব্রাল্টার হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত একটি লাইন টানিলে যে সকল ভূখণ্ড ইহার অন্তর্গত হয়, তাহার মধ্যে কোন স্থান মানবের প্রথম জন্মস্থল ছিল। এই অনুমানের হেতু এই যে, এই লাইনের অন্তর্গত স্থলসমূহের মধ্য হইতেই Homo Primigeniusএর অস্তিত্ব স্বরূপ অস্থি-কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইতেছে। লুসানের মত এই যে, প্রাচীন কালে অষ্ট্রেলিয়া ও উত্তর-ইয়োরোপের মধ্যে সংযোগ ছিল, এবং ভারতবর্ষ এই সংযোগের সেতু স্বরূপ ছিল। তাঁহার মতে সিংহলের ভেদ্দা, ও ভারতের তামিল জাতিসমূহ উত্তর-ইয়োরোপ ও অষ্ট্রেলিয় জাতিদ্বয়ের সংযোগের মধ্যবর্ত্তী শৃঙ্খল স্বরূপ।

এতক্ষণে আমরা ইহাই লক্ষ্য করিলাম যে, নিয়াণ্ডারতাল জাতি সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য-জাতি, এবং তাহা বর্ত্তমান কালের জীবিত জাতিসমূহের মধ্যে অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় জাতির নিকট সম্পর্কীয়। এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন মানবজাতি স্থান ও জলবায়ুর বিভিন্নতার জন্য ক্রমবিকাশের অভিব্যক্তির দ্বারা বিভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা মানবজাতিসমূহের বিভিন্ন উৎপত্তির মতের পরিপোষক (polygenist), তাঁহারা বলেন যে, মস্তকের গঠন, গাত্রের বর্ণ, মস্তকের চুলের লক্ষণ, অবয়বের লক্ষণ, মুখাকৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন জাতির মধ্যে যখন এত পৃথক, তখন কি প্রকারে সর্ব্বপ্রকারের মনুষ্যজাতিকে এক বংশোদ্ভব বলা যায়? অর্থাৎ তাঁহারা বলেন যে, শ্বেত-কায় ইয়োরোপীয়, কৃষ্ণকায় কাফ্রি, পীতকায় চীনবাসী কি প্রকারে এক পিতার সন্তান বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু এবম্প্রকারের polygenism মতবাদ বর্ত্তমান কালের নৃ-বৈজ্ঞানিক ও জীব-বৈজ্ঞানিকদের (biologist) দ্বারা

ভারতবর্ষ



নির্ব্বাসিতা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রামকিঙ্কর পরামাণিক

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

গৃহীত হয় না। এ স্থলে জীবতান্ত্রিক বিচারের অবতারণা না করিয়া, ইহা উল্লেখযোগ্য যে, জীব-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, ডারউইনের ক্রমবিকাশ মতানুসারে স্থান ও জল-বায়ুর (milien) বিভিন্নতা ও পুরুষানুক্রমে নিজ শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ (Natural selection) প্রভৃতি জীবতান্ত্রিক নিয়মানুসারে মানব-জাতি কালে নানা-প্রকারের বিভিন্নতা ও বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎপরে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিরা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করিলে তাহা ফলবতী হয়। তাহাতে ইহাই প্রমাণিত হয়, যে, বিভিন্ন প্রকারের মানব জাতিরা পরস্পরের সহিত নিকট রক্ত-সম্পর্কে সম্বদ্ধ। পূর্ব্বে, জাতি-বিদ্বেষের ফলে ইহার বিপরীত সংস্কার ছিল।

যখন আমরা নিরূপণ করিলাম যে, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা প্রাচীনতম মনুষ্যের লক্ষণাক্রান্ত, তখন আমাদের অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিভিন্ন জাতি নির্ণয়ের সমালোচনা আরম্ভ করিতে হইবে। এই স্থলে বক্তব্য এই যে, একটী জাতির (Race বা people) স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে, কেবল মস্তকের বা নাকের মাপের index গ্রহণ করিলেই তাহা নির্দ্ধারিত হয় না। অথবা কেবল ভাষা দ্বারা জাতি-নির্ণয় হয় না। কিম্বা কেবলমাত্র রীতি-নীতি দ্বারাও তাহা নির্দ্ধারিত হয় না। একটী জাতিসমষ্টির মধ্যে শারীরিক লক্ষণের পার্থক্য দেখিয়া biotypeএর বিভিন্নতা নিরূপণ করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু একটী মানবজাতি—biotype, ভাষা, আচার-ব্যবহার, চর্চ্চা প্রভৃতির সমবায়ে সংগঠিত হয়। সেই জন্য কোন একটি দেশের জাতির স্বরূপ বর্ণনা করিতে হইলে, উপরিউক্ত সর্ব্বপ্রকারের অঙ্গের অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

অষ্ট্রেলিয়ার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসীরা মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রথম শাখা। ইহারা লম্বাকৃতি; ইহাদের মস্তকের গঠন লম্বা (dolicocephal), নাক চেপ্টা (chamolrrhine), আমাদের মত কাল লম্বা অথবা ঢেউ-খেলান চুল। ইহাদের চুলের বাহ্যাকৃতি ও তাহার মূলের morphological structure গোলাকৃতি। এ বিষয়ে এই জাতি, সিংহলের ভেদ্দা জাতি, দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের অধিবাসীরা, পশ্চিম এসিয়ার আর্য্য ভাষা ভাষীরা ও ইয়োরোপীয়েরা এক লক্ষণাক্রান্ত। এই কারণে অনেকে উত্তর-ইয়োরোপের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের মানবের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য ছাড়া, বর্ত্তমান কালের আর্য্য ভাষা ভাষী জাতিদের ও দ্রাবিড় ভাষা ভাষী জাতিদের সহিত ইহাদের সাদৃশ্য দেখিতে পান।

এই জাতির অষ্ট্রেলিয়ায় কখন আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার নিরূপিত হওয়া সম্ভব নয়। অষ্ট্রেলিয়া একটী ক্ষুদ্র মহাদেশ, তাহা এক সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এই জন্যই কাংগারু প্রভৃতি marsupial জাতীয় জন্তু ব্যতীত অন্যান্য মহাদেশে বিদ্যমান বৃহৎ জন্তু-সমূহের আবির্ভাব তথায় সম্ভব হয় নাই। ইহাই সম্ভবপর যে, এ স্থানের মানব-জাতি এই দ্বীপরূপ মহাদেশে অন্যান্য মানব-জাতির সহিত বিচ্ছিন্ন থাকিয়া নিজেদের প্রাচীনতম লক্ষণের বিশেষত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এই "প্রাচীনতম" অবস্থা তাহাদের স্বাভাবিক, অথবা বাহ্যপ্রকৃতির প্রতিকূলতাজনিত কি না,—অবশিষ্ট মানব-জাতির সহিত বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করার দরুণ তাহারা পূর্ব্বেকার উচ্চ সভ্যতার শিখর হইতে অধঃপতিত হইয়াছে কি না, তাহা আজ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত। এই জাতি অতি প্রাচীন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের একেবারে "অসভ্য" বলা যায় না। আজকালকার নৃ-বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বর্ত্তমান জগতে একেবারে অসভ্য (savage) জাতি বিদ্যমান নাই। যাহাদের "অসভ্য" বলা হয়, তাহারা কিছু না কিছু সভ্যতার স্তরে আরোহণ করিয়াছে। সেই প্রকারে অষ্ট্রেলিয় জাতিও নিজের কৃতিত্বে সভ্যতার রাস্তায় কতক অগ্রসর হইয়াছে। ইহাদের সভ্যতার যন্ত্রপাতির মধ্যে দুইটি বিখ্যাত—বুমেরাং ও চওড়া-ফলা-বিশিষ্ট বর্ষা-ফলক। এই বুমেরাংটি একটি ক্ষেপণীয় অস্ত্র। তৎপরে ইহাদের সামাজিক আচারের মধ্যে গুটিকতক বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়—প্রথম, দলশুদ্ধ বিবাহ (Group marriage); অর্থাৎ কোনও এক স্থলের এক দল যুবক অন্য এক স্থলের এক দল যুবতীকে দল-হিসাবে বিবাহ করে। ইহাতে দলের যুবক যুবতীর ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই,—ব্যক্তিগত ভাবে কেহ স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে সম্বদ্ধ নহে,—সমগ্র দলই স্বামী বা স্ত্রী সম্বন্ধে আবদ্ধ। সমাজ-তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ইহা এক প্রকারের প্রাচীন ধরণের বিবাহ-প্রথা। কিন্তু আজকাল নূতন সংবাদ আসিয়াছে যে, অষ্ট্রেলিয় জাতির দলশুদ্ধ বিবাহের পূর্ব্ব-প্রচারিত সংবাদ ঠিক নহে,—তাহাদের দল বিবাহ অন্য প্রকারের। তৎপরে ইহাদের

দীক্ষাগ্রহণ প্রথা (initiation ceremony) অদ্ভুত প্রকারের। যখন কোন বালক যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাহাকে এক সামাজিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, —সমাজের এক বয়ঃবৃদ্ধ লোক হাতুড়ি দিয়া দীক্ষা-গ্রহণ-কারীর একটী দন্ত সর্ব্ব-সমক্ষে ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে আর একটী অদ্ভুত প্রথা আছে—যাহা পূর্ব্বে মিশনারিরা একটা terrible rite বলিয়া বর্ণনা করিত; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন ব্যাখ্যা বাহির হয় নাই। তাহা এই: অস্ত্রোপচারের দ্বারা প্রস্রাব-দ্বারের কিয়দংশ ফাড়িয়া দেওয়া হয়। এই প্রথা অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্ব জাতি (tribes) মধ্যেই বিদ্যমান।

সর্ব্বশেষে আলোচ্য ইহাদের ভাষা। ইহাদের ভাষার সহিত অন্য কোন দেশের ভাষার সাদৃশ্য আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বহুকাল পূর্ব্বে Pritchard উল্লেখ করেন যে, ইহাদের ভাষার সর্ব্বনামের প্রথম পুরুষের ("আমি") সহিত দ্রাবিড় ভাষার প্রথম পুরুষের সাদৃশ্য আছে। তৎপরে এই ব্যাপারকে Bleek আরও বাড়াইয়া তুলিয়া হৈ চৈ করেন। শেষে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মাদ্রাজের বিশপ Caldwell তাঁহার "দ্রাবিড় ভাষার ব্যাকরণে" এই একটী কথার কল্পিত সাদৃশ্য দেখিয়া তাহাকে ভিত্তি করিয়া তাহার উপর ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া একটা মত প্রচার করিলেন—যেহেতু দ্রাবিড় ভাষা ও অষ্ট্রেলিয় আদিম অধিবাসীদের ভাষার স্থূল উৎপত্তি এক, অতএব তাহারা এক বংশ সম্ভূত। কিন্তু তিনি আবার ইহাও বলেন যে, অষ্ট্রেলিয় এই শব্দের সহিত বরং ইহার তিব্বতীয় প্রতিশব্দের বেশী মিল আছে। তার পর আসেন Huxley। তিনি বলেন, দক্ষিণ ভারতের বুমেরাং নামক অস্ত্র অষ্ট্রেলিয় জাতির সদৃশ, যাহা এই দুই জাতির এক-মূলত্বের আর একটি পরিচায়ক লক্ষণ। তিনি আরও বলেন যে, প্রাচীন মিশরেও এই প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। অতএব জাতিতত্ত্ব(ethnology) হিসাবে ইহারা সকলেই রক্ত-সম্পর্কে সম্পর্কিত।

কিন্তু শারীরিক নৃতত্ত্ব এ কথা একেবারেই মানে না। Craniologistদের মধ্যে জার্ম্মাণির পরলোকগত বিখ্যাত Rudolf Virchow ও ইংলণ্ডের William Turner, তৎপরে শারীরিক নৃ-বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে জর্ম্মাণ Emil Schmidt ও Gustave Fritoch এবং ফরাসী Callamaud প্রভৃতি সিংহলের ভেদ্দাদের ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষা ভাষীদের সহিত অষ্ট্রেলিয় জাতির কোন সাদৃশ্য দেখিতে পান নাই।

আবার অন্য দিকে Sarassin ভ্রাতৃদ্বয় উপরিউক্ত উড়ো কথার উপর নির্ভর করিয়া বলিলেন যে, অষ্ট্রেলিয় এবং ভেদ্দা ও দ্রাবিড় জাতিরা এক বংশ সম্ভূত। আর লুসান সেই সুর ধরিয়া বলিলেন যে, ভারতের আদিম অধিবাসীরা অষ্ট্রেলিয় ও ইয়োরোপের প্রাচীন প্রস্তর-যুগের জাতিগুলির মধ্যে সংযোগের সেতু স্বরূপ। তৎপরে সারাসিন Celebes দ্বীপে তোয়ালা (Toala) নামক এক জাতির আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহারা আকৃতিতে না কি তামিলদের সদৃশ। কিন্তু কথা এই যে, প্রাচীন কালে যে এই দ্বীপে তামিলদের উপ-নিবেশ স্থাপনের ফলে এই তোয়ালা জাতির আবির্ভাব হয় নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি? আবার অন্য দিকে Rudolf Martin মালাক্কা দ্বীপে (Senoi) সেনয় নামক একটী জাতি আবিষ্কার করিয়াছেন, যাঁহা তামিলদের সদৃশ বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। আসল কথা এই যে, অষ্ট্রেলিয় জাতিদের মাথার লম্বা আকৃতি ও সোজা বা ঢেউ-খেলান চুল (straight or wavy hair) ও গাত্রের কৃষ্ণ বর্ণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত অতি দূর বংশ সম্পর্কের পরিচায়ক হইতে পারে বটে, কিন্তু এই সম্বন্ধ ততটা ঘনিষ্ট, যতটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত বর্ত্তমান ইয়োরোপীয়দের আছে। লুসানের মতকে এই ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, প্রথম মানব জাতির মূল হইতে যে সব বিভিন্ন শাখা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে লম্বা-মস্তক-বিশিষ্ট জাতিরা ঘনিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ; এবং ইহারা অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ এসিয়া, আফ্রিকা, ও ইয়োরোপে বসবাস করে। ইহাদের মধ্যে পশম-চুলো (woolly hair) কাফ্রিরা লম্বা মাথা-বিশিষ্ট (dolico-cephal) মনুষ্য জাতি হইতে পৃথক হইয়া একটী উপশাখার সৃষ্টি করিয়াছে। আর লম্বা মাথা ও লম্বা চুলওয়ালা জাতিরা নিজেরা আর একটী শাখা ও পরে বিভিন্ন উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আর অষ্ট্রেলিয়, দ্রাবিড়, ইয়োরোপীয়েরা বিভিন্ন উপশাখা স্বরূপ। এই ভাবেই লুসানের "ভারত উভয় মহাদেশের সেতু স্বরূপ" বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

এই অষ্ট্রেলিয় কৃষ্ণকায়দের সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বেশীর ভাগ ইহারা দলবদ্ধ হইয়া মধ্য অষ্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে বসবাস করে। দক্ষিণ ভাগে যাহারা বসবাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকের ধমনীতে ইয়োরোপীয় শোণিত প্রবাহিত হইতেছে। বিশুদ্ধ জাতিরা দেশের অভ্যন্তরে ও উত্তরে নিজেদের প্রাচীন অবস্থায় বসবাস করিতেছে। ইহারা কৃষ্ণকায় বলিয়া কেহ কেহ চলিত কথায় ইহাদের "অষ্ট্রেলিয় নিগার" বলিয়া সম্বোধন করে। কিন্তু ইহারা নিগ্রো জাতির সম্পর্কীয় নহে। ইহাদের সহিত ইয়োরোপীয়দের রক্ত মিশ্রিত হইয়া যে সব বর্ণসঙ্কর বংশের উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতেছে। এই বর্ণ-সঙ্করেরা অশ্বতরের ন্যায় "বন্ধ্যা" হয় না। যাহারা এই কৃষ্ণকায় জাতিকে বুদ্ধিসম্পন্ন মনুষ্যের (Homo Sapiens) মধ্যে গণ্য করিতে চায় না, লুসান উপরিউক্ত প্রমাণ দেখাইয়া তাহাদের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিতে-ছেন। এই জাতির ছেলেরা স্কুলে শ্বেতকায় ছাত্রদের সহিত সমান ভাবে বিদ্যা অর্জ্জনে কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। লুসান বলেন যে, তিনি ১৯১৪ খৃঃ মেলবোর্ণ সহরে এই কৃষ্ণকায় জাতীয় এক বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় 'কালচারে'র উচ্চ শিখরে বিরাজ করেন ও উৎসাহের সহিত জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন।

ইহাদের ধর্ম্ম-জ্ঞানের সংবাদ সবিশেষ জানা নাই। কিন্তু হারবার্ট স্পেন্সার বলেন যে, ইহারা রুদ্রমূর্ত্তিকে ভয় ও ভক্তি করে; এবং ইহাদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অনেকে বলেন যে, মানবের আদিম অবস্থায় ভয় হইতেই ধর্ম্ম-বিশ্বাস উৎপন্ন হয়।

সর্ব্বশেষে এই জাতির বিষয়ে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, ইহারা নিজেদের দেশের Marsupial জন্তুর ন্যায় অবশিষ্ট জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানবজাতির সর্ব্বপ্রাচীন-তম শাখার অস্তিত্বের নিদর্শন স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছে। পৃথিবীর অবশিষ্ট মানব-সমাজ ক্রমবিকাশ দ্বারা বর্ত্তমান স্তরে উপনীত হইয়াছে; কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার জাতিসকল পৃথিবীর এক প্রান্তে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকিয়া সৃষ্টির একটি প্রাচীন চিহ্ন স্বরূপ বিরাজ করিতেছে। আর এই মানব-জাতির সহিত ভারতের আদিম অধিবাসীর রক্ত-সম্পর্কের প্রমাণাভাব। বুমেরাং যাহা দক্ষিণ ভারতে "ভেলাম তাড্ডি" অথবা এই প্রকার একটা নামে অভিহিত হয়, তাহাকে এরূপ দুইটী জাতির সাদৃশ্যের নিদর্শন স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এ বিষয়ে জাতিতত্ত্ববিদ্ Prof. Weule বলেন, উভয় জাতির অস্ত্রের উৎপত্তির সূত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা প্রকারের বুমেরাং প্রচলিত আছে। আর যন্ত্র-পাতি, আচার-ব্যবহার, চর্চ্চার দ্রব্য (cultural objects) এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে গৃহীত হয়। এই সকল কারণে আদিম ভারত-বাসীকে অষ্ট্রেলিয়বাসী কৃষ্ণকায় অধিবাসীর সহিত এক জাতীয় বলা ভুল বলিয়া মনে হয়; এবং এই ভ্রমপূর্ণ মতটিকে ভিত্তি করিয়া Harry Johnstone এর মত যাঁহারা ভারতবাসীদের "austroloid" জাতি বলেন, তাঁহারা বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করেন না।

চিত্রশালায়

শ্রীগোপাল হালদার এম-এ

[বিশলা-নগরীর তরুণ শিল্পী শ্রীলেখ-এর গৃহে বিখ্যাত বণিক্ ধনপতির কন্যা সুনতা এসেছেন তার চিত্রশালার অঙ্কিত পট দেখতে। শ্রেষ্ঠীকন্যা তরুণী; বিশলায় তার বিদুষী ও রসিকা নামে খ্যাতি আছে। সঙ্গে ছিল তাঁর সহচরী শান্তিকা। চিত্রশালার সজ্জিত চিত্রগুলির সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্নিমেষ চোখে দেখতে দেখতে সখী এক-একবার পিছিয়ে পড়ছিল।

'আমার পরম-গৌরবের এ দিন, সুনতা। মনে হচ্ছে যেন এখানকার জমানো আঁধারে আজ প্রথম সূর্য্যালোক ঢুকল।'

'আমারি বরং গৌরবের এ দিন, শিল্পি! তাম্রলিপ্ত থেকে তক্ষশিলা পর্য্যন্ত সমস্ত ভারতভূমি বিশলার রাজ-শিল্পীর পায়ে শ্রদ্ধা-নম্র-শির;—সেখানকার শত নর-নারীর চিত্ত তাঁর তুলিকার টানে টানে হাসে-কাঁদে, মরে-বাঁচে। কিন্তু তাঁর কলা-মন্দিরের বিচিত্র ঐশ্বর্য্য দেখার মত সৌভাগ্য আজ পর্য্যন্ত কয়জনার হয়েছে?'

'কোন্ শিল্পীরই অদৃষ্টে বা বিশলার নিপুণা বিদুষী

শ্রেষ্ঠীকন্যা সুনতাকে আপনার গৃহে পাওয়ার মত সৌভাগ্য-লাভ ঘটেছে ?'

—'ও পটখানিতে কি আঁকা আছে, শিল্পি ?'

'তপস্বিনী গৌরী।—কেমন বোধ হচ্ছে তোমার, সুনতা ?'

'অপরূপ! মুখের ওই একান্ত সাধনার ভাতিটুকু তুমি কি করে ফোটালে ?'

'তোমার মনে না থাকতে পারে, সুনতা, কিন্তু অনেক ঊষায় আমি ভগবান্ একলিঙ্গের মন্দিরে এক সদ্য-স্নাতা পূজারিণীকে অপলক চোখে দেখেছিলুম। সত্যি বলছি, তুমি অতটা লজ্জিত হয়ো না সুনতা, তোমারি মুখের সে শুচিতাটুকু আমি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলুম।'

'না হয় তাই মানলুম; কিন্তু আমাদের মুখের আভা দেবতার মুখে অর্পণ করা কি সমুচিত হয়েছে ?'

'আমি ত ভেবেছি—এক দেবতার মুখের আভাই আর-এক দেবতার মুখে সমর্পণ করলুম মাত্র।'

'শ্রীলেখ, তুমি যা তা বকছ। এরূপ অশ্রদ্ধ কথায় পাপ স্পর্শাবে।'

'খেলাচ্ছলে পাপকে অনেকবার নিমন্ত্রণ করেছি, একবার নয় সত্য-সত্য তাকে এমনি বরণ করলুম।'

—'এটি ? এটি কামদেব ?'

'হাঁ—বনপ্রান্তের বৃক্ষান্তরালে মৃদুমন্দ হাসে শর-সন্ধানে ব্যস্ত। এ শরের লক্ষ্য হচ্ছেন স্বয়ং তপোরত মহেশ্বর।'

'সুন্দর!—কিন্তু অধর প্রান্তের ওই হাসিটুকুর আড়াল থেকে কেমনতর একটি ইঙ্গিত ছুটে বেরুচ্ছে না ?'

'শিল্পীর সমস্ত অন্তরের কামনা ওইখানেই মুখর করে তুলতে চেয়েছিল সে। কিন্তু তার কথা বোধ হয় লিখে উঠতে পারল না।'

'কিন্তু ওই শর-কটি ? সব কয়টিই এখনো কুঁড়ি যে!'

'লক্ষ্যের অন্তর যখনই শর বিঁধবে, তখনই সব কয়টি কুঁড়ি ফুটে উঠবে। পুষ্প-ধনুর সব কয়টি পুষ্পই এখনো মুকুল—যেন শিল্পীর নবজাত কামনা;—ঈপ্সিতার হৃদয় ছুঁলেই এ কামনা ফুলন্ত হয়ে উঠবে।'

—'এ কে ? কুয়াসার মধ্যে একটি অস্পষ্ট নারীমূর্ত্তি নয় ?'

'হাঁ; এই শোকার্ত্ত রতি। মদন-বিয়োগ-বিধুরা বিরহে ও বিষাদে মরণাপন্না। নিরাশ প্রেমের চিরন্তন ব্যথাই হচ্ছে এর মর্ম্মকথা।'

'কিন্তু এত ধোঁয়া কেন ?'

'অন্তরের আগুন যখন পথ খুঁজে পায় না, নিরাশার ছাই তাকে যখন ঢেকে ফেলতে চায়, তখন সে এমনি ধূমায়িত হয়ে বেরোয় দীর্ঘশ্বাস রূপে।'

'এর পরে হর-গৌরীর আর কোনো পট নেই যে ?'

'শিল্পীর অন্তর যে পর্য্যন্ত নাগাল পেয়েছে, যেথান পর্য্যন্ত সে এসে পৌঁছেছে, সেইখান পর্য্যন্তই আমি চিত্রিত করেছি।'

'অন্তত একটি হর-গৌরীর মিলনের চিত্র না আঁকলে কিন্তু এ চিত্র কয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।'

'তা সম্পূর্ণ করবার মত সৌভাগ্য আমার হবে কি সুনতা ?'

—'ওখানি কার চিত্র আঁকছ ?'

'ওই ? ওখানি মহারাজের বিশেষ আদেশে আঁকছি রাজকন্যা চন্দ্ররেখার। কাশীর যুবরাজের সঙ্গে রাজকন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে যে দূত যাবে, তার সঙ্গে দেওয়ার জন্য।'

'আর ওই ওখানি ? যেখানি রেশমের বস্ত্রে আচ্ছাদিত, ঠিক তোমার শিল্পাসনের সামনে ?'

'আচ্ছাদন সরিয়েই দেখ না সুনতা।—বিস্মিত হলে যে ? কার চিত্র বলে মনে হচ্ছে ?'

'তাই ত—তুমি ত পিতার আদেশমত আমার প্রতিলিপি তাঁকে দিয়েছ দেখেছি; তবে আবার এই পটখানি এল কোথা থেকে ?'

'ও সে পট নয়, সুনতা। সে পট আমি সত্য-সত্যই দিয়েছি।—এ আমার কলা-লক্ষ্মী—শিল্পীর মানসী-মূর্ত্তি—'

'ওই কোণের পট কয়খানি কি ? মেঝের উপরেই যে অনাদৃত পড়ে আছে।—কতকালের ধূলি জমে উঠেছে ওদের উপরে।'

'ওগুলো আমার খেয়াল-খেলা তুলি আর রং দিয়ে। ও সব যাক্। কিন্তু আমার কলা-লক্ষ্মীর কথা তোমায় শুনতেই হবে। যে দিন প্রথমে শ্রেষ্ঠীরাজ তাঁর গৃহে আমায় চিত্রাঙ্কনের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সে দিন থেকেই আমার মানস-লোকে এ মূর্ত্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছয় মাস ধরে তাকেই আমি নানা দেবদেবীর রেখার বাঁধনে ধরতে চেয়েছি। কিন্তু আজো—ও কি, চলে যাচ্ছ যে।'

'যাচ্ছি না,—ওই পট কয়খানি আনতে গিয়েছিলুম। ইঃ! কী ধূলাই জমেছে!'

'আহা, সুনতা, তোমার বহুমূল্য বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে ওই সামান্য পট কয়খানির ধূলা ঝাড়ছ যে! ছিঃ ছিঃ—নষ্ট হয়ে যাবে যে!'

'তা থাক্। তোমার চিত্রপটের চেয়ে এ রক্তাম্বরের দাম কি বেশী ? অন্তত আমাদের তা মনে হয় না।'

'সত্যি বলছ সুনতা! তবে আমার সমস্ত চিত্রশালাকে তোমার কাছে সঁপে দেওয়ার মত সৌভাগ্য হবে কি ?'

—'বেশ করুণ এ চিত্রখানি! কার এটি ?'

'কিন্তু আমি যে জিজ্ঞাসা করছিলুম তার জবাব ?'

'আহা বলোই না এ পটখানি কার ?'

'প্রতি প্রভাতে যে ভিক্ষুকের গানে আমার ঘুম ভাঙত, তার। কিন্তু, তুমি যে আমার—'

'আর এইটি ?'

'প্রভাতে নদী থেকে স্নান সেরে যে পুরনারীরা আমার বাতায়নের তল দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ফিরে, তাদেরি কারুর। তখনো তোমায় দেখিনি সুনতা। তোমায় যেদিন দেখেছি—'

'এই ক্ষুদ্রায়তন পটটুকু ?'

'না, আমার কথা শেষ করে নিই।—সেদিন থেকে আমার সমস্ত শিল্পে তোমারি বন্দনা গেয়েছি—রাগ করো না, আমার এখনো অনেক কথা বলবার আছে। তোমায় তা শুনতেই হবে।'

'তুমি কি যে বলছ, শিল্পি! কথা ? কথা আমরা এর পরে ঢের বলতে পাব। কিন্তু আগে চিত্র দেখা সাঙ্গ হোক্।'

'সত্যি বলছ,—তুমি তা হলে এর পরে আমার যা বলবার আছে, শুনবে। সত্যি বলছ ?'

'বেশ।—এখন বল, এ পটটুকু কার ?'

'ও! এইটুকু ?—বেশ একটা মজা আছে এই পটটুকুর বিষয়ে। মহারাজের মালঞ্চের যে মালাকরকে মহারাজ আমার প্রতি তুষ্ট হয়ে প্রতি দিন প্রভাতে আমায় মালা ও ফুল দিয়ে যেতে আদেশ করেছিলেন, তারি মেয়েটির।—বেশ, এবার তা হলে শোনো আমার কথা—'

'সে মেয়েকে কি করে দেখলে তুমি ?'

'সে-ই ত আমার জন্য বেছে বেছে ভালো ভালো ফুলে মালা গেঁথে, সবচেয়ে বেশী সুগন্ধ ফুলে মালা তৈরী করে আমার কাছে তা নিয়ে আসত। এক দিন সে কিশোরীর মুখখানিকে তার হাতের তোড়ার আড়ালে আধ-ঢাকা দেখে আমার বেশ মিষ্টি লাগল। তার বড় চোখ দুটিতে একটি ভীত-চকিত চাহনি ছিল। আমি বললুম, 'ভাখ, কাল সকাল করে আসিস তোর একখানি পট আঁকব।' পরদিন ঊষায় ঘুম থেকে উঠতে না উঠতেই দেখলুম একখানি বাসন্তী রংএর শাড়ী আর রক্তের মত গাঢ় লাল রংএর অঙ্গরাখা পরে সে আমার দুয়ারে বসে আছে। তার চোখ মুখ অস্বাভাবিক রকম দীপ্ত। আমি তাড়া-তাড়ি কোনো রকমে একখানি পট এঁকে তাকে দিতে গেলুম। সে আমায় ফিরিয়ে দিয়ে কেঁদে পালিয়ে গেল। তার পরদিন থেকে সে আর আমায় মালা আর তোড়া দিতে এল না। কয়দিন পরে শুনলুম, মালঞ্চের যেদিকটা রাজপুরীর পরিখার দিকে গিয়ে শেষ হয়েছে, এক দিন প্রত্যূষে ফুল তুলতে গিয়ে সে সেখানে পা ফস্কে পড়ে ডুবে মরেছে।'

'তার পর ?'

'তার পর আর কি ? পটখানি আমার কাছেই রয়ে গেছে তাই। চল, এবার আমরা বসিগে। আমার আজ অনেক কথা বলবার আছে।'

'এই মেয়েটির কথা তুমি আর ভাবো নাই ?'

'সে আবার ভাব্‌বো কি ? সে ত আমার ভাবনায় কোনো কালেই ঠাঁই পায় নাই।'

'হুঁ'—

'চলো সুনতা—কই, দাঁড়িয়ে রইলে যে ওই পটটুকুই নিয়ে ? বলেছ না আমার কথা শুনবে এবার ?'

'হুঁ—শান্তিকা গেল কোথা ?'

'ওই পিছনে, চিত্র দেখছে। কি কাজ তাকে ?'

'শান্তিকে!—কোথা ছিলি ভাই এতক্ষণ ? এবার বাড়ী চল্।'

'কিন্তু আর একটু দেরী করবে না, সুনতা ? একটুকু—শুধুমাত্র একটুকু। অন্ততঃ ওই ঘরটা দেখে যাবে না ?'

'না, আমি বড় পরিশ্রান্ত। আজ যাই।'

'কিন্তু ওই ঘরখানাতেই যে আমার শ্রেষ্ঠ চিত্রপট কয়খানা রয়েছে। দেখবে, এসো।'

'ক্ষমা করো। আর এক দিন এসে বরং দেখব।—চল্ শান্তিকা।'

'কিন্তু আমার কথা শুনলে না ?'

'ওই ছোট মেয়েটির চিত্রখানিই তোমার শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। তোমার শিল্পাসনের সামনে ওখানিই রেখে দিয়ো।'



কথা ও সুর—
শ্রীঅতুলপ্রসাদ সেন

স্বরলিপি—
শ্রীসাহানা দেবী

আশাবরী—কাওয়ালী

ওগো দুঃখের সুখের সাথী,
সঙ্গী দিন রাতি
সঙ্গীত মোর ;
(তুমি) ভব মরু প্রান্তর মাঝে
শীতল-শান্তির লোর।
বন্ধুহীনের তুমি বন্ধু,
তাপিত জনের সুধাসিন্ধু,
বিরহ আঁধারে তুমি ইন্দু,
নির্জ্জনজন-চিত-চোর।

দীনহীন পথচারী
সম্বল হে তুমি তারি—
সম্পদে উৎসবে জনমনোহারী
সর্ব্ব তরে তব ক্রোড়!

তব পরশ পেয়ে জাগে,
সুপ্ত স্মৃতি কত জাগে ;
বিস্মৃত কত অনুরাগে
রাঙ্গে হৃদয় মন মোর!
(যাহা) বাক্য কহিতে নাহি জানে,
অন্তরে কহ তাই তানে ;
মুক্ত কর তুমি ছিন্ন কর গানে
বন্ধন কঠিন কঠোর।

গীত-মুখর তরু-ডালে
তব প্রেম অমৃত ঢালে,
পুষ্প দোলে তব তালে,
অম্বরে নাচে চকোর।

ভক্ত-কণ্ঠে তুমি ভক্তি,
বীর করে নব-শক্তি,
সুর, নর, কিন্নর, বিশ্ব-চরাচর
তব মোহ-মন্ত্র-বিভোর ॥

II { মা মা | ০ মা পা পা পর্সা | ১ ণা দা পা পা | + মা পা পদা মপা | ৩ ।- মজ্ঞা রা
{ ও গো দু - খ সু খে র সা থী স - ঙ্গী দি - ন রা

সা | রা মা পা পর্সা | ১ ণর্সা -া ণদা ।া | + (পা ।- দপা দা | ৩ মা -া)} পা -া -া -া | ।- ।-
তি স - ঙ্গী ত - - মো - - - - - র্

০ পা পদা | মা পা ণা র্সা | ১ ণর্সা র্রজ্ঞা র্সরা র্সা | + ণা ধা ণা ।- | ৩ পণা দপা
তু মি ভ ব ম রু প্রা - ন্ত র মা - ঝে - - -

০ মপা ।- | সা ।- রা মা | ১ পা ।- পা পর্সা | + ণর্সা ।- ণা দা | ৩ পা দমা II
- - শী - ত ল শা - ন্তি র লো - - - - র্

০ মা ।- মা মা | ১ মা ।- মা পা | + গমা পদা পা ।- | ৩ ।- ।- ।- ।- | ০ মজ্ঞা ।- মা মা |
ব ন্ধু হী নে র্ তু মি ব - - ন্ধু - - - - তা পি ত জ
ত ব প র শ য বে লা গে সু - খ - গু স্মৃ
গী ত মু খ র ত রু ডা লে ত ব প্রে ম

১ ণদা ।- ণা ণা | + ণা র্সা র্সা ।- | ৩ ।- ।- ।- ।- | ০ ণা র্সা সর্জ্ঞা র্জ্ঞা | ১ র্জ্ঞা র্ঋা ঋা
নে র সু ধা সি - ন্ধু - বি র হ আঁ ধা রে
তি ক ত জা গে বি স্মৃ ত ক ত
অ ত ত ঢা লে পু ষ্প দো লে -

র্সা র্সঋা | + ণর্সা র্গর্সঋা ণর্সা ।- | ৩ ণদা ।- পা ।- | ০ মা ।- মা মা | ১ পা ।- পা
তু মি ই ন্ দু - - - নি - র্জ্জ ন জ ন চি
অ নু রা গে রা ঙ্গে হৃ দ য় ম
ত ব তা লে অ ম্ব রে না - চে

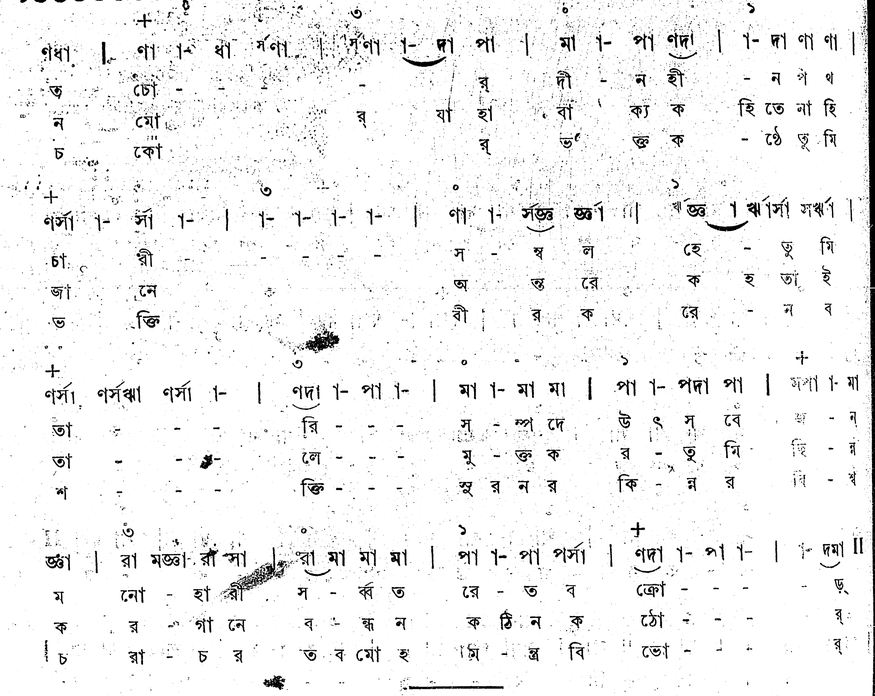

বাদানুবাদ

সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক ?

শ্রীসুনীতি দেবী

প্রতিবাদ

গত ফাল্গুনের ভারতবর্ষে "সতীত্ব মনুষ্যত্বের সঙ্কোচক না প্রসারক ?" এই শিরোনামা দিয়া একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে—লেখিকা শ্রীরাধারাণী দত্ত। আমি সেই লেখিকাকেই উদ্দেশ করিয়া কয়েকটি কথা বলিব।

শ্রীমতী লেখিকা, তুমি যে মনোধর্ম্মের স্বাভাবিক দিক্ দর্শন করাইয়াছ, ঐ দিক্-দর্শনই তোমার ভ্রান্তি। তুমি সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের রহস্য বুঝ নাই, মনোধর্ম্মের বিচিত্রতা বুঝিতে চেষ্টা কর নাই,—কেবল একট বিকৃত শিক্ষালব্ধ ভাবের টানে প্রবন্ধ লিখিয়াছ। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বুঝিয়াছ—জগতের মানব-মাত্রেরই মনোধর্ম্ম একই ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া থাকে ? সৌন্দর্য্য-বোধ কি সর্ব্ব একই ভাবে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে ? সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব জাতি কি একই ভাবে মহত্ত্বের অনুভূতি করে ? জগতের মানুষ-মাত্রেই কি একই প্রকারে দেবত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে ? কৈ তাহা ত দেখিতে পাওয়া যায় না। এই যে দেখিতে পাইতেছ, দেশ-ভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে, স্ত্রী-পুরুষ-ভেদে, এমন কি ব্যক্তি-ভেদে পর্য্যন্ত রুচি-বৈচিত্র্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহার কোন্‌টা স্বাভাবিক কোন্‌টা অস্বাভাবিক, তাহা তুমি বলিয়া দিতে পার কি ? তুমি কি বলিবে—আমি যে তোমার লেখা দেখিয়া লজ্জা অনুভব করিতেছি,

আমার এ মনোধর্ম্ম অস্বাভাবিক ? আর তুমি হিন্দু রমণীর স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অপঘাত ঘটাইয়া তাহার স্থানে বলপূর্ব্বক যে বিদেশীয় মনোধর্ম্মের আসন স্থাপন করিয়াছ, এইটা কি স্বাভাবিক ?

ঐ যে আমার বাড়ীর শালগ্রাম-শিলায় আমি দেবত্বের বিকাশ দেখিতেছি, সর্ব্বেশ্বরের অধিষ্ঠান দেখিতেছি,—ভক্তিপূত চিত্তে যদি তাঁহার দ্বারে মস্তক অবনত করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আত্মাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি, তাঁহার কৃপায় কত বিপদের হাতে রক্ষা পাইতেছি, কত অমঙ্গল দূর হইয়া যাইতেছে,—আছে কি অন্য কোন জাতির শক্তি এমন দেবত্বানুভবে ? বলিয়া দাও দেখি—কোন্‌টা স্বাভাবিক ?

সতীত্বের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ যাহাই হউক, হিন্দু রমণীর মধ্যে তাহা পাতিব্রত্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখিকা কি ব্রত-নিয়ম কাহাকে বলে তাহা অবগত আছেন ? লেখিকা যখন স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের ফলে মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখিয়াছেন, তখন সংযমই যে মানুষে ও পশুতে পার্থক্যের বেষ্টনী, তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিবেন না। তবে লেখিকা যে বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহাতেও, সংযমের বেষ্টনী-বন্ধনই যে মানুষের শিক্ষার উদ্দেশ্য, আর এই উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় না বলিয়াই মানুষের আইন, কানুন, স্মৃতি, নিন্দা, সামাজিক পারিবারিক শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি কৃত্রিম উপায়ে মানুষকে সংযমের বেষ্টনীর মধ্যে রক্ষার প্রয়োজন হইয়া থাকে—ইহা তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। লেখিকা স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম ও শরীর-ধর্ম্মের বিকাশে মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইলেও, জগতের কোন সভ্য মানুষই তাহা পায় নাই—ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। কারণ, জগতে কোন মানুষই নিজের পুত্র কন্যাগণকে স্বাভাবিক মনোধর্ম্ম ও শরীর-ধর্ম্ম পরিপোষণের জন্য অবাধ-অধিকার দেয় না ; তাহার সংযমের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। তবে হিন্দু ছাড়া সে ব্যবস্থায় অধিক সফল অন্য মানুষ এ পর্য্যন্ত হইতে পারে নাই। হিন্দুর মত সংযমের মাহাত্ম্য আর কেহ বুঝিতেও পারে নাই। যাউক, সে কথার এ স্থান নহে।

কায়মনোবাক্য পবিত্র ও সংযত করিয়া দেবারাধনার নাম ব্রত। ব্রতের প্রধান অংশই সংযম। কাজেই পবিত্র শরীরে সুনত বাক্যে সংযত চিত্তে পতি-দেবতার সেবাই পাতিব্রত্য বা সতীত্ব। এই ব্রতের সংস্কার হিন্দু রমণীর হৃদয়ে স্বভাবতই ফুটিয়া উঠে ; শিক্ষায় উপদেশে সংসর্গে তাহা পরিপুষ্ট হয়। সৌভাগ্যবলে ব্রতাচরণের সুযোগ ঘটিলে ক্রমে অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা দৃঢ় হইয়া যায়।

স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অনুসরণে ছুটিয়া বেড়াইলে তাহা লাভ করা যায় না। স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের অনুপ্রেরণায়—সৌন্দর্য্যের পায়ে দেহ উপঢৌকন দিলেও এ মহাব্রত পালন করা যায় না।

আমি দর্শন জানি না। তবুও একটু আধটু যাহা শুনিয়াছি, তাহাতেই বলিতে পারি, সাংখ্য-দর্শনের জড়ের আকৃতির কথা লেখিকা মোটেই বুঝিতে পারেন নাই। যদি বুঝিতেন, তাহা হইলে জড়ের আকৃতির সহিত স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের সাম্য স্থাপন করিয়া স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের বিকাশ ঘটান কর্ত্তব্য বুঝিতেন না। সাংখ্য-দর্শনে সৃষ্টি-কার্য্যে জড়ের আকুতিকে যত প্রাধান্য দান করা হইয়াছে, অন্য কোন দর্শনে তাহা দেওয়া হয় নাই। আবার স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের নিগ্রহকে সাংখ্য মতে যত উচ্চ স্থানে স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাও অন্য কোন দর্শনে করা হয় নাই। সাংখ্য-দর্শনেই বলা হইয়াছে, ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) অত্যন্ত নিবৃত্তি পুরুষার্থ—অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজন। তাহা লাভ করিতে হইলে, চাই বিষয়-বিতৃষ্ণা, চাই যোগ, চাই তপস্যা, চাই ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ—মনো-নিগ্রহ। ইহার সহিত স্বাভাবিক মনোধর্ম্মের সম্বন্ধ কতটা ? লেখিকা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, "আমি প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার সপক্ষে কথা বলি নাই ইত্যাদি" ; আর এক স্থানে বলিয়াছেন, "যাহাকে প্রকৃত সত্য বলিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারা যায়, তাহা অকপটে স্বীকার করাই মনুষ্যত্ব"। আবার সত্যং শিবং সুন্দরংও তিনি এক স্থানেই দেখিতে চাহিয়াছেন। সত্যং শিবং সুন্দরং কথা কয়টি লেখিকা যে শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বাহির করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রেই বলিতেছে, ত্রিজগতে যাহা কিছু সৃষ্ট বস্তু সব অসত্য, সমস্ত অশিব ও অসুন্দর। তবে এই জগতের সৌন্দর্য্যের পায়ে লুটাইয়া লেখিকা সত্য উপলব্ধি করিবেন কি করিয়া ? দেহ ও মন স্বভাবের পায়ে উপঢৌকন দিয়া প্রবৃত্তির স্রোতে উজান বাহিতে চান—কোন শক্তিতে ?

কেশববাবুর প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীরাধারাণী দত্ত

গত মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার সতের সমর্থন করিয়াও যে দুই একটি আপত্তি জানাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য কিছু আছে।

তাঁহার মতে আমার কথা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও, ঐ সত্য প্রকাশের না কি এখনও সময় হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

"উক্ত প্রবন্ধে লেখিকা এই বিষয়ের খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করিয়া নারীর সতীত্ব-সমস্যার যে সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহার এই সমাধান তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা বিদুষী রমণীর পক্ষে সত্য হইলেও, তাহা যে আমাদের নারী-সমাজের ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই সত্য, এ কথা কোনও মতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না।"

তিনি বিশ্বাস না করিলেও, তাঁহার এই কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় সকলকার পক্ষেই সত্য ; কারণ, সত্য কখনও ব্যষ্টি বা সমষ্টির সুবিধা-অসুবিধার অপেক্ষা রাখিয়া প্রকাশিত হয় না। সত্য নিজগুণে স্বতঃসিদ্ধ, স্বতোদ্ভাষিত এবং স্বয়ম্প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা ঢাকিয়া রাখা চলে না এবং ঢাকিয়া রাখিবার চেষ্টা

করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। সত্য "ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই" স্বরূপে সুপরিস্ফুট হইবে, অথচ তাহার বিপরীত দিকের ছায়া-সম্পাত ঘটিবে না, এইরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। কারণ, আলোকের পশ্চাতেই যেমন অন্ধকার, সেইরূপ সত্যের বিপরীতে মিথ্যাও জগতে চিরকালই আছে; এবং জগতে কোনও বিষয়ই ও কোন সত্যই "ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক" লোকের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করিয়া একই ফল প্রসব করিতে পারে না; কারণ, প্রত্যেক মানবের স্বভাব রুচি ও মনের ক্রিয়া বিভিন্ন প্রকারের; সুতরাং সর্ব্বত্রই একই প্রকার সুফল বা কুফল আশা করা বিড়ম্বনা।

ইহার পর কেশববাবু লিখিতেছেন, "আজ যখন নারী-সমাজ হইতেই কোনও উচ্চ-শিক্ষিতা ভদ্র মহিলা কর্ত্তৃক ঐ সত্য প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাতে আনন্দিত হইবারই কথা। কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে আমার মনে যুগপৎ সংশয় ও আশঙ্কার উদ্রেক হইয়াছে।"

লেখক মহাশয়ের মতে—যে-সত্য অপ্রিয়, তাহা প্রকাশেও তিনি বিরূপ নহেন, এবং মিথ্যার আবরণে এই সত্য আবৃত করিবারও তিনি প্রয়াসী নহেন, বরং আনন্দিত হওয়া উচিত বিবেচনা করেন। সুতরাং "আশঙ্কা'র উদ্বেগে "সংশয়" সন্দেহের দ্বিধায় সত্যের অবমাননা অথবা সত্য-গোপন করার এই উপদেশ দেওয়া তাঁহার ন্যায় সত্য-গ্রাহীর পক্ষে আদৌ সুশোভন হয় নাই বলিয়া আমি মনে করি। তা' ছাড়া, তিনি আমাকে যে ভাবে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা যে বর্ত্তমান অবস্থারই একেবারে গোড়ার কথা, ও সংস্কার সাহিত্যের মূল-ভিত্তি—এই সাধারণ তথ্যটুকুও অন্ততঃ তাঁর জানা উচিত ছিল।

সত্যের আর একটি নাম 'স্বয়ংপ্রকাশ'। উহা কাহারও চেষ্টায় অপ্রকাশিত থাকিতে পারে না। আর প্রকৃত-সত্যের অনুসরণ করিতে পারিলে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই; কারণ, 'সৎ' শব্দ হইতে 'সত্য' শব্দের উৎপত্তি। 'সৎ' শব্দ শুভবাচক,—যাহা সৎ তাহা শুভ। সুতরাং সত্য হইতে অশুভের আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। যাঁহারা সত্য প্রকাশের ভয়ে অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন, তাঁহারা সত্য-সন্দর্শনে নানা কল্পিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিবেন, সন্দেহ নাই। সে কথা স্বতন্ত্র।

কেশববাবুর মতে—"সভ্য ও শিক্ষিত জগতের অন্যান্য নারী-সম্প্রদায়ের সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মের প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হইয়া, সর্ব্ব প্রকারে পুরুষের সাহায্যকারিণী হইতে এবং অত্যাচার নির্য্যাতন প্রভৃতি হইতে বুদ্ধি ও কৌশলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সত্য বর্ত্তমান নারী-সমাজে প্রচারিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত নহে। কেন না, শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাব হেতু অশিক্ষিতা দুর্ব্বলচেতা নারী এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদা না বুঝিয়া.....প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিবে না তাহাতে বিশ্বাস কি?"

তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ স্বীকার্য্য হইলেও, তাঁহার যুক্তি সমীচীন নহে। তিনি একটু ধীর ভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে সমর্থ হইবেন যে এই সত্য যদি ঐ সভ্য-জগতের নারী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ—যাঁহাদের কর্ম্ম, জ্ঞান, শিক্ষা, দীক্ষায় সমকক্ষ হইতে পারিলে আমাদের 'অশিক্ষিতা বঙ্গনারী সমাজ' এই সত্য-গ্রহণের উপযুক্তা হইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস, সেই তথাকথিত "উচ্চশিক্ষায়" শিক্ষিতা নারী সম্প্রদায় মধ্যেও "ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক নারীর পক্ষেই" এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাদার উপলব্ধি ও আদর আমাদের বর্ত্তমান নারীগণ অপেক্ষা অধিক-মাত্রায় হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এই সকল তথাকথিত শিক্ষা, জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিমত্তা থাকিলেই যে তাঁহারা সকলেই এই সত্যের প্রকৃত মর্য্যাবধারণ করিতে বা উহার মর্য্যাদা বুঝিতে সমর্থা হইবেন, ইহার অন্যথা হইবে না—এরূপ মনে করা অন্যায়। সত্যের মর্য্যাদা যদি কেহ বুঝাইতে সমর্থ হয়, ইহার অকৃত্রিম স্বরূপ নারীর হৃদয় মধ্যে প্রকাশ করিতে যদি কেহ সমর্থ হয়, তবে সে একমাত্র তাহার বিবেক। এই বিবেক-বুদ্ধি মানুষের সহজাত। শিক্ষার দ্বারা তাহার উৎকর্ষতা হয় ত' সম্ভব, কিন্তু তাহা অর্জ্জন করা অসম্ভব।

আধুনিক সভ্য-জগতের জ্ঞানবতী শিক্ষিতা নারীগণ কেবল মাত্র তাঁহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান দ্বারা ইহার সত্য স্বরূপ কখনই গ্রহণ করিতে সমর্থা হইবেন না, যদি তাঁহাদের বিবেক স্বাধীন ও জাগ্রত না থাকে। সত্য হইতে মানুষকে বিচলিত বা ভ্রমাত্মক পথে পরিচালিত করে মানুষের চিত্তবল ও সংযমের অভাব। আমাদের দেশে অশিক্ষিতা বা অল্প-শিক্ষিতা নারীদের মধ্যে যে অসাধারণ আত্মসংযমের প্রকাশ দেখা যায়, তাহা আধুনিক সভ্য-জগতের বিদুষী সুশিক্ষিতা নারীদের অপেক্ষা যে অনেক অধিক পূজনীয় 'দেশবন্ধু'র—উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কেশব-বাবুও ইহা বলিয়াছেন।

আমার মনে হয়, যে সকল নারীর মধ্যে বিবেকের বিকাশ অধিক স্ফুটতর এবং সংযমের প্রকাশ অধিক গভীরতর, তাঁহারাই এই সত্য গ্রহণের সম্পূর্ণ অধিকারিণী ও উপযুক্তা। আর যে নারী-সমাজের মধ্যে সংযমের অভাব অধিক এবং বিবেকও স্বাধীন ও পূর্ণ সচেতন নহে, তাঁহারা সর্ব্ব প্রকারে সুশিক্ষিতা, বিদুষী, জ্ঞানবতী হইলেও এই কঠিন সত্যের সম্পূর্ণ অনধিকারিণী এবং অনুপযুক্তা। পুরুষোচিত গুণের বিচারে ও শিক্ষা ভেদে যে এ সত্য নারী-সমাজে প্রকাশ্য, অন্যথা নহে—এরূপ ধারণা নিতান্ত অমূলক; কারণ, একমাত্র সংযম ও বিবেকের তারতম্যানুসারে ইহা সুফল বা কুফলপ্রদ। আমার মনে হয়, বাংলার নারী-সমাজ সভ্য-জগতের নারীগণের তুলনায় শিক্ষা, জ্ঞান ও কর্ম্ম-নিপুণতা প্রভৃতি অনেক মহৎগুণের প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেও, এই সত্য গ্রহণে তাঁহারা একটুও অনুপযুক্তা বা অনধিকারিণী নহেন—যেহেতু বিবেক ও সংযমের উচ্চতা-গর্ব্বে তাঁহারা পৃথিবীর সকল নারীর অপেক্ষা ভাগ্যবতী। সুতরাং লেখক মহাশয় যে আমাদের দেশের নারীগণের শিক্ষা-হীনতার ছল ধরিয়া এই সত্য "মনে মনে রাখা" এবং "প্রকাশ না করা" উচিত ছিল বলিয়াছেন, তাহা আমি মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। আধুনিক যুগে

বাংলার নারী-সমাজে ঐ সত্যের উন্মেষ-সূচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যত কাল ইহা গোপন থাকা সম্ভব ছিল—তত কাল তাহা থাকিয়াছে; কিন্তু আজ সত্য যখন আপনিই আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তখন আর গোপন রাখা সম্ভবপর নহে। সত্য গোপনের প্রাণান্তকর চেষ্টাতেই আজ আমরা এতটা দুর্ব্বল, অসহায় ও অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছি।

লেখক অতীতের যে আদর্শ স্মরণ করিয়া বর্ত্তমান নারী-সমাজের অযোগ্যতার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং আধুনিক শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কারকে সেজন্য অপরাধী করিয়াছেন, আমার মনে হয় এখানেও তিনি একটি মারাত্মক ভ্রমে পড়িয়াছেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর্য্যুপরি বিপর্য্যয় যে এ দেশের নারী সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য কতখানি দায়ী, এ রুথা বোধ হয় তিনি একবারও ভাবিয়া দেখেন নাই। অতীতের আদর্শ বলিতে যে পাঁচ-সাত শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থা নহে, উহা যে তাহারও অনেক আগেকার কথা, এইটি রক্ষণশীল বা পরিবর্ত্তন-বিরোধী দলের ধারণার মধ্যে সকল সময়ে থাকে না বলিয়াই তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্ত্তমান শিক্ষা, দীক্ষা, আদর্শ বা নীতি ভারত-নারীর দুরবস্থার জন্য কিছুমাত্র দায়ী নহে। অতীতেই আমরা আমাদের প্রাচীন আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছিলাম; এবং বহু কাল আর সে পূর্ব্ব-রীতিনীতির অনুসরণ না করিয়া, সেকালের নব-রচিত স্মৃতির অনুশাসন মানিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়াই, আজ এতটা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি।

দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী যে সকল বিধি-নিষেধের তখন প্রয়োজন হইয়াছিল, আজও যে অবস্থা ঠিক তাহাই আছে, এ কথা, আশা করি, কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। অতীতকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বর্ত্তমানকে অস্বীকার করা যে মৃত্যুরই রূপান্তর মাত্র, এ কথা এসিয়ার অন্যান্য মহাজাতিরা সময় থাকিতে বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই আজও তাঁহারা আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন; নতুবা আমাদেরই মত বেহাল আজ তাঁহাদেরও হইতে হইত।

লেখক মহাশয় যে স্থির করিয়াছেন পাঁজি পুঁথি দেখিয়া শুভ দিন ও শুভ লগ্ন স্থির করিয়া তবে যথাকালে যথাসময়ে সত্য প্রচারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে, আমার মনে হয় সে শুদিনের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে আমাদের জীবনের মেয়াদ শেষ হইয়া যাইবার পরেও সে সুযোগ আসিবে কি না সন্দেহ। সত্য প্রচার যে যোগ্যতা অর্জ্জনে জাতিকে সাহায্য করে, ইহার জলন্ত প্রমাণ লেখক গত পঁচিশ বৎসরের রুষ-ইতিহাস গাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। সুতরাং অসময়ে সত্য প্রচার করিলে যে মহাপ্রলয় হইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন। ঐ সত্য প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, বহু-দিনের-ঢাকিয়া-রাখা সত্য আপনিই সুপ্রকাশ হইতেছে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যে সমাজের পুরুষেরা নারীকে কঠোর বিধি-নিষেধের লৌহ-বেষ্টনীর মধ্যে পুরিয়া, অবরোধের উচ্চ-প্রাচীরে ঘিরিয়া, চারিদিকে কড়া পাহারা বসাইয়া, অন্তরীণের আসামীর মতো তাহার সতীত্ব-রক্ষার আয়োজন করে, তাহারা কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, আমাদের এই কাপুরুষ জাতি ভিন্ন জগতের অন্য কোনও দেশে নারীর এতখানি অবমাননা দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশের পুরুষেরা বঙ্গমহিলার গুণ-কীর্ত্তনে 'পঞ্চমুখ'কেও পরাস্ত করেন বটে, কিন্তু আপন জননী, জায়া, ভগিনী ও দুহিতাকে নিতান্ত হীনচেতা ও নির্লজ্জের মতো সর্ব্ব প্রকারে অবিশ্বাস করিতে এবং তজ্জনিত অবমাননা করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না। ইহাও সমস্যা!

ওর-মধ্যে পাগল কে? *

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, তুমি কতবার ডাক্তার ওভ্রের বাড়ীর পাশ দিয়ে গেছ, অথচ একবার মনেও ভাবো নি, কত অলৌকিক কাণ্ড সেখানে অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ীটা দেখ্‌তে সামান্য রকমের, কোন বহির্ভাগ নেই, কোন চিহ্ন নেই। এমন কি, দরজায় "স্বাস্থ্য নিবাস" এই সাদা-মাটা কথাটাও লেখা নেই। পিতল-রঙের নকলে রং করা একটা ফাটক; তার পরেই গোলাপ প্রভৃতি নানা ফুলের বাগান। ডাইনে দরোয়ানের ঘর। বাঁয়ের ইমারতের ভিতর ডাক্তারের ঘর, ডাক্তারের স্ত্রী ও কন্যার ঘর। প্রধান ইমারৎটা সুদূর প্রান্তভাগে। উহার পশ্চাতে একটা ক্ষুদ্র উপবন—বাদাম প্রভৃতি বড় বড় গাছ তাতে পোঁতা আছে। বাড়ীর জানালা দিয়ে এই উপবনটা দেখা যায়।

ঐখানে ডাক্তার উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করেন; তাঁর চিকিৎসায় রোগীরা প্রায়ই ভাল হয়ে যায়। যেখানে সকল রকমের উন্মাদ রোগী আছে, সেই পাগলা গারদে তোমাকে নিয়ে যেতে আমি সাহস করতেম না। ভয়

* Edmond About.

পেয়ো না। বুদ্ধির জড়তা, পক্ষাঘাতের উন্মাদ, কিংবা একেবারে বুদ্ধি-লোপ—এই সব উন্মাদের কষ্টকর দৃশ্য তোমাকে দেখতে হবে না। তিনি নিজের জন্য একটা বিশেষত্বের সৃষ্টি করেছেন; তিনি এক-ধারণা বাতিকের (monomania) চিকিৎসা করেন। ডাক্তার চমৎকার লোক, বিদ্যা-বুদ্ধিতেও অসাধারণ। একজন প্রকৃত তত্ত্ব-জ্ঞানী। তাঁর টাক-পড়া মাথা, দাড়ি কামানো, কালো পরিচ্ছদ, শান্ত প্রফুল্ল মুখশ্রী; যদি কখনো তাঁকে ছাখো ত ভেবে পাবে না,—তিনি ডাক্তার—কি, অধ্যাপক, কি পাদ্রি। তাঁর "ভারী-ভারী" চোখ দুটো খুল্‌লে, তোমার প্রথমেই মনে হবে যেন "বৎস!" বলে তোমাকে সম্বোধন করতে উদ্যত। তাঁর চোখ দুটো বেরিয়ে থাক্‌লেও, কুৎসিত নয়—তিনি যখন চারি দিকে প্রশান্ত দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করেন, তখন মনে হয় সেই দৃষ্টির ভিতর একটা দয়ার অফুরন্ত উৎস প্রচ্ছন্ন আছে। ঐ বড় বড় চোখ দুটি যেন একটি সুন্দর অন্তরাত্মার উন্মুক্ত দ্বার।

তিনি যখন চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে পড়তেন, তখনই তিনি ঠিক্ করেছিলেন, চিকিৎসার কোন্ বিভাগে তিনি জীবন উৎসর্গ করবেন। তিনি "এক-ধারণা" উন্মাদের অনুশীলনে খুব উৎসাহের সহিত নিযুক্ত হ'লেন। এই রোগে, মনো-বৃত্তিদের ভিতর যে গোলযোগ বাধে, স্নায়ুমণ্ডলের কোন প্রত্যক্ষ-গোচর বিকৃতি বা ক্ষতি তার কারণ নয়—তাই নৈতিক চিকিৎসার দ্বারা এই রোগ সারানো হয়। চিকিৎসালয়ের এক বিভাগের পরিদর্শক ছিলেন একটি তরুণ বয়স্কা রমণী—তিনি রোগ-পর্য্যবেক্ষণ সম্বন্ধে ডাক্তারকে সাহায্য করতেন। এই তরুণী, সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। ডাক্তার তাঁর প্রতি আসক্ত হলেন; এবং ডাক্তার-উপাধি পাবার পরেই, তাঁকে বিবাহ করলেন। তিনি যখন সংসারে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর অর্থ-সম্বল বেশী ছিল না। তাঁর একটি ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তি ছিল, সেইটি তাঁর এই হাসপাতাল স্থাপনে নিয়োগ করলেন একটু বুজরুগির ভান করলে, তিনি বিস্তর টাকা রোজকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি অল্পতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি নাম চাইতেন না, কোন একটা রোগ আরাম করলে, ছাদের উপর থেকে তা ঘোষণা করতেন না। তাঁর খ্যাতি-প্রতিপত্তি আপনিই গড়ে উঠ্‌ল—তার জন্য কোন চেষ্টা করতে হয় নি। তাঁর 'যুক্তিমূলক এক-ধারণা-উন্মাদ' গ্রন্থের ৬ সংস্করণ হয়ে গেল—তিনি তার এক খণ্ডও কোন সংবাদপত্রাদিতে পাঠান নি। নম্রতা একটা ভাল গুণ, সন্দেহ নেই; কিন্তু তার বাড়াবাড়িটাও ভাল নয়। কুমারী ওভ্রে ১০ হাজার টাকা বিবাহের যৌতুক পেয়েছিলেন মাত্র—এবং এই এপ্রিল মাসে তাঁর বয়স ২২ বৎসর হবে।

১৫ দিন পূর্ব্বে (বোধ হয় বুধবার, ১৩ ডিসেম্বর) একটা ভাড়াটে গাড়ী ডাক্তার ওভ্রের ফটকে এসে দাঁড়াল। কোচমান ঘণ্টা নাড়লে—ফাটক খুলে গেল। গাড়ীটা ডাক্তারের বাড়ীতে এসে লাগ্‌ল। দুই জন লোক গাড়ী থেকে নেমে, আফিসের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ভৃত্য বল্লে,—"একটু বসুন, ডাক্তার রোঁদের কাজ শেষ করে এখনই আস্‌চেন।" তখন বেলা দশটা।

এই অপরিচিতদের মধ্যে এক জনের বয়স ৫০ বৎসর; চওড়া শরীর, শ্যামবর্ণ গায়ে খুব রক্ত, মুখ টক্‌টকে লাল—দেখ্‌তে কুৎসিৎ—বিশ্রী গঠন। কাণ বেঁধানো হাত চওড়া ও প্রকাণ্ড বুড়ো-আঙ্গুল। দেখ্‌লে মনে হয় যেন একজন শ্রমজীবী তার মনিবের পোষাক পোরে এসেছে। ইনি হচ্ছেন;—মোসিও মার্লো।

এই লোকটার ভাগ্‌নে—ফ্রাঁসোয়া-টমাস্;—বয়স ২৩ বৎসর। বর্ণনা করা শক্ত, কেন না, এ ঠিক্ অন্যদেরই মতো। না চওড়া, না বেঁটে; না সুন্দর, না কুৎসিত; ভীমের মতোও প্রকাণ্ড নয়, সৌখিন বাবুর মতোও ছিপ্-ছিপে নয়। তার সবই মাঝামাঝি; মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কিছুই নেত্রাকর্ষক নয়। চুলের রঙে কোন বিশেষত্ব নেই—কাপড়ও সেই রকম।

টমাস্ যখন ডাক্তারের বাড়ীতে ঢুক্‌লো, মনে হল যেন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন একটা রাগের মাথায়, এধার হতে ওধারে পায়চালি করছে; কোথাও স্থির হয়ে থাক্‌তে পারছে না। ২০টা জিনিসের দিকে একসঙ্গে তাকাচ্ছে; হাত বাঁধা না থাকলে বোধ হয় সেই সব জিনিস ধরে টান্‌তো। তার মামা বল্লেন;—"একটু শান্ত হও। আমি যা করতে চাচ্চি, তা তোমার ভালোর জন্যই। তুমি এখানে বেশ সুখে থাক্‌বে; ডাক্তার তোমার ব্যামো ভাল করে দেবেন।"

"আমার ত কোন ব্যামো নেই। আমাকে বেঁধেছ কেন?

"কারণ তুমি আমাকে ধরে গাড়ী থেকে ফেলে দিতে যাচ্ছিলে। তোমার মনের অবস্থা ভাল নয়, ফ্রাঁসোয়া। ডাক্তার ওভ্রে তোমাকে ভাল করে দেবেন।"

"মামা, আমি তোমারই মতো পরিষ্কার যুক্তি বিচার করতে পারি, তুমি কি বল্‌ছ আমি বুঝতে পারছি নে। আমার মন পরিষ্কার, বিচার-শক্তি বিশুদ্ধ, আমার স্মৃতি-শক্তিও খুব টন্‌টনে। তোমার সাম্‌নে কতকগুলি পদ্য আবৃত্তি করব কি?—কতকটা ল্যাটিন তর্জ্জমা করব কি?—এই দেখ, এই বইয়ের তাকে একটা Tacitus আছে * * * আর কোন রকমের প্রমাণ যদি চাও—আমি পাটীগণিত কিংবা জ্যামিতির সমস্যাও সমাধান করতে পারি * * * আমাকে তোমার নিতে ইচ্ছে নেই? আচ্ছা বেশ! আমরা আজ সকালে কি করেছি শোনো:—

"তুমি ৮টা রাত্রে এলে, আমাকে জাগাতে নয়—কেন না আমি তখন ঘুমুই নি—আমাকে শুধু বিছানা থেকে বের করে দিতে। জেম্‌র্যার সাহায্য না নিয়েও আমি কাপড় পরলুম। তুমি বল্লে, তোমার সঙ্গে ডাক্তার ওভ্রের বাড়ীতে আমায় যেতে হবে। আমি রাজি হলুম না। তুমি জেদ করতে লাগ্‌লে। আমি রেগে উঠ্‌লুম। আমার হাত বাঁধতে জেম্‌র্যা তোমায় সাহায্য করলে। আমি আজ তাকে ছাড়িয়ে দেব। ১৩ দিনের মাইনে তার পাওনা আছে। আর ক্ষতি-পূরণের হিসেবে তাকে তোমারও কিছু দিতে হবে, কেন না, তোমার দরুণই সে "খৃস্‌মাস গিফ্‌ট্"টা পায় নি। আমি যা বল্‌ছি এটা কি যুক্তির কথা নয়? তুমি এখনও কি মনে করছ, আমাকে পাগল বলে সাব্যস্ত করতে পারবে? মামা, চারিদিক একটু ভাল করে বিবেচনা করে দেখো! এটা যেন মনে থাকে, আমার মা তোমার ভগিনী ছিলেন। আমার মা যদি আমাকে এখানে দেখেন তাহলে তিনি কি বল্‌বেন?—আহা মা বেচারী! তোমার উপর আমার কোন অসদ্‌ভাব নেই—সমস্তই বেশ ভালোয় ভালোয় বন্দোবস্ত হতে পারে। তোমার একটি মেয়ে আছে—কুমারী "ক্লেয়ার মার্লো"।

"হ্যাঁ—এইখানেই তুমি ধরা পড়েছ। তুমি স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্ছ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে। আমার মেয়ে আছে? আমার? আমি ত একজন অবিবাহিত লোক। একেবারে বদ্ধ আইবুড়ো!"

ফ্রাঁসোয়া যান্ত্রিকভাবে উত্তর করিল:—

"হাঁ—তোমার একটি মেয়ে আছে।"

"আচ্ছা, আমার কথা শোনোদিকি বাবু। বেশ মন দিয়ে শোনো। তোমার কি কোন মামাতো বোন্ আছে?"

"মামাতো বোন?—না। আমার কোন মামাতো বোন্ নেই। আমার হিসেবে গলদ পাবে না। আমার মামাতো ভাইও নেই, মামাতো বোনও নেই।"

"আমি তোমার মামা, এ কথা ত ঠিক্?—"

"হাঁ, তুমি আমার মামা,—যদিও আজ সকালে সেটা ভুলে গিয়েছিলে।"

"আমার যদি মেয়ে থাক্‌তো, সে তোমার মামাতো বোন্ হত। তোমার যখন কোন মামাতো বোন্ নেই—"

"সে কথা ঠিক্। এই বসন্তকালে, Ems-Springsএ সৌভাগ্যক্রমে তার মায়ের সঙ্গে তাকে আমি দেখেছিলুম। আমি তাকে ভালবাসি। আমি যে তার প্রতি উদাসীন নই, তা আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। আমি তাই তার হস্ত-প্রার্থী। শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষায় আছি।"

"কার হস্ত?"

"কুমারী-মহাশয়ার হস্ত—আপনার কন্যার হস্ত।"

মার্লো মনে মনে ভাবিল:—আচ্ছা তাই হোক্। ডাক্তার ওভ্রে যদি একে সারাতে পারেন, ত তাঁর নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। ৩০ থেকে ৬ গেলে—থাকে ২৪। আমি ধনী হব। বেচারী ফ্রাঁসোয়া!

মার্লো সেইখানে বোসে একটা বই খুল্‌লে। যুবককে বল্‌লে—"তুমি ঐখানে বোসো। আমি তোমাকে একটা বিষয় পড়ে শোনাচ্চি। মন দিয়ে শুন্‌তে চেষ্টা কর। তোমার মন শান্ত হবে।"

মার্লো পড়িতে লাগিল:—

'এক-বাতিকের' রোগটা কি?—না, একটা ধারণা মনে বরাবর লেগে থাকে—মন থেকে কিছুতেই যায় না—একটা আসক্তি মনের উপর আধিপত্য করে। এই রোগের স্থান হচ্চে—হৃৎপিণ্ড; এই হৃৎপিণ্ডের ভিতরেই রোগটার অন্বেষণ করতে হবে এবং এই হৃৎপিণ্ডের ভিতরই রোগটাকে সারাতে হবে। এর কারণ হচ্চে—প্রেম, ভয়, গর্ব, দুরাকাঙ্ক্ষা, অনুতাপ। সাধারণতঃ আসক্তির সমস্ত লক্ষণ

এতে প্রকাশ পায়। কখন আনন্দ, কখন উল্লাস, কখন নির্ভীকতা, কখন ঢ্যাচামেচি, আবার কখন ভীরুতা, বিষণ্ণতা, ও স্তব্ধতা—এই সব লক্ষণের দ্বারা রোগটা ধরা পড়ে।"

পাঠকালে, মনে হল, যেন ফ্রাঁসোয়ার মন শান্ত হয়েছে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মার্লো মনে মনে ভাব্‌লো—"বাহবা! ওষধের কাজ ত এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। যার না ছিল ক্ষুধা, না ছিল নিদ্রা, সে এই পড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ল।" কিন্তু ফ্রাঁসোয়া আসলে ঘুমোয় নি—সে ঘুমোবার ভান করছিল। মধ্যে মধ্যে ঢুল্‌ছিল, আবার নাক্ ডাকাচ্ছিল। মার্লো মামা ওতেই ভুলে গেল। মার্লো চাপা গলায় তখনো পড়তে লাগ্‌ল—ক্রমে হাই তুলতে আরম্ভ করলে, তার পর পড়া বন্ধ করলে, বইটা হাত থেকে খসে পড়ল; চোখ্ বুজে এল। ক্রমে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হল। ভাগ্নে খুব খুসী হল—সে আড় চোখে আড় চোখে মামার কাণ্ড-কারখানা দেখ্‌ছিল।

প্রথমে ফ্রাঁসোয়া তার চৌকিটা সরালে—মার্লো একটুও নড়ল না, গাছের মত স্থির হয়ে রইল। ফ্রাঁসোয়া ঘরের মধ্যে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগ্‌ল। ঘরের মেজের উপর তার জুতোর ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ হতে লাগ্‌ল। তার পর বাতিকগ্রস্ত লোকটা একটা লেখবার টেবিলের কাছে গেল, সেখানে একটা ঘর্ষণ-যন্ত্র (eraser) দেখ্‌তে পেলে; সেইটে একটা কোণে ঠেসে, হাতলটা দিয়ে দৃঢ়ভাবে আট্‌কে রেখে, তাই দিয়ে তার বাহুতে যে বাঁধন ছিল, সেই বাঁধনটা কেটে ফেল্লে। আপনাকে এই রকম করে মুক্ত করে সে যখন আবার হাতের ব্যবহার ফিরে পেলে, তখন তার কী আনন্দ!—কিন্তু সে আনন্দের উচ্ছ্বাসটা চেপে রইল। আর খুব পা টিপে-টিপে তার মামার কাছে গেল। দুই মিনিটের মধ্যেই মার্লোকে খুব কসে বেঁধে ফেল্লে—কিন্তু এমন সন্তর্পণে যে তার ঘুমের একটুও ব্যাঘাত হল না।

ফ্রাঁসোয়া মনে মনে তার নিজের কাজের খুব তারিফ করলে, আর যে বই-টা মামার হাত থেকে খসে মাটির উপর পড়েছিল সে বইটা কুড়িয়ে নিলে। "যুক্তিবিচারক্ষম মনোমেনিয়া" গ্রন্থের এটা একটা শেষ সংস্করণ। ঘরের একটা কোণে গিয়ে যতক্ষণ না ডাক্তার আসেন,—ফ্রাঁসোয়া গ্রন্থকীটের মত বইটা তন্নতন্ন করে পড়তে লাগ্‌ল।

২

ফ্রাঁসোয়া ও তার মামার গোড়ার কথাগুলো এখন বলা আবশ্যক। ফ্রাঁসোয়ার পিতা টমাস্ একজন খেল্না-বিক্রেতা ছিল। খেলনা-বিক্রী একটা খুব ভাল কাজ। প্রত্যেক জিনিসটায় শতকরা ১০০৲ টাকা লাভ থাক্‌তো। পিতার মৃত্যুর পর, ফ্রাঁসোয়ার অবস্থা বেশ সঙ্গতিপন্ন ছিল। তার বিশ হাজার টাকা আয় ছিল।

বোধ হয় আমি পূর্ব্বেই বলেছি তার রুচি খুব সাধা-সিধে রকমের ছিল। যে সব জিনিস চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে নয়, সেই সব জিনিসই সে পছন্দ করত। কালো ও শামলার যে সব মাঝামাঝি রঙ্—সেই সব রঙের কোর্ত্তা, ফতুয়া, দস্তানা সে বেছে নিত। খুব ছেলেবেলাতেও সে পালোক, ফিতে প্রভৃতি কাপড়ের সাজসজ্জা ভালবাস্‌ত না। তার ভয় হত, পাছে তার উপর লোকের চোখ পড়ে। বার্ণিস করা জুতো দেখ্‌লে তার চোখ্ ঝল্‌সে যেত। যদি জন্মসূত্রে তার কোন জাঁকালো নাম থাক্‌তো, তাহলে তাহার জীবনটা যারপরনাই কষ্টকর হয়ে উঠ্‌ত। ভাগ্যক্রমে "পদ্মলোচন" ধরণের নাম তার হয়নি। ভীরুতার দরুণ সে কোন একটা বিশেষ কর্ম্মবিভাগে প্রবেশ করতে পারে নি। বি-এ পাস করবার পর সে দেখ্‌লে তার সম্মুখে কতকগুলো ব্যবসার পথ খোলা। সে মনে করলে ব্যারিষ্টারের কাজে বড়ই বকাবকি গোলমাল, চিকিৎসা কাজে একটুও বিশ্রাম নেই, শিক্ষকের কাজে বেশী রকম ঔদ্ধত্য, ব্যবসাবাণিজ্য বড়ই জটিল, আর সরকারী কাজকর্ম্মে স্বাধীনতা মোটেই নেই।

আর সৈন্যবিভাগের কথা যদি বল—সে কথা মনে করাই নিরর্থক; যুদ্ধ করতে সে ভয় পেত ব'লে নয়—একটা উর্দ্দি পরতে হবে এই কথা মনে করেই সে শিউরে উঠ্‌ত। তাই সে তার পূর্ব্বের কাজেই রয়ে গেল—কাজটা খুব সোজা বলে' নয়—কাজটা তেম্‌ন সম্মানজনক নয় বলেই। তারই আয়ে সে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে লাগ্‌ল।

টাকা নিজে রোজগার করেনি বলে' সে টাকা অবাধে ধার দিত। এই দুর্লভ গুণের পুরস্কার স্বরূপ, ভগবান তার

অনেক বন্ধু যুটিয়ে দিলেন। সে অকপটে বন্ধুদের ভাল-বাস্‌ত, তাদের সমস্ত ইচ্ছা নিঃসঙ্কোচে পূর্ণ করত। রাজপথে কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে, সেই বন্ধু তার হাত ধরে টানাটানি করত, যেখানে ইচ্ছে তাকে নিয়ে যেত। মনে কোরো না,—সে নির্ব্বোধ, বা মূর্খ ছিল। সে তিন্ চারটে আধুনিক ভাষা, ল্যাটিন গ্রীক জান্‌ত, আর সব বিষয়েই কালেজে রীতিমত শিক্ষা পেয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য, কলকারখানা, কৃষি, সাহিত্য এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে তার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। কোন নতুন বই বের হলে, তার মূল্য ঠিক নির্দ্ধারণ করতে পারত। কিন্তু তার মতামত কারও কাছে প্রকাশ করত না।

কিন্তু শুধু মেয়েদের মধ্যেই তার দুর্বলতা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেত। কারও-না-কারও সঙ্গে প্রেমে পড়াই তার স্বভাব-ধর্ম্ম ছিল। যদি প্রভাতে চোখ্ রগ্‌ড়াতে-রগ্‌ড়াতে, দিগন্তদেশে প্রেমের কোন রশ্মি দেখ্‌তে না পেত, তাহলে তার মন খারাপ হয়ে যেত, সে প্রায়ই ভিতর দিক্ উল্‌টিয়ে সোজা করত। যদি কখনও কন্‌সার্ট কিংবা রঙ্গালয়ে যেত, সে প্রথমেই তার বেশ ভাল লাগে এমন একটা মুখ খুঁজে বের করত, তার পর সমস্তক্ষণ সেই মুখ নিয়ে মুগ্ধ থাক্‌ত। যদি কোন মনের মতন মুখ দেখ্‌তে পেত, তাহলেই নাটকটা ভাল মনে হত, কন্‌সার্টটা মধুর মনে হত, তা নইলে, মনে করত, সকলেই খারাপ অভিনয় করেছে, সকলেই খারাপ গেয়েছে। তার মনের ভিতর একটুও ফাঁকা রাখ্‌তে ভালবাসত না—যদি মাঝারি গোছের কোন সুন্দরী দেখ্‌ত, তাকে নিখুঁৎ সুন্দরী মনে করে সেই ফাঁকটুকু পূরণ করে নিত। এই প্রেম-লালসার ভিতর কোন লাম্পট্য ভাব ছিল না—তার অন্তঃকরণ নিষ্কলঙ্ক ছিল। রমণীদের ভালবাস্‌ত, কিন্তু তাদের কাছে ভালবাসা জানাতে সাহস করত না।

যখন সে কারও প্রেমে পড়ত, তার প্রেমাস্পদকে কত কথা বল্‌বে বলে' মনে মনে আবৃত্তি করত' কিন্তু ঠোঁটের কাছে এসেই সেগুলো মরে' যেত। সে খুব সাধ্যসাধনা করত; অন্তস্তল পর্য্যন্ত খুলে দেখাতো; অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা কইত—সেই কথাবার্ত্তার প্রশ্ন উত্তর সে নিজেই রচনা করত। আবেগ-ভরে এমন করে আবেদন করত যে তাতে পাষাণ পর্য্যন্ত গলে যায়। কিন্তু কোন নারীই তার মৌন আকাঙ্ক্ষায় আকৃষ্ট হত না। ভালবাসা পেতে গেলে, ভালবাসা চাওয়া চাই। "ইচ্ছে করা" আর "চাওয়া" এর মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। "ইচ্ছে করা" মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়ায়; "চাওয়া" পাথরের উপর ছুটে চলে। ইচ্ছা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় থাকে; কিন্তু "চাওয়া" নিজের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছুই চায় না। "চাওয়া" বেড়া খাল খন্দ ভিঙ্গিয়ে গন্তব্য স্থানে সোজা আসে; "ইচ্ছেকরা" বাড়ী বসে', মধুর কণ্ঠে চাঁদকে ডাকে।

কিন্তু তথাপি, ঐ বৎসরেরই অগষ্ট মাসে সে একজনের সঙ্গে মুখামুখী প্রেমালাপ করতে সাহস করেছিল। Ems Springsএ একটি তরুণীর সঙ্গে তার দেখা হয়; সে তরুণীও তারই মত লাজুক। তরুণীর লাজুকতা দেখে সে সাহস পায়। সে একজন প্যারিস্ রমণী। দেয়ালের ছায়ার দিকে উৎপন্ন ফলের মত সে পল্‌কা ও সুকুমার। নীল শিরাজাল তার স্বচ্ছ চর্ম্মের উপর স্পষ্ট দেখা যায়। তার সঙ্গে আছে তার মা। একটা কি কণ্ঠরোগের দরুণ এখানকার উৎস-জল সেবন করতে এসেছে। মা মেয়ে দুজনেই বোধ হয় লোকালয় থেকে দূরে বাস করত। তাই এখানকার স্নান-কারীদের কোলাহলময় জনতার দিকে ওরা অবাক্ হয়ে চেয়ে থাক্‌তো। ফ্রাঁসোয়ার একজন বন্ধু এই মেয়ে দুটির সঙ্গে তার পরিচয় করে দেয়। সেই অবধি একমাস ধরে তাদের প্রতি সে যত্ন দেখাতো; বল্‌তে গেলে, ফ্রাঁসোয়াই ওদের একমাত্র সঙ্গী ছিল। স্পর্শকাতর সুকুমার-প্রকৃতি লোকদের পক্ষে, জনতা একটা বিজন অরণ্য বিশেষ। তাদের চারিদিকে লোকেরা যতই কোলাহল করে, ততই তারা সঙ্কুচিত হয়ে নিজের কোণটিতে গিয়ে, আপনাদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে বাক্যালাপ করে।

ঐ প্যারিস্-তরুণী ও তার মা, একেবারে ফ্রাঁসোয়ার হৃদয়ের মধ্যে সোজা প্রবেশ লাভ করলে। আমেরিকা-আবিষ্কারক নাবিকদের মত, তারা ঐ হৃদয়ের মধ্যে নিত্য নূতন রত্ন-ভাণ্ডার আবিষ্কার করতে লাগ্‌ল। ঐ অজ্ঞাতপূর্ব্ব নবীন ভূখণ্ডের উপর তারা মনের সুখে বিচরণ করতে লাগ্‌ল। সে ধনী কি দরিদ্র এ প্রশ্ন তাদের মনে কখনো আসেনি। "ভাল লোক" জেনেই তারা সন্তুষ্ট ছিল। সোণার অন্তঃকরণ ছাড়া তাদের কাছে আর কিছুই

মূল্যবান বলে মনে হত না। ফ্রাঁসোয়াও বুঝতে পারলে, তার মনে একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়েছে।

কারও কাছে তোমরা শুনেছ কি—কেমন করে রুস্-দেশে রসন্ত-ঋতুর আবির্ভাব হয়? গতকল্য তুষারে সমস্ত আচ্ছন্ন ছিল। আজ একটা সূর্য্য-কিরণ এসে শীতকে তাড়িয়ে দিল; মধ্যাহ্নে গাছে গাছে ফুলের কুঁড়ি বেরিয়ে পড়ল। রাত্রে পাতায় পাতায় ভরে গেল। আগামী কল্য প্রায় ফল ধরবার মত হল। ঠিক্ সেই রকম, ফ্রাঁসোয়ার প্রেম-কুসুম ফুটে উঠ্‌ল—ফলে পরিণত হবে বলে আশাও হল। উত্তাপে যেমন তুষারখণ্ডগুলো গলে যায়, সেই রকম তার আগ্রহ-হীনতা ও সংযম কোথায় যেন ভেসে গেল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঐ মুখচোরা লাজুক বালক, পূর্ণবয়স্ক পুরুষ হয়ে উঠ্‌ল।

বয়ঃপ্রাপ্ত ফ্রাঁসোয়া নিজেই নিজের প্রভু ছিল। কিন্তু তার প্রেয়সী তার পিতার অধীন থাকায় তার পিতার সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক হল। এখন আবার সেই পূর্ব্বেকার ভীরুতা এসে তার মনকে দখল করলে। "ক্লেয়ার" ফ্রাঁসোয়াকে বল্লে,—"অসঙ্কোচে পত্র লেখো; আমার বাবাকে আগেই জানানো হয়েছে—ফেরৎ ডাকে তুমি তাঁর সম্মতি পাবে।" ফ্রাঁসোয়া একবার পত্র লিখ্‌লে, আবার লিখ্‌লে, একশোবার লিখ্‌লে, কিন্তু পত্র পাঠাবে কি না মন স্থির করতে পারলে না। যাই হোক, কাজটা খুব সহজ ছিল; সচরাচর লোকের মত যার বুদ্ধি, সেও এ কাজটা বেশ ভাল রূপেই করতে পারত। ফ্রাঁসোয়া তার ভাবী শ্বশুরের সামাজিক অবস্থা, সম্পত্তি, এমন কি মেজাজ পর্য্যন্ত—সমস্তই জান্‌তো। গুপ্ত ঘরের কথাও তার জানা ছিল। সে একজন ঘরের লোকের মতই ছিল। এখন তার শুধু অল্প কথায় বল্‌তে হবে, সে কি করে ও তার কি আছে। উত্তরটার সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না।

কিন্তু সে এত দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ করতে লাগল যে, একমাস পরে ক্লেয়ার ও তার মা তার সম্বন্ধে সন্দেহ করতে বাধ্য হল। তারা আরও দুই হপ্তা সবুর করতে পারত, কিন্তু বিজ্ঞ বাপ অতদিন সবুর করা যুক্তিসঙ্গত মনে করলে না। বাপ মনে করলে, যদি ক্লেয়ার প্রেমে পড়ে থাকে, আর যদি তার প্রণয়ী স্পষ্ট করে কোন কথা না বলে, তাহলে, আর সময় নষ্ট না করে, প্যারিসের নিরাপদ স্থানে তার মেয়েকে রেখে দেওয়া ভাল। তার পর ফ্রাঁসোয়া যদি মন স্থির করতে পারে, তখন সেখানে গিয়ে সে বিবাহের প্রস্তাব করতে পারে।

এক দিন ফ্রাঁসোয়া নিত্য নিয়মানুসারে মহিলাদের বাহিরে বেড়াতে নিয়ে যাবে—এমন সময়, হোটেলওয়ালা তাকে বল্লে যে, তারা প্যারিসে চলে গেছে। এরই মধ্যে তাদের ঘরগুলো এক ইংরেজ-পরিবার এসে দখল করেছে। এই কথা শুনে তার মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রাঘাত হল। সেই সঙ্গে তার বুদ্ধি লোপ হল। সে হতবুদ্ধি হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল, পূর্ব্বে ক্লেয়ারকে যে সব জায়গায় নিয়ে যেত, সেই সব জায়গায় গিয়ে তাকে খুঁজতে লাগ্‌লো। তার নিজের বাসায় যখন ফিরে গেল—তখন তার মাথায় ভয়ানক বেদনা—কি করে যে সে বেদনাটা সারালে সে ভগবানই জানেন। শরীর থেকে কতকটা রক্ত বের করে দিলে, ফুটন্ত গরম জলে স্নান করলে, নানা রকমে শরীরকে পীড়ন করতে লাগল। তার পর যখন মনে করলে বেদনাটা সেরে গেছে, তখন সে প্যারিসে যাত্রা করলে। তাড়াতাড়ি প্যারিসে গিয়ে রেলগাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ল, বোজ্‌কাবুজ্‌কি সঙ্গে নিতে ভুলে গেল, একটা ঠিকে-গাড়ীতে উঠে পড়ে, কোচম্যানকে বল্লে;—

"তার কাছে নিয়ে চল্—খুব জোরে হাঁকা।"

"কোথায় কর্ত্তা?"

"অমুক লোকের বাড়ী—অমুক রাস্তায়—আর আমি কিছু জানি নে। তার প্রেয়সীর নাম ও ঠিকানা সমস্তই ভুলে গিয়েছিল। "আবার আমার বাড়ীতে আমাকে নিয়ে যা—সেইখানে গেলে সব জান্‌তে পারব।" সে কোচম্যানের হাতে, তার "কার্ড" দিলে—কোচম্যান তাকে তার বাড়ীতে নিয়ে গেল।

বাড়ীর দরোয়ান একজন নিঃসন্তান বৃদ্ধ লোক—নাম "এম্যানুয়েল"। তাঁর সঙ্গে দেখা হবামাত্রই ফ্রাঁসোয়া খুব নতমস্তকে নমস্কার করে তাকে বল্লে:—

"মহাশয়, আপনার কন্যা আছে। তার নাম কুমারী ক্লেয়ার এম্যানুয়েল। আমি তার হস্তপ্রার্থী হয়ে আপনাকে লিখব মনে করেছিলুম। কিন্তু শেষে মনে হল, নিজের মুখে এই অনুরোধ করাই শ্রেয়।"

তারা বুঝতে পারলে, লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে। তখনি তারা "ফোবুর্গ সেণ্ট সাঁতোয়ানে" তার মামা মার্লোর কাছে ছুটে গেল।

মামা মার্লো খুব খাঁটি লোক। সে প্রাচীন গ্রীসের আসবাব-পত্র খুব দক্ষতার সঙ্গে তৈরী করত। এস্‌ট্যাব্লিস্‌-মেণ্ট খরচার উপর কেবল শত করা ৫ টাকার লাভ রেখে জিনিস-পত্র বিক্রী করত। সুতরাং অর্থের চেয়ে সম্মানই সে বেশী অর্জ্জন করত। বিল করবার সময় সে দু তিন বার ঠিক্ দিয়ে দেখত, পাছে ভুল হলে, খদ্দেরের ক্ষতি হয়।

শিক্ষানবীশির সময় সে যে রকম ধনী ছিল, ৩০ বৎসর কাজ করবার পরেও সে তার চেয়ে বেশী ধনশালী হয় নি। তার নিযুক্ত খুব ছোট কর্ম্মচারীদের মতই সে তার জীবিকা অর্জ্জন করত। তার ভগিনীপতি, টমাস্‌কে দেখে তার হিংসে হত, সে কেমন করে অত টাকা জমালে। হঠাৎ বড়লোকদের যা হয়ে থাকে,—তার ভগিনীপতি তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখত। কিন্তু মার্লোর আত্ম-সম্মান বোধ বিলক্ষণ ছিল, সে হঠাৎ-নবাব হতে রাজি ছিল না। সে তার মধ্যবিত্ত অবস্থার বড়াই করত; সে অহঙ্কার করে' বল্‌ত—অন্তত এটা আমি নিশ্চয় জানি, আমার যা কিছু তা আমার নিজেরই—আমি পরের ধনে পোদ্দারি করি নে।"

মানুষ এক অদ্ভুত জানোয়ার। এ কথা শুধু আমি বল্‌চি নে। এমন সরেশ লোক—সমস্ত সহরতলী যার অতিরিক্ত সততা দেখে উপহাস করত, সে যখন শুন্‌লে তার ভাগনের মাথা খারাপ হয়েছে, তখন তার অন্তরের অন্তস্তলে কেমন একটু সুখানুভব করলে। তার অন্তরের অন্তস্তল হতে আস্তে আস্তে কে যেন ফোস্‌লাতে লাগল—"ফ্রাঁসোয়া উন্মাদ হয়েছে, তুমি তার অভিভাবক হবে।" তার সততা তখনই উত্তর করলে:—"ওর দরুণ আমরা বেশী ধনী হব না"—গূঢ় অন্তর্বাণীটি বল্লে:—"এ নিশ্চয়, উন্মাদের ভরণপোষণে কখনই ১৫ হাজার টাকা খরচ হবে না। তা ছাড়া সমস্ত হাঙ্গামটা আমাদেরই পোহাতে হবে; আমাদের কাজ-কর্ম্ম অবহেলা করতে হবে। এর দরুণ ক্ষতিপূরণ ত চাই। আমরা কারও উপর অন্যায় করব না।" কিন্তু নিঃস্বার্থপরতা উত্তর করলে:—"তার আত্মীয়দের সাহায্য করা উচিত, তার দরুণ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক্ নয়।" অন্তর্বাণীটি আস্তে আস্তে আবার বল্লে—"সে ঠিক্ কথা, কিন্তু আমাদের পরিবার আমাদের জন্য কিছু করে নি কেন?" তার হৃদয়ের সাধুভাব উত্তর করলে:—"আসলে কিছুই ঘট্‌বে না; এ একটা মিথ্যে আশঙ্কা মাত্র। দু দিনের মধ্যেই ফ্রাঁসোয়া ভালো হয়ে উঠবে। তখন নচ্ছোড়বন্দা অন্তর্বাণীটি বল্লে:—"যাই হোক্, খুব সম্ভব ঐ রোগে সে মারা যাবে, আর কারও অন্যায় না করে' আমরা তার উত্তরাধিকারী হব। আমরা জর্ম্মান-সম্রাটের জন্য ৩০ বৎসর ধরে' খেটেছি। তাতে কিছুই ত হল না, কে জানে যদি এই পাগলের কল্যাণেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি হয়—আশ্চর্য্য কি, হতেও পারে।"

সজ্জনটি কাণে আঙুল দিয়ে রইল। কিন্তু তার কাণ এত বড়, শাঁখের মত এমন প্রশস্ত যে, সেই ক্ষুদ্র অন্তর্বাণীটি, তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আস্তে আস্তে তার ভিতর প্রবেশ লাভ করলে। তার নিজের কারখানাটি তার হেড মিস্ত্রীর জিম্মে করে দিয়ে, সে তার ভাগনের সুন্দর ঘরগুলির ভিতর আড্ডা গাড়লে। বেশ পরিপাটী আহারাদি চল্‌তে লাগল—তার অনেক দিনের শূল ব্যথাটা মন্ত্রের মত উড়ে গেল। তার ভাগনের ভৃত্য জর্ম্যাঁ তার পরিচর্য্যা করতে লাগল। এই পরিচর্য্যায় সে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্রমে ক্রমে তার ভাগনের রোগটা তার সয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, তার ভাগনের রোগ কখনই আরাম হবে না। তবু, তার অন্তর্দেবতাকে তুষ্ট রাখবার জন্য সে মনে মনে বারম্বার এই কথা আবৃত্তি করত "আমি কারও ক্ষতি করছি নে।"

তিন মাস পরে, একজন পাগলের সঙ্গে বাস করে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। ফ্রাঁসোয়ার অবিরাম বকুনি, ক্লেয়ারকে বিবাহ করবার জন্য তার পাগলামি বৃদ্ধের অসহ্য হয়ে উঠল। সে স্থির করলে, বাড়ী থেকে ওকে সরিয়ে, ডাক্তার ওল্লের ওখানে ওকে রেখে দেবে। সে মনে মনে ভাবলে "যাই হোক্, আমার ভাগ্নের সেখানে বেশী যত্ন হবে, আর আমিও একটু আরামে থাক্‌ব। বিজ্ঞান শাস্ত্র বলে, পাগলদের জন্য একটু পরিবর্ত্তন দরকার। আমি আমার কর্ত্তব্য করচি।"

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে মার্লো ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর এই সুযোগেই ফ্রাঁসোয়া তার মামার হাত বেঁধে ফ্যালে। তার পর যখন জেগে উঠল—সে কী জাগরণ! (ক্রমশঃ)

চরকার ভবিষ্যৎ

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়

মহাত্মা গান্ধী মাদ্রাজ কর্পোরেশনের অভিনন্দনের উত্তরে সেদিন বলিয়াছেন, "If we are to remove the economic distress under which this land is labouring, if we are to serve the dumb millions of India we cannot do without Spinning Wheel * * * I ask you to give it a place in your schools, I ask you whether you are an Indian, Hindu or Musalman, or whether you belong to one political school in the country or another, to give place to the spinning wheel and Khadder in your homes. You will find, I assure you, after a little bit of experience of the spinning wheel and Khadder that what I have said is truth."

এ ধরণের কথা মহাত্মা এই প্রথম বলিতেছেন না। ইতিপূর্ব্বে আরো অনেকবার তাঁহার এই নিঃসংশয় অনুরোধ দেশের লোকের মনের দুয়ারে ঘা দিয়াছে। সাড়া যে জাগে নাই তাঁহার প্রমাণ—ঘরে ঘরে চরকা ঘোরা তো সুরু হয়ই নাই; লোকের পরণেও খাদির সন্ধান মিলিতেছে না।

অথচ চরকা যে লোকের অনেক দুঃখ দূর করিতে পারে, তাহার পরিচয় বাংলা দেশে অন্ততঃ আজ খুব অস্পষ্ট নয়। উত্তর বঙ্গের বন্যার সময় যাহারা খাইতে না পাইয়া মরিতে বসিয়াছিল, চরকা তাহাদিগকে কাজ দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে এবং আজও যে তাহারা চরকা ছাড়ে নাই, তাহার কারণ, কেবলমাত্র দুর্দ্দিনের বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতার বন্ধন নহে,—তাহার কারণ, আজিও চরকা তাহাদিগকে অন্নবস্ত্রের রসদ যোগাইতে কার্পণ্য করিতেছে না।

উত্তর বঙ্গের লোক বন্যার সময় যে দুঃখ ভোগ করিয়াছিল, সে দুঃখ ভারতবর্ষের একরূপ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। স্বচ্ছল অবস্থা, দুই বেলা দুই মুঠা অন্ন পেট ভরিয়া পাইবার মত অবস্থা—হয় তো দুই চারিজনের থাকিতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের বেশীর ভাগ লোকেরই বরাত ঠিক তাহার বিপরীত। খাইতে পায় না, পরণে বস্ত্র নাই, ম্যালেরিয়ায় জর্জ্জর, মৃত্যু-শয্যাতেও এক ফোঁটা ঔষধ পেটে পড়ে না—এ অবস্থা ভারতবর্ষের শতকরা ৯০ জনের। ভিক্ষুকের দল দিনের পর দিন বাড়িতেছে। রাস্তা-ঘাটে যে সব লোকের চেহারা সাধারণতঃ চোখে পড়ে, দুর্ভিক্ষের যে চেহারার বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার আনন্দমঠে দিয়াছেন, তাহার সহিত তাহাদের অধিকাংশেরই কোনো তফাৎ নাই।

এই দুঃখ প্রতি দিন আমরা ভোগ করিতেছি। দুঃখকে সম্পূর্ণ না হোক অন্ততঃ কতকটা দূর করিতে পারে, এমন যন্ত্রেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। দামও তাহার খুব বেশী নয়, ইচ্ছা করিলে নিজের হাতেও তৈরী করিয়া লওয়া যায়। অথচ এ সব সত্ত্বেও যন্ত্রটাকে আমরা ব্যবহারে লাগাইতে পারিতেছি না। ব্যাপারটা অদৃষ্টের একটা অদ্ভুত পরিহাসের মতই মনে হয়।

বস্ত্রশিল্পে স্বাবলম্বী হইতে পারিলে দেশের অনেক দুঃখ যে দূর হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝি। কারণ, এ শিল্পের জন্য একটা মোটা টাকা প্রতি বৎসর দেশের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে, এ কথা আমাদের অনেকেরই জানা আছে। টাকার ঠিক অঙ্কের খবর হয় তো অনেকেই রাখে না, তবে রাখা যে ভালো তাহাতে মনে নাই। কারণ সাধারণ লোকের এ খবর জানিয়া রাখার উপর দেশের ভালো-মন্দ অনেকখানিই নির্ভর করে। খবরটা জানাও খুব কঠিন ব্যাপার নহে—কয়েক বৎসরের বস্ত্রশিল্পের আমদানী রপ্তানীর হিসাবটা লইয়া সামান্য একটু নাড়াচাড়া করিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্রের আমদানী

বৎসর	কাপড়ের আমদানী		কাপড়ের দাম।
১৯১৭	১৮৯১৭০০০০০	গজ	৪৫৬৪৬৯০০০ টাকা
১৯১৮	১৫২৩৪০০০০০	,,	৪৯৭২৫০০০০ ,,
১৯১৯	১১২২০০০০০	,,	৪৯৪০০০০০ ,,
১৯২০	১০৮০৭৪৮০০০	,,	৫১৭৬০০০০০ ,,
১৯২১	১৫০৯২০০০০	,,	৮৩৭৮০০০০০ ,,
১৯২২	১০৮৯৮০০০০০	,,	৪৩১৬০০০০০ ,,
১৯২৩	১৫৭৭৩০০০০	,,	৫৮৫১০০০০০ ,,

কিন্তু সে যাহাই হোক্, ভারতবর্ষের বিদেশী বস্ত্রের আমদানীর এই আর্থিক অঙ্কগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকিলেও, এই অঙ্কগুলি যে খুব ছোট নহে, বরং বিশেষ বিপুলকায়, সে কথাটা আমরা সকলেই জানি। এতগুলি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, তাহাতে দুঃখ হয় না, এরূপ ভারতবাসীও খুব কমই আছে। তথাপি যে পথ ধরিয়া চলিলে এই টাকাগুলি দেশে রাখিতে পারা যায়, সে পথ আমরা ধরিতেছি না। পথের ইঙ্গিত যে পাওয়া যায় নাই, তাহাও নহে। তথাপি পথটাকে আমরা গ্রহণ করিতেছি না কেন?

এই 'কেন'র জবাব সম্ভবতঃ,—যে পথটা দেখানো হইয়াছে, সে পথের উপর দেশের লোকের যথেষ্ট আস্থা নাই। চরকাও যে গোটা ভারতের বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে পারে—মিলের এই পরিপ্লাবনের যুগে সে কথাটা আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। কেবলমাত্র ভাবের পিছনে ছুটিয়া চলিলে বস্তুর সঙ্গে যখন সংঘাত বাধিবে, তখন হয় তো মার খাইতে হইবে; এই ভয়েই চরকাকে

বস্ত্রশিল্পের হাতিয়ার রূপে গ্রহণ করিতে আমাদের মনেও বাধিতেছে, কাজেও বাধিতেছে। হয় তো আরো অনেক কারণ আছে—ইয়োরোপীয় সভ্যতার মোহ, দীর্ঘ দিনের অনভ্যাস, নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে নিজেদের অনভিজ্ঞতা ইত্যাদি হয় তো এই গ্রহণ না করার মূলে কতকগুলি কারণ। কিন্তু মনে হয়, সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ—চরকার যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ। সুতরাং চরকার উপযোগিতা যদি নিঃসংশয়ে প্রমাণ করা যায়, লোকে যদি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারে যে চরকার দ্বারাও দেশের বস্ত্রশিল্পের কাজ চলা অসম্ভব নহে, বরং ঢের সস্তায় ঢের বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চরকার দৌলতে লাভ করার সম্ভাবনা আছে, তবে চরকার ভবিষ্যৎ একেবারে অনুজ্জ্বল হয় তো না-ও হইতে পারে।

চরকার দ্বারা মিলের অভাব মিটানো যায় কি না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, চরকার অতীতকে উপেক্ষা করা যায় না। কারণ, চরকার শক্তির পরিচয় তাহার অতীতের ভিতরেই আছে। আজ যে মিল আমাদের মনোহরণ করিয়াছে, সে মিল খুব পুরানো জিনিস নহে। বড় জোর শ'দুই বৎসর পিছাইয়া গেলে মিলের অস্তিত্ব আর চোখে পড়ে না। অথচ তাহার পূর্ব্বেও বস্ত্রের চাহিদা মানুষের কাছে এখনকার মত এই রকমেরই ছিল। আর সে যুগের বস্ত্র-সমস্যাকে যে যন্ত্রটি সমাধান করিয়াছিল, তাহাও মিল নহে,—তাহা অতি সাধারণ চেহারার লোহা লক্কড়ের বাহুল্য-বর্জ্জিত এই চরকা। চরকার সেদিনের কথাগুলি স্মরণ করিলে এই কয়েকখানা কাঠের সমষ্টির উপরেও আমাদের শ্রদ্ধা অসম্ভব নয়।

চরকার সম্বন্ধে ভারতবর্ষের সাহিত্যে অনেক রকমের ইঙ্গিত আছে। আর সেই সব ইঙ্গিত চরকার জয়গানেই পরিপূর্ণ। 'চরকার দৌলতে দুয়ারে হাতী' বাঁধিয়া রাখার কথাও এই-সব গানের ভিতর পাওয়া যায়। এ-সব গানের ভিতর কবির অতিশয়োক্তি হয় তো খানিকটা আছে; কিন্তু ইহার আগাগোড়াই যে অতিশয়োক্তি, তাহা মনে করিবার সপক্ষেও কোনো যুক্তি নাই। কারণ, ভারতীয় চরকায় এবং তাঁতে যে-সব বস্ত্র তৈরী হইত, তাহাতে কেবলমাত্র তারতীয় বস্ত্রের অভাবই পূর্ণ হইত না, ভারতবর্ষের বাহিরেও অনেক স্থানের অভাব তাহাতে মিটিয়াছে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প বিদেশের বাজারে কিরূপ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহার পরিচয় দিয়াছেন Daniel Defoe—"But it (Indian cotton goods) crept into our houses, our closets and bed chambers; Curtains cushions, chairs, and, at last, beds themselves were nothing but Calicoes or Indian stuffs, and, in short, almost everything that used to be made of wool or silk, relating either to the dress of the women or the furniture of our houses, was supplied by the Indian trade. What remains, then, for our people to do but to stand still and look on, see the bread taken out of their mouths and the East Indian trade carry away the whole employment of their people?"

আজ ল্যাঙ্কাশায়ারে মিলের দৌলতে ভারতবর্ষের যে অবস্থা, দুই শত বৎসর আগে ভারতবর্ষের চরকার দৌলতে বিলাতের ঠিক সেই অবস্থাই হইয়াছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলি ভারতবর্ষে বস্ত্রের চাহিদা মিটাইয়া যদি কোটি-পতি হইয়া উঠিতে পারে, তবে দুনিয়ার বাজারে বস্ত্রের রসদ যোগাইয়া ভারতবর্ষ যে নিঃস্ব হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

এক শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ চরকার কল্যাণে তাহার নিজের বস্ত্রের প্রয়োজন মিটাইয়া বাহিরেরও চাহিদাতেও যে যোগান দিয়াছে, তাহার উদাহরণ বিদেশী গ্রন্থকারদের গ্রন্থ ছাঁকিয়াই অজস্র দেওয়া যায়। একশ' বছর আগেও যে কাজটা চরকা দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে, আজ আর তাহা চরকার দ্বারা হইতে পারে না, একমাত্র গায়ের জোরের ভিতরেই এরূপ যুক্তির সার্থকতা মিলিতে পারে।

কিন্তু দূরের কথায় অনেকে দূরের বলিয়াই কাণ দিতে চান না। তাঁহারা যুক্তি খোঁজেন বর্ত্তমানের ভিতর। দূরের কথা ছাড়িয়া দিয়া এ যুগের কথা ধরিলেও চরকাকে অগ্রাহ্য করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এ যুগেও অনেক দেশে চরকা মিলের স্থান অধিকার করিয়া আছে, এবং তাহার ফলে সে সমস্ত দেশের বস্ত্র-সমস্যা বিশেষ জটিল হইয়াও উঠে নাই। লোক সংখ্যা এবং বিস্তৃতি হিসাবে চীন ভারতবর্ষ অপেক্ষা ছোট নয়। অত বড় চীনের বস্ত্র-সমস্যাও এই চরকার দ্বারাই মিটিতেছে। চীনে প্রতি বৎসর প্রায় ২০ লক্ষ গাঁট তুলা জন্মে (প্রতি গাঁট প্রায় ছয় মণ)। এই তুলা সে কি ভাবে খরচ করে? মিঃ ডানষ্টনের লেখা ১৯১০ খৃষ্টাব্দের "Papers and Report on Cotton Cultivation" এর ভিতর তাহার পরিচয় আছে। তিনি লিখিয়াছেন, "Not only is most of the raw cotton of China used at the place of production being spun and woven on numberless spinning wheels and Hand-looms; but since the treaty of Shimonosaky in 1895 a number of cotton mills has been started in China.' যে মিলের কথা মিঃ ডানষ্টন বলিয়াছেন, তাহাতে কতটা তুলা ব্যবহৃত হয়, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন Mr. John Todd. তাঁহার "The world's cotton crops" নামক গ্রন্থে আছে "The latter (mills of China) are said to contain a million spindles and to consume about half a million bales of native cotton per annum." অর্থাৎ চীনের ২০ লক্ষ গাঁট তুলার ভিতর মাত্র ৫ লক্ষ গাঁট তাহার মিলে ব্যবহৃত হয়।

এক শত বৎসর পূর্ব্বের চরকার দ্বারা ভারতবর্ষের বস্ত্র-সমস্যা মিটিয়াছে, আর চীনের এখনও মিটিতেছে। সুতরাং চরকার শক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ না করিলেও হয় তো তাহা অন্যায় হইবে না। তবে প্রশ্ন

উঠিতে পারে—চরকার দ্বারা বস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে গেলে, তাহাতে দেশের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ বাড়িবে না কমিবে? ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে প্রতি বৎসর ৩০।৩৫ লক্ষ গাঁট তুলা জন্মে, সে দেশে যে বাড়িবে তাহাতে তো সন্দেহ নাই ই, কিন্তু যে সব দেশে তুলা জন্মে না, সে দেশেও যে বাড়ে, তাহার প্রমাণ দিয়াছেন ঐতিহাসিক Townsend Warner। "Landmarks in English Industrial History"তে তিনি লিখিয়াছেন, "The great sheet-anchor of all cottages and small farms was the labour attached to the handloom * * *. It required 6 or 8 hands to prepare and spin yarn sufficient for the consumption of one weaver. This shows clearly the inexhaustible source there was for labour for every person from the age of 7 to 80 years (who retained their sight and could move their hands) to earn their bread, say 1 to 2 sh. a week without going to parish." এই প্যারিশটা যে কি পদার্থ, তাহার পরিচয় আর একজন দিয়াছেন —"house for the absolutely destitute!"

যে শিল্পের দ্বারা দেশের লোক মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করিতে পারে, দুর্ভিক্ষকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে, মনের আনন্দ এবং দেহের স্বাস্থ্য বজায় রাখিতে পারে—সেই শিল্পের উপরেই যে শিল্প-দেবতার স্বচ্ছন্দ সিংহাসন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিলের বাহিরের চাকচিক্য চোখ-ঝলসানোর মত হইলেও, তাহার দ্বারা সত্যকার সুখসম্পদ যে বাড়ে নাই, তাহার পরিচয় ইয়োরোপের মিল-প্রধান দেশগুলি নিজেরাই প্রদান করিতেছে। সে সব যায়গার socialism, anarchism, syndicalism ইত্যাদি নানা রকমের 'ism' গুলি এই মিলেরই সৃষ্টি। এ-সব ধনি-সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অভিধান। দুঃখ কত বড় নিদারুণ হইলে মানুষ দল পাকাইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহা বোঝা কঠিন নহে। মানুষ তাহার গৃহ হারাইয়াছে মিলের জন্য, সহরের কদর্য্য পল্লীতে অত্যন্ত নোংরা ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে মিলের জন্য, তাহার দেহের স্বাস্থ্য মনের শান্তি নষ্ট হইয়াছে মিলের জন্য। পল্লীগুলি শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছে মিলের জন্য। সুতরাং এ বিদ্রোহ অস্বাভাবিক নয়।

ধর্ম্মঘট, হানাহানি, মারামারি, যে মিলের নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, শান্তি যদি তাহারই বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠে, তবে শান্তির দেবতাও যে বিগড়াইয়া গিয়াছেন,—তাঁহার অনুচরেরা আর যাহাই দিক, সন্তোষ যে দিতে পারিবে না—দুনিয়ার অনেক মনীষী ভাবুক আজ সে রকমের সন্দেহও করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারা বাৎলাইতেছেন ফিরিয়া চলার পথ। ইয়োরোপ যেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিলে বাঁচে, আমরা সেইখানে পৌঁছিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি।

ঠেকিয়া শেখা অপেক্ষা দেখিয়া শেখার দুঃখ যে ঢের কম তাহাতে ভুল নাই; এবং সত্য কথা বলিতে গেলে, কেবল দেখার নয় ঠেকারও চূড়ান্ত দুঃখ এবং লজ্জা আমাদের অদৃষ্টে ঘটিয়াছে। দেখিয়াও যাহারা শেখে না এবং ঠেকিয়াও যাহাদের চোখ ফোটে না, দেবতার ধ্বংসের বজ্র না কি তাহাদের জন্যই গড়িয়া ওঠে। মিল দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে, চরকার দ্বারা হয় তো তাহা সুদে আসলে পোষাইয়া লইতে পারা যাইবে, হয় তো বা যাইবে না। কিন্তু মিল যে শ্রেয়র পথ নহে, তাহাতে যখন ভুল নাই, এবং মিলেও চরকা ছাড়া বস্ত্রসমস্যা সমাধানের যখন অন্য পথও পাওয়া যাইতেছে না, তখন চরকা পুরানো পথ হইলেও, তাহাই যে একমাত্র পথ, তাহাও নিঃসংশয়েই বলা যায়। তাহা ছাড়া, যে চরকার অতীত অত উজ্জ্বল, তাহার ভবিষ্যৎকে সন্দেহ করিবারই বা কি কারণ আছে?

আষ্ট্রীয়া

শ্রীনরেন্দ্র দেব

বিষয়-বুদ্ধি ও ব্যবসায়-নৈপুণ্যই যার প্রধান গুণ সে-লোক প্রায়ই মজলিশি বা মিশুক হয় না। কারণ যে মধুর স্বভাবের গুণে মানুষ জনপ্রিয় হয়, ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যায় না। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন যে লোক—কিসে দিন-দিন তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পায়, কিসে তার নামযশ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়, এই দিকেই যার প্রধান লক্ষ্য,—সে রকম লোকের সঙ্গ ও সহবাস মোটেই প্রীতিপ্রদ হয় না। ব্যক্তিগত হিসাবে এটা যেমন সত্য, জাতিগত হিসাবেও এটা তেমনিই সত্য।

এই জন্যই প্রখর বিষয়-বুদ্ধি সম্পন্ন ইংরাজ ও জার্ম্মানরা জগতের কাহারও প্রিয় নয়; অথচ আষ্ট্রীয়ানরা সহজেই সকলের চিত্ত জয় করে নেয়। আষ্ট্রীয়ানরা জার্ম্মানদেরই জ্ঞাতিভাই বটে; কিন্তু প্রশিয়ার প্রবল প্রভাবকে এড়িয়ে সে নিজের বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা ঠিক বজায় রাখতে পেরেছে। তবে যারাই কিন্তু বেশী দিনের জন্য আষ্ট্রীয়ায় বেড়িয়ে এসেছে, তারাই বলে, যে আষ্ট্রীয়ানরা একটু অলস প্রকৃতির লোক। তারা বেশ ধীরে-সুস্থে কাজ ক'রতে ভালবাসে, তাড়াহুড়ো যেন তাদের জীবনের মধ্যে খুঁজেই

পাওয়া যায় না। আষ্ট্রীয়ানদের আর একটা সাঙ্ঘাতিক দোষ আছে এই যে, আমাদের এদেশী রাজ-কর্ম্মচারীদের মতো তাদের রাজ-কর্ম্মচারীরাও একান্ত ঘুষ-খোর। সততার অভাবেই তাদের দেশের শাসন-পরিষদ রাজকার্য্য পরিচালনের সম্পূর্ণ অক্ষম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আগে জার্ম্মানী বেড়িয়ে তার পর আষ্ট্রীয়ায় গিয়ে পড়লে যেন মনে হয়, একটা কারখানা বাড়ী থেকে একেবারে একটা বৈঠকখানায় এসে পড়লুম। ঘড়ী ধরে কলের মতো কাজ করার দেশ থেকে এ যেন অনেকটা



কারিন্থিয়ানের সুসজ্জিতা কৃষকবালা।



প্রাচীন পোষাকে ভিয়েনার সুন্দরী।

যা খুসি করার দেশে এসে পড়েছি বলে মনে হয়। কাজেই বাঁধা-ধরা নিয়মের বাইরে আসার যে একটা আরাম ও আনন্দ, সেটা এখানে এসে বেশ স্পষ্ট অনুভব করতে পারা যায়। তা ছাড়া আষ্ট্রীয়ার প্রধান সহর ভিয়েনার এমন একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ আছে, এবং এই সহর-বাসীদের সকলেরই মনের মতো আমোদ-প্রমোদ নিয়ে যতদূর পারা যায়, জীবনটাকে উপভোগ করবার প্রবৃত্তিটাই প্রধান বলে, এখানে সর্ব্বদাই এমন একটা আনন্দের হিল্লোল ব'য়ে যায় যে, ভিয়েনায় গিয়ে মানুষ খুসি না হয়ে থাকতে পারে না। বার্লিনের অধিবাসীদের কঠোর মুখভাব এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ গভীর দৃষ্টির পাশে এই ভিয়েনায় হাসিমুখ ও কোমল দৃষ্টি যেন প্রাণে অনেকখানি স্বোয়াস্তি এনে দেয়। ভিয়েনায় মেয়েদের পোষাক ভারি চমৎকার। ভিয়েনার মেয়েদের কাছ থেকে অনেক রকম পোষাকের ফ্যাশান আজ জগতের মেয়েরা শিখেছে। ছিপ্‌ছিপে গড়নের সুশ্রী ও সুন্দরী মেয়ে এখানকার সকল শ্রেণীর মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। বিপদকে এরা যেন মোটেই ভয় করে না, দুর্ঘটনাকেও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এরা গ্রহণ করতে পারে। রাজনীতির ব্যাপার নিয়েও এরা মোটেই মাথা ঘামাতে চায় না,—যা হবার হবে, বলে বেশ নিশ্চিন্ত হ'য়ে থিয়েটার দেখে, নাচ গান করে, পান-ভোজন, উদ্যান-ভ্রমণ ও আড্ডা দিয়ে কাটিয়ে দেয়। সহরের এই চাল সেখানকার মফঃস্বলেও খুব সংক্রামিত হয়েছে। ভিয়েনা যা করবে, তার দেখা-দেখি প্রাদেশিক সহরগুলোও সব তাই অনুকরণ করে; কারণ, রাজধানী সকল দেশেরই আদর্শ হয়ে ওঠে।

এখনকার মতো আষ্ট্রীয়াতেও যত উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, ব্যবসাদার, বড় বড় রাজ-কর্ম্মচারী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতকলাবিদ্, সকলেই যে যার দেশ ছেড়ে, ভিয়েনা সহরে এসে বাস করবার জন্য লালায়িত। Ringstrasse অর্থাৎ, রিং ষ্ট্রীটে যেখানটাকে ভিয়েনা সহরের 'চক্‌বাজার' বলা যেতে পারে, সেখানে যে 'ষ্টাইলে' সহুরে লোকেরা চলা ফেরা করে, যে রকম 'ফ্যাশানে' পোষাক-পরিচ্ছদ পরে, দেখতে দেখতে আষ্ট্রীয়ায়, সাল্‌সবার্গে, ইন্স ব্রুকে, লিঞ্জ্ ও গ্রাজে তার হুবহু নকল ছড়িয়ে পড়ে।

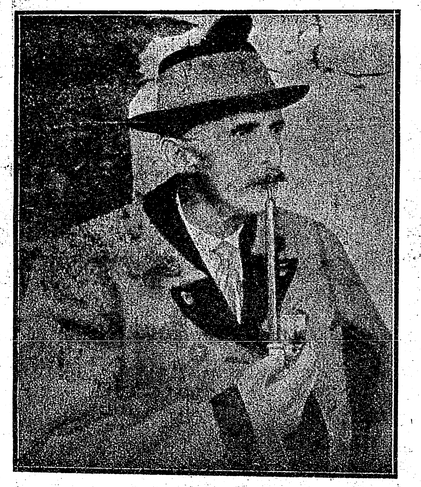

টাইরলের ক্ষেত্রপাল।

উত্তর-আষ্ট্রীয়া ও দক্ষিণ-আষ্ট্রীয়ার সাধারণ অধিবাসীরা, ষ্টাইরীয়া, কারিন্থিয়া, টাইরোল প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা এবং জার্ম্মাণ ভাষা-ভাষী কয়েকটা প্রদেশের বাসিন্দারা যাদের নিয়েই বর্ত্তমান আষ্ট্রীয়ার অস্তিত্ব, তারা সকলেই নিরীহ কৃষক, চাষ-বাস করাই তাদের পেশা। তারা সবাই নিতান্ত ভাল মানুষ, গোবেচারা লোক। তারা রাজ-নীতির কোনই ধার ধারে না; বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতিই বা কি, আর স্বরাষ্ট্র পদ্ধতিই বা কাকে বলে, এসবের অর্থ পর্য্যন্ত তারা জানে না, কিন্তু তবু শুন্‌লে হয়ত আমরা আশ্চর্য্য হ'য়ে যাবো, যে তারা সকলেই স্কুলে পড়েছে এবং সবাই তারা বেশ মোটামুটি লেখাপড়া জানা লোক। আষ্ট্রীয়ায় নিরক্ষর মূর্খ লোক কদাচ এক-আধজন দেখতে পাওয়া যাবে।

জার্ম্মানীর সহরগুলি যেমন ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে, রাস্তা-ঘাটগুলি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আষ্ট্রীয়ার সে রকম নয়। এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির কাজ একটু ঢিলে-ঢালা গোছের। এখানকার মেথর বা ধাঙড়রাও তেমন চটপটে



'সেলো' বাদক।

চতুর ও কার্য্য-তৎপর নয়। তাদের মধ্যেও যথেষ্ট আলস্য ও কার্য্যে অমনোযোগিতা দেখতে পাওয়া যায়। তবুও এরা কোনও রকমে কাজ চালাচ্ছে দেখে, আশা হয়, হয়ত আমরাও 'স্বরাজ' পেলে এক রকম করে চালিয়ে দিতে পারবো।

আষ্ট্রীয়ায় "ক্রিশ্চান্-সোশ্যালিষ্ট" বলে একটা রাজ-নৈতিক দল আছে। এঁরা নামে "সোশ্যালিষ্ট" হ'লেও

কাজে কিন্তু মোটেই তা নন, বরং ঠিক তার বিপরীত। এঁরা ধনীর স্বার্থরক্ষার দিকেই অধিক মনোযোগী এবং কৃষক-সম্প্রদায়ের সর্ব্বনাশ করবার জন্য তাদের প্রতি এত বেশী দয়াপরবশ যে, তাঁদের অনুগ্রহে আষ্ট্রীয়ার খাদ্য-দ্রব্যাদি ক্রমেই দুর্ম্মূল্য হ'য়ে উঠ্‌ছে। এঁরা আবার 'সোশ্যালিষ্ট' কথাটার আগে একটা 'ক্রিশ্চান্' বিশেষণ যোগ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য কথা ব'লতে গেলে, বলতে হয় যে, তাঁরা 'ক্রিশ্চান্' এই শব্দটা পর্য্যন্ত ব্যবহার করবার যোগ্য নন। যুহুদীদের উপর এঁরা যে ভীষণ উপদ্রব ও অত্যাচার করেন, তা যে কোনও সভ্য-জাতির পক্ষে দারুণ লজ্জা ও



ভিয়ানার পুরাতন ফলের বাজার।

কলঙ্কের কথা। আগে তো যুহুদীদের এঁরা একেবারে অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করেই রেখেছিলেন। তখন তারা সহরের যুহুদী-পাড়াটুকু ভিন্ন অন্য কোথাও থাকতেই পেতো না। সহরের যুহুদী পল্লীর ঘৃণিত নাম ছিল "ঘেটো"। যুহুদীদের জায়গা-জমি বা ঘর-বাড়ী কেনবার অধিকার ছিল না। তারা শুধু খুচ্‌রো কারবার আর সুদে টাকা ধার দিয়ে জীবিকা উপার্জ্জন করতো। তার পর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আষ্ট্রীয়ার গভর্মেণ্ট্ বিশেষ আইন জারি করে, যুহুদীদের উপর এই অন্যায় অত্যাচার অবিচার দমন করেন। কিন্তু, আইন জারি হওয়া সত্ত্বেও লোকের সংস্কার এখনও দূর হয়নি। এখনও একজন যুহুদীর পক্ষে কি সরকারী কাজে, কি সামরিক কাজে উচ্চপদ লাভ করা একেবারেই অসম্ভব! কাজেই তারা এদুটো দিকে বড় একটা ঘেঁসতেই চায় না। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্যে, মহাজনী ও তেজারতী কারবারে, এমন কি শিক্ষা-বিভাগে, আইন-ব্যবসায়ে ও সঙ্গীত-বিদ্যায় তারা অনেকেই আজ-কাল প্রধান হয়ে উঠ্‌ছে। "ক্রিশ্চান্ সোশ্যালিষ্টদের" দলের উদ্দেশ্য ও কার্য্য-পদ্ধতির একটা প্রধান সূত্র হচ্ছে 'যুহুদী-নিপাত'; কাজে-কাজেই "সোশ্যাল ডেমোক্রাট" বলে এদের প্রতিদ্বন্দ্বী যে এক দল গড়ে উঠেছে, তাদের খাতায় অনেক যুহুদী এসে নাম লিখিয়েছে। এই "সোশ্যাল্ ডেমোক্রাট্" দলটীকে প্রাণপণে সুসংবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী ক'রে তুলেছিলেন যিনি, সেই মহাপুরুষ 'ভিক্টর এাড্‌লার' স্বয়ং একজন যুহুদী ছিলেন। সাম্য ও মৈত্রীই হচ্ছে এই দলের সুদৃঢ় ভিত্তি। ক্রিশ্চান্ সোশ্যালিষ্টদের চেয়ে এদের দলটি যদিও দৃঢ় সঙ্ঘবদ্ধ, কিন্তু তবুও এই সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য-সূচী নেই। কেবল একটা কাজ এরা খুব্ মনোযোগ দিয়ে ক'রছে দেখা যায়; সেটা হ'চ্ছে, কোনও শ্রেণী-বিশেষের প্রভাব যাতে না বলবত্তর হ'য়ে

উঠে, অপর শ্রেণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী ক'রতে পারে। অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে গুণানুপাতে ভেদাভেদ বেড়ে গিয়ে যাতে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি না করে। আরও একটা খুব ভাল কাজ তারা করছে, পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়ের ক্ষমতাকে খর্ব্ব করে রেখে। এ দুটো কাজেই তারা যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছে। সাবালক মাত্রেই রাষ্ট্রীয়



বোহেমীয়ার আপেলওয়ালী

ব্যাপারে ভোটের অধিকারী হবে, এই নিয়মটিও তাদেরই চেষ্টায় আজ আষ্ট্রিয়ায় বিধিবদ্ধ হয়েছে।

নানাদিক দিয়ে দেখতে গেলে, য়ুরোপের পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে আষ্ট্রিয়ার মতো যথার্থ গণতন্ত্র-বাদী জাত আর নাই বললেও হয়। এ ব্যাপারে তারা প্রায় রুষিয়ারই সমকক্ষ। আষ্ট্রিয়ায় এক দীনহীন পথচারী ভিক্ষুক-বালকও এক দিন স্বীয় যোগ্যতার জোরে অনায়াসে আষ্ট্রিয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে উঠে আসতে পারে। আষ্ট্রিয়ান অভিজাত বংশীয়েরা এত প্রাচীন ও সর্ব্বজন-পরিচিত সম্ভ্রান্ত লোক যে তারা জাত যাবার ভয় একটুও করে না। এই জন্যই বোধ হয় শাসন-পরিষদের উচ্চপদে কোনও সামান্য লোক অধিষ্ঠিত হ'লেও তারা কিছুমাত্র আপত্তি করেন না। আষ্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনীর মধ্যেও জাতিভেদ নেই। অধিকাংশ সৈন্যাধ্যক্ষই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক। এক-জন সামান্য সেনানী স্বীয় বলবীর্য্যের গুণে এক দিন

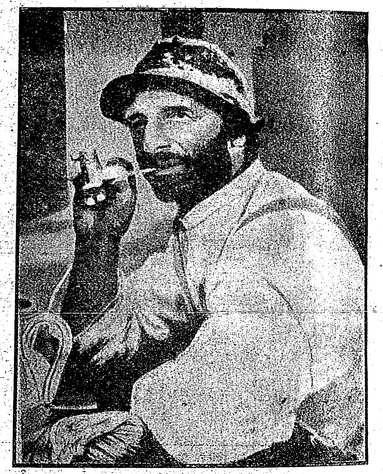

টাইরলের মজুর।

সেনাপতির আসনে উঠে আসতে পারে। আবার আষ্ট্রিয়ার সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে একেবারে অযোগ্য ও সৈন্য-পরিচালনায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ লোকও যথেষ্ট আছে। আষ্ট্রিয়ার সৈনিকদের প্রকৃতি ঠিক যোদ্ধাদের মত দুর্দ্ধর্ষ নয় এবং তাদের স্বভাবও ততটা নিষ্ঠুর নয়। তাদের বেশ শান্ত ও ভদ্র চেহারা। যোদ্ধৃবেশে তাদের যেমন মানায়, এমন আর কোনও দেশের সৈনিকদের মানায় না। সঙ্গী হিসেবে এরা বেশ আমুদে লোক। বন্ধু হিসেবে অতি অমায়িক, এবং শত্রু হিসেবেও আষ্ট্রিয়ার সৈন্য মোটেই ভয়ঙ্কর নয়।

আষ্ট্রিয়ার চাষারাও ভারিক্কী প্রকৃতির লোক। সপ্তাহে ছ'দিন তারা হাড় ভাঙা খাটুনী খেটে রবিবারটা ছুটি নেয়। এই ছুটির দিনটা তারা সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে উপভোগ করে। ছুটির দিনে তারা সব রঙীন পোষাক পরে 'জীথার' বাজিয়ে নাচে, গান গায়, স্ফূর্ত্তি করে। তাদের এই অবসরের আনন্দ উল্লাসে এমন একটা জীবন্ত প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়, যেটা অনেক দেশেই নেই।

আষ্ট্রিয়ার পুরুষেরা হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা ঢিলে পায়জামা পরে, পায়ে সবুজ রংয়ের কিম্বা সাদা মোজা পরতে ভাল-



প্রাচীন টাইরলের বেশভূষা।

বাসে। ফুলদার ও বেলদার চিকণের কাজ করা কামিজ গায়ে দেয়। তার ওপর ছোট একটা কোর্ত্তা পরে, মাথায় বনাতের টুপী দেয়—তাতে আবার একটা পালক কিম্বা একগুচ্ছ পশুলোম এক দিকে চূড়ার মতো আঁটা থাকে।

মেয়েদের পোষাক বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের। কিন্তু সর্ব্বত্রই তা এমন সুন্দর ও শোভন যে তাদের চমৎকার মানায়! কোনও কোনও অঞ্চলে মেয়েদের পোষাকের একটু বাহুল্য দেখা যায় বটে, বিশেষ তাদের টুপী আর আঙরাখার বাহারের এত বেশী আড়ম্বর যে সেটা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে আজ কাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাদের মধ্যে অনেকেই এ সব সেকেলে পোষাক পরিচ্ছদ আর বড় একটা পছন্দ করছেন না।

বিগত যুদ্ধের ফলে আষ্ট্রিয়ার যে রকম ক্ষতি হ'য়েছে, অতটা ক্ষতি বোধ হয় যুদ্ধমান আর কোনও জাতিরই হয় নি। যুদ্ধের পূর্ব্বে আষ্ট্রিয়া একটা সাম্রাজ্য ছিল। তখন তাদের আত্ম-নির্ভরতার উপায় ছিল। এখন তাদের দুটো প্রধান খনিজ-পদার্থ কয়লা আর লোহা থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। সমুদ্র বন্দরও তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে;

সেই বিখ্যাত রিরাট সহর এখনও তাদের রাজধানী হ'য়ে ব'সে আছে বটে, কিন্তু রাজ্য তাদের এমনিই ক্ষুদ্রতা লাভ করেছে যে, একটা ক্ষুদ্র সহরের কার্য্য-পর্য্যন্ত পরিচালন করতেও সে অক্ষম। আর সে রাজ্যের এখন একমাত্র চাষবাস ছাড়া আর কোনও রকম আয় ও উপার্জ্জনের পন্থাও বন্ধ হয়ে গেছে।

আষ্ট্রিয়ার শ্রেষ্ঠ খনিগুলি ছিল বোহেমিয়া ও মোরাভিয়া প্রদেশে; কিন্তু সে দু'টি স্থানই এখন জেকোশ্লোভাকিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। গ্যালিসিয়ার প্রসিদ্ধ তেলের খনি



টাইরলের বাদ্যকরেরা।

এখন পোল্যাণ্ডের অধিকারে। আষ্ট্রীয়ার অরণ্য-সম্পদ যে কার্পেথিয়ান্, তাও এখন তার হস্তচ্যুত হয়ে পড়েছে! আষ্ট্রীয়ার বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ ঘোড়া আস্‌তো গ্যালিসিয়া থেকে! আষ্ট্রীয়া যে সব স্বাস্থ্যকর জায়গার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, আষ্ট্রীয়ার সে বিশেষত্বও আজ সে হারিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, যুদ্ধ মেটবার পর, সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে গিয়ে আষ্ট্রীয়া তার সমস্ত ভবিষ্যৎ এমন কি গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় পর্য্যন্ত হারিয়ে বসেছে!

পৃথিবীতে ভিয়েনার মতো আনন্দপ্রদ সহর অতি অল্পই আছে। এই সহর এক দিন সারা রাত বিনিদ্র হ'য়ে শুধু নাচ গান উপভোগ ক'রতো। আলোক-ছটায় ও নানা বর্ণ-বিন্যাসে এক দিন সে সুন্দরী যুবতীর মতোই তরুণী ও মনোহারিণী ছিল। এই সহরের রাস্তা-ঘাট ও ঘরবাড়ী বেশ সুবৃহৎ ও সুনির্ম্মিত। ভিয়েনাকে লোকে এক দিন 'ফুলের সহর' বলে অভিহিত করেছে। ভিয়েনায় যত বেশী "পার্ক" বা সাধারণের জন্য বিহার-উদ্যান আছে, তত আর অন্য কোনও দেশেই দেখতে পাওয়া যায় না। আষ্ট্রীয়ার চারি পার্শ্বের অন্যান্য সহরও এখনও এত সুন্দর ও অক্ষত হ'য়ে আছে যে, তাদের পক্ষে এখনও এতটা আমোদ



টাইরলের কৃষক পরিবার।

প্রমোদ করা যেন মোটেই অশোভন মনে হয় না।

কিন্তু আজ সেই ভিয়েনা অতিশয় দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হ'য়ে প'ড়েছে। আজ যেন তার অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজনই নেই! আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যকে যারা আজ বিভাগ



কৃষকদের ধর্ম্মমূলক গীতাভিনয়।



কাটুরিয়াদের কুটীর।

ক'রে দিয়েছে, তারা এ কথাটা বোধ হয় একবার ভেবে দেখেনি যে, আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যটা গড়েই উঠেছিল তার অর্থ-নৈতিক প্রয়োজনীয়তার আকর্ষণে! আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশটাই বেঁচে থাকবার জন্য পরস্পরের একান্ত মুখাপেক্ষী! এক দিক আর এক দিককে সাহায্য না করলে এর কোন দিকটাই স্বতন্ত্র ভাবে টিকতে পারে না। তাই আষ্ট্রীয়া সাম্রাজ্য বিছিন্ন ও বিভক্ত হয়ে যাবার পর এর প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ দুর্ব্বল অসহায় ও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। আগে যেখানে যেখানে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাস করতো, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কল কারখানা চলতো, এখন সে সব অঞ্চল যেন নিঃসঙ্গ অন্ধকারের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে!

আষ্ট্রীয়া সহরে বাস করার পক্ষে কতকগুলো অসুবিধাও আছে একেবারে মারাত্মক রকমের। যেমন "বাড়ীওয়ালা"র উৎপাত একটা অসহ্য



বোম্বাইয়ের পার্ব্বত্য পথের মনোরম দৃশ্য।

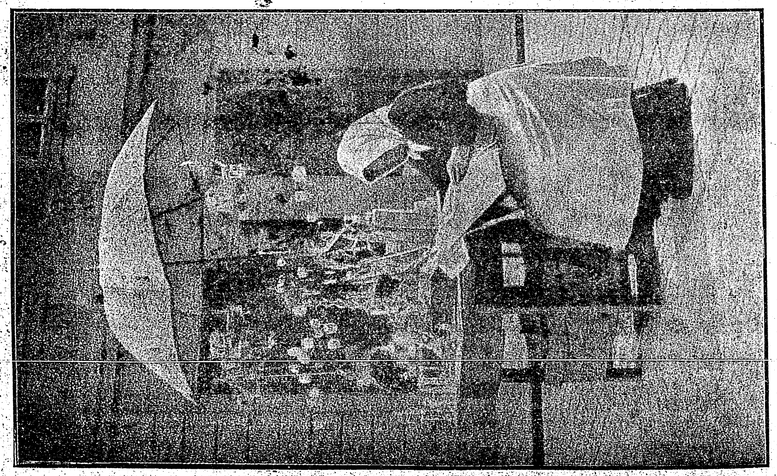

ভিয়ানার ফেরিওয়ালী।

অত্যাচার। প্যারিসের' বাড়ীওয়ালার নিন্দা অনেক রকম শোনা যায় বটে কিন্তু তারাও আষ্ট্রীয়ার বাড়ীওয়ালাদের মত ছোটলোক নয়। আর একটা হাঙ্গামা আছে পুলিশের। কোনও বাড়ীতে নূতন কোনও ভাড়াটে এলেই পুলিশ এসে বাড়ীওয়ালার কাছে তার আদ্যোপান্ত পরিচয় জানতে চায়, কাজেই বাড়ীওয়ালাকেও ভাড়াটে রাখবার সময় তার নাড়ী নক্ষত্রের হিসাব নিয়ে রাখতে হয়। রাত্রি দশটার পর আইন অনুসারে বাড়ীওয়ালা সদর দরজা বন্ধ করে দিতে বাধ্য। দশটার পর ভাড়াটেদের কারুর বাইরে যাবার দরকার হ'লে অথবা বাড়ী ঢোকবার প্রয়োজন হ'লে ঘণ্টা বাজিয়ে দ্বারবান্‌কে ডাকতে হয়। দ্বারবান কিম্বা তার স্ত্রী উঠে এসে দরজা খুলে দেয়—কাজেই ভাড়াটেদের কার কি রকম স্বভাব চরিত্র সেটা জানতে আর তাদের বেশীদিন সময় লাগে না। পুলিশ এই দ্বারবানদের কিছু কিছু বখ্‌শীস্ দিয়ে এদের কাছ থেকেই ভাড়াটের কার কি রকম চাল-চলন, কে কি করে, কার কাছে কে আসে-যায়, গভর্মেণ্টের সম্বন্ধে কার কি রকম মতামত, এই সব সন্ধান নেয়।

গভর্মেণ্ট সর্ব্বদাই তাদের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত। রাজকর্ম্মচারীরা মনে করে যেন তারাই দেশের শাসনকর্ত্তা! তারা যে দেশবাসীরই নিয়োজিত বেতনভোগী ভৃত্য মাত্র, এ কথাটা তাদের মনেই থাকে না! পূর্ব্বেই বলেছি রাজকর্ম্মচারী হবার আকাঙ্ক্ষাটা আষ্ট্রীয়ান যুবকদের মধ্যে এত বেশী প্রবল যে, তারা সবাই রাজসরকারে একটা চাকরী পাবার জন্য বিধিমত চেষ্টা ক'রে, ফলে কাজের চেয়ে কর্ম্মচারীর সংখ্যা সেখানে বেশী হয়ে পড়েছে! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছর যে সব ছেলেরা পাশ করে 'জুরিষ্ট্' হ'য়ে বেরোয়, তারাও আইনের ব্যবসা ছেড়ে রাজসরকারে চাকরী পাবার চেষ্টাটাই আগে করে। ওখানেও 'মুরুব্বীর' জোর না থাকলে কারুর কিছু সুবিধে হবার জো নেই, নিজের দক্ষতায় বড় হ'য়ে উঠবার সুযোগ খুব কম লোকই পায়। কাজেকাজেই সেখানে ওকালতী পাশ করা 'জুরিষ্ট্'-উপাধি-ভূষিত ছেলেরাও দেখা যায় হয়, কেরাণীগিরি করছে নয়ত টাইপিষ্টের কাজ করছে,—কিম্বা হয়ত, এমন সব ছোট-খাট কাজও করছে যা নাকি কেবলমাত্র নিরক্ষর বালকভৃত্যদের করাটাই শোভা পায়।



ভিয়ানার মজুরণীদ্বয়।

ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যাও নাকি আষ্ট্রীয়ায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে পড়েছে।

সংবাদ-পত্রের অবাধ স্বাধীনতা আষ্ট্রীয়ায় বিধিবদ্ধ হয়ে আছে বটে, কিন্তু রাজকর্ম্মচারীরা ইচ্ছা করলেই যে কোনও

সংবাদ-পত্রের প্রকাশ বন্ধ করতে না পারলেও বিক্রয় বন্ধ ক'রে দিতে পারেন। কারণ আষ্ট্রীয়ায় খবরের কাগজ-ওয়ালারা কাগজ ফেরি ক'রে বেচতে পায় না, সেখানে আইন অনুসারে তা নিষিদ্ধ। কেবলমাত্র চুরুটওয়ালারাই তাদের দোকানে খবরের কাগজ রেখে বেচবার অনুজ্ঞা-পত্র পায়।

যুদ্ধের পূর্ব্বে ভোজনাগারই ছিল আষ্ট্রীয়ানদের প্রধান আড্ডা। এক ভিয়েনা সহরেই প্রায় সাতশ' 'কাফে' বা পানাহার-আলয় ছিল। স্ত্রী পুরুষ উভয় সম্প্রদায়ই অপরাহ্নে বা সায়াহ্নে একবার সবান্ধবে কোনও না কোনও একটা 'কাফে'তে ঢুকে কফি ও রুটি খেতে খেতে ঘণ্টা দুই তিন বেশ আড্ডা দিয়ে কাটায়। পান-ভোজনের পর তারা সেখানে তাশ খেলে, জুয়া খেলে সময় কাটায়। তাশ ও পাশার জুয়া সন্ধ্যার পর আষ্ট্রীয়ার প্রায় প্রত্যেক ছোট বড় হোটেলে খেলা হ'চ্ছে দেখা যেতো। ভাল ভাল পোষাক-পরা বড় ঘরের ছেলে মেয়েরাও দলে দলে হোটেলে ইয়ারকি দিতে আসতো। প্রত্যেক হোটেলেই তখন গান বাজনা, খেলা-ধূলো, নাচ তামাসা, প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ অবিশ্রান্ত চ'লতো ব'লে ভিয়েনা সহর একেবারে সরগরম হয়ে থাকতো।

অর্থকরী বিদ্যা বা বৃত্তি শিক্ষার যে ধূয়ো আজ আমাদের দেশে খুব বেশী রকম শোনা যাচ্ছে, আষ্ট্রিয়ায় একেবারে তার চূড়ান্ত আয়োজন দেখতে পাওয়া যায়।

যেখানেই আষ্ট্রীয়ার একটা ছোট খাটো কারখানা বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায়, অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিদ্যালয়ও চোখে পড়ে। এই বিদ্যালয়ে ছেলেদের শুধু উপার্জ্জনক্ষম করে ছেড়ে দেয় না, সেই বিশেষ শিল্প সম্বন্ধে যাতে ছেলেদের একটা যথার্থ টান থাকে এবং সেই শিল্পের উন্নতি ও বিস্তৃতিকল্পে ভবিষ্যতে তারা যাতে সচেষ্ট হ'য়ে ওঠে, সে শিক্ষাও তাদের দেওয়া হয়।

মেয়েদেরও সেখানে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের এ সবও শিক্ষা দেওয়া হয় যে—কেমন ক'রে সুগৃহিণী হ'তে পারা যায়, কেমন ক'রে কলা ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্য্য সুসম্পন্ন করতে হয়, কেমন ক'রে ছেলে-পিলে মানুষ করতে হয়, কেমন ক'রে পরিবারস্থ সকলকে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দের মধ্যে রাখা যেতে পারে, ইত্যাদি, এ সমস্তও তন্ন তন্ন ক'রে তাদের শেখানো হয়।

ভিয়েনা সহরে ছোটলোকদের 'বস্তী' বলে কোথাও কিছু নেই। লণ্ডন প্রভৃতি অন্যান্য বড় সহরে যেমন এক একটা নরক-তুল্য এই বস্তীর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়, ভিয়েনার দরিদ্র পল্লী ঠিক সে রকম নয়। গরীব দুঃখী ইংরাজ ইতর শ্রেণীদের বাসস্থান অপেক্ষা এখানকার দীন দরিদ্র নিম্ন শ্রেণীদের কুটীর অনেক অংশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এরা থাকেও বেশ আমোদ আহ্লাদে মগ্ন হ'য়ে!

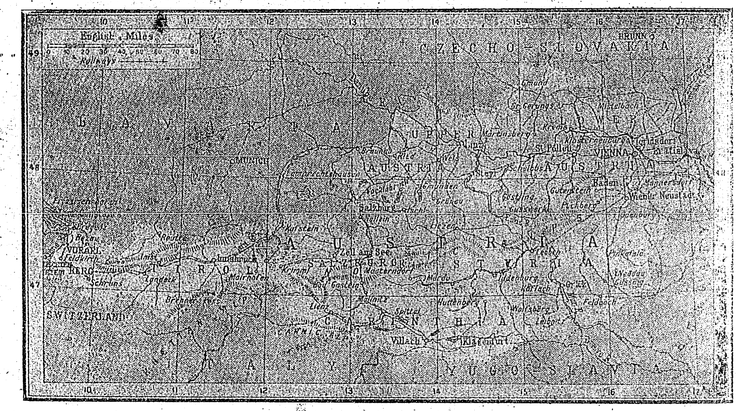

বর্ত্তমান আষ্ট্রিয়ার মানচিত্র।

খুন-জখম ও দাঙ্গা হাঙ্গামা এ সব তাদের মধ্যে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। বেশ সদ্ভাবে মিলে মিশে তারা নিজেদের কাজ নিয়ে দিন কাটায়।

আষ্ট্রীয়ার চাষারা পর্য্যন্ত কি পোষাক পরিচ্ছদে, কি কাজ কর্ম্মে, কি আহার বিহার ও শয়নে সকল বিষয়ে অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোনও কিছু নোংরা তারা একেবারেই দেখতে পারে না।

আষ্ট্রীয়ানরা অধিকাংশই রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। ধর্ম্মযাজকদের সম্মান এখানে সকল দেশের চেয়ে বেশী। পুরোহিতদের উপদেশ যে আষ্ট্রীয়ানরা কেবল ধর্ম্মকার্য্যেই গ্রহণ করে তা'নয়, তাদের অনেক বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারেও তারা আচার্য্যদের উপদেশ মেনে চ'লে ও তাঁদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করে।

সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, শোভায় এই আষ্ট্রীয়া একদিন জগতের প্রশংসা-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল; কিন্তু আজ বিগত য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফলে এমন নির্দ্দয়ভাবে তার অঙ্গচ্ছেদ করা হ'য়েছে যে, সে আজ বিশ্বের অবজ্ঞাত ও তাচ্ছিল্যের পাত্র হয়ে পড়েছে! এটা শুধু আষ্ট্রীয়ানদেরই ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয় নয়, বিংশ শতাব্দীর সুসভ্য য়ুরোপীয় জাতিদের একটা চিরদিনের মতো দুরপনেয় কলঙ্কের পরিচয়।

স্মৃতি-তর্পণ

স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৃত্যু-সংবাদ আকস্মিক হ'লেও অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর বয়স হ'য়েছিল ৭৬।৭৭ বৎসর—সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের জীবন-অনুপাতে তা' দীর্ঘই ব'লতে হবে। কিন্তু তা' হ'লেও তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের যে স্থানটা শূন্য হ'ল—তা' পূরণ করবার লোকের একান্তই অভাব।

তার প্রধান কারণ হ'চ্ছে এই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের যে-দিকটার দিকে বেশী ঝোঁক দিয়েছিলেন, সেখানে তাঁর মত প্রতিভা নিয়ে কেউ বড় একটা পদক্ষেপ ক'রতে ইচ্ছুক নন্। সেটা অনুবাদের দিক। বিভিন্ন ভাষা থেকে রত্ন আহরণ ক'রে তিনি মাতৃভাষার ভাণ্ডার পূর্ণ ক'রে গেছেন। এ ঋণ বাঙ্গালী কখনো ভুল্‌তে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যে যে কতটা ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়, তা' ক্ষুদ্র যশাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির পক্ষে বুঝে ওঠা অসম্ভব।



৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নূতন সৃষ্টি করবার ক্ষমতা ছিল—তা' তাঁর "অশ্রুমতী" "সরোজিনী" প্রমুখ নাটক থেকেই বোঝা যায়। তাঁর সুর রচনা করবার ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। অনেকে হয় ত জানেন না যে, তাঁর সুরে ভাষা দেবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথের আগেকার অনেক গান রচিত হয়েছিল। তাঁর চিত্রাঙ্কন ক্ষমতা রদেনষ্টাইনের মত চিত্রকরেরও প্রশংসা অর্জ্জন ক'রেছিল। উপরিউক্ত যে কোন বিভাগে তিনি যশঃ অর্জ্জন ক'রতে পারতেন। কিন্তু সে সব আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ ক'রে তিনি বঙ্গভাষার উন্নতি

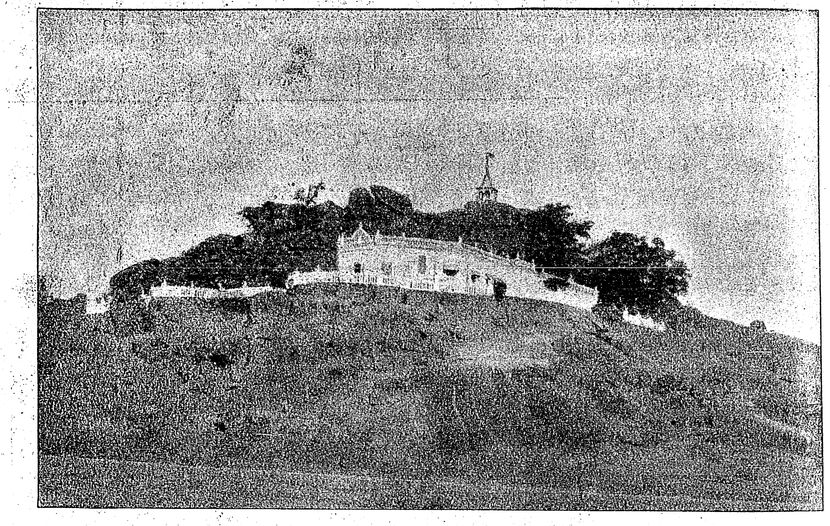

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাসভবন—মোরাবাদী, রাঁচি

সাধনে নিজেকে প্রয়োগ ক'রলেন অনুবাদের ভিতর দিয়ে—যা' তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট ক্ষমতা নিয়েও অনেকে করা অসম্মান ব'লে মনে করেন।

জ্যোতিবাবু অনেক বিষয়েই পথি-প্রদর্শক ছিলেন। Art-এর কথা ছেড়ে দিলেও জাতীয় ব্যবসার দিকেও তিনি একটা নূতন পথ উন্মুক্ত ক'রতে চেয়েছিলেন। বরিশাল-খুলনার প্রথম জাহাজ-পথ তিনিই খোলেন—অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য ক'রে। জাতীয় জীবনের প্রথম প্রাণ-স্পন্দনের পরিচয় যে "হিন্দু মেলায়" পাওয়া গিছ্‌ল—তার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। এই জাতীয়ত্ব-বোধই তাঁর প্রায় সমস্ত কর্ম্মের মূলে ছিল ব'লে মনে হয়। প্রৌঢ় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বঙ্গ-ভঙ্গ-আন্দোলনের সময় নগ্নপদে শোভাযাত্রায় যোগদান আমাদের এখনও মনে আছে।

তাঁর বিনয় ছিল অসাধারণ। তিনি নিজেকে সর্ব্বদাই পিছনে রেখে চ'লতেন। এ বিষয়ে তাঁর এতটুকু অভিমান ছিল না। যার যা' প্রাপ্য তা' তিনি তাকে দিতে কখন কুণ্ঠা বোধ করেন নি। গুণগ্রাহিতা তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল। নিজে নাটককার হ'য়েও গিরিশচন্দ্র-প্রমুখ নাটককারদের লেখা কখনো হাল্‌কা করতে চেষ্টা করেন নি। নিজে চিত্রদক্ষ হ'য়েও অবনীন্দ্রনাথ প্রভৃতির প্রতিভা স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠিত হন্ নি। নিজে সঙ্গীত-স্রষ্টা হ'য়েও অপরের চেষ্টার প্রশংসা ক'রতে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। বাণী এবং কমলার বরপুত্র হ'য়েও নিজেকে ভদ্রতা ও সৌজন্যে মণ্ডিত ক'রে রেখেছিলেন। এইখানেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মহত্ত্ব, এবং এই জন্যই বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁর স্থান অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বাস্তবিক, তাঁর হৃদয় ছিল যেমন উদার, তেমনি স্নেহ-করুণ। কে না জানে, তাঁর ছোটভাই রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর কি গভীর স্নেহ ছিল। কিশোর রবীন্দ্রনাথের উদীয়মান প্রতিভা তাঁরই স্নেহছায়ে, তাঁরই উৎসাহে পরিবর্দ্ধিত না হ'লে আজ হয় ত তা' বিশ্বব্যাপী হ'তে পারত না। এই দুই ভাইয়ের এতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল—যাতে মনেই হত না যে তাঁদের মধ্যে বয়সের তফাৎ প্রায় বার বৎসর। আজ রুগ্নশয্যায় এই শোক সহ্য করবার ক্ষমতা ভগবান রবীন্দ্রনাথকে নিশ্চয় দেবেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন ছিল সন্ন্যাসীর জীবন। মধ্য-যৌবনে বিপত্নীক হ'য়ে তিনি আর দারপরিগ্রহ করেন নি। এই বিপত্নীক, নিঃসন্তান কর্ম্মযোগীর সাধনাও ছিল নিষ্কাম। তিনি দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রমে বঙ্গ-জননীর সেবা ক'রে গেছেন—শুধু সেবার্থেই,—যশের জন্য নয়, —অর্থের জন্য নয়,—এমন কি কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশায়ও নয়। ভগবান তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন।

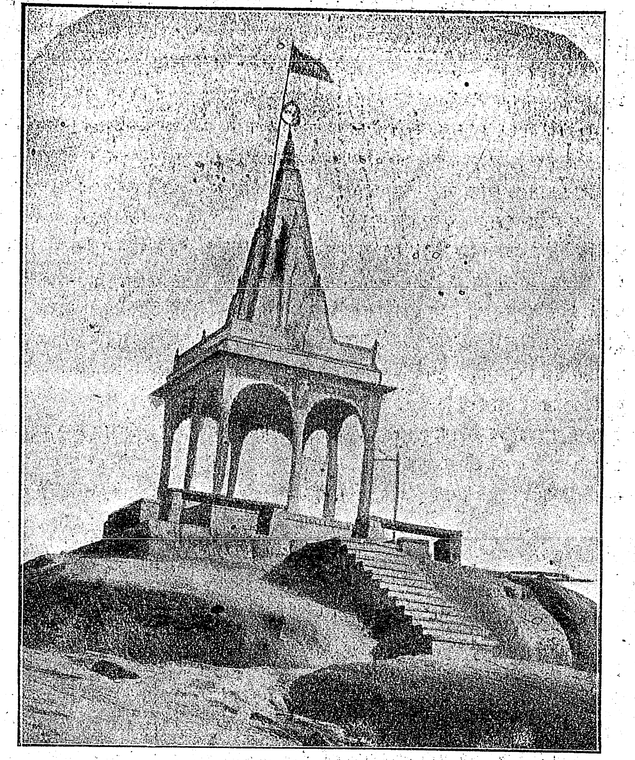

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সাধনা-মন্দির—রাঁচি

লর্ড কার্জ্জন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

নাইক তুমি! হে গুণজ্ঞ, হে মনীষী, পুত্র প্রতিভার—
সৌম্য, তোমার মূর্ত্তিখানি মানস-পটে জাগ্‌ছে বারম্বার।
আমরা তখন ছাত্র ছিলাম, দেখেছিলাম লক্ষ লোকের ভিড়ে
নিন্দা-যশের আঁধার-আলো দিবস-নিশি থাকতো তোমায় ঘিরে।
পড়ছে মনে গড়ের মাঠে, ভিক্টোরিয়ার শ্রাদ্ধ-বাসর-স্মৃতি,
সংকীর্ত্তনের বিরাট মিছিল, শুভ্রবাস আর ভক্তিভরা প্রীতি,
পড়ছে মনে গ্যাসের আইন, পরীক্ষার সে হরেক রকম ভয়,
পড়ছে মনে তোমার কথা, বক্তৃতার সে ভাষা আবেশময়।
বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে গালিগালাজ দিয়েছিলাম জোরে;
আস্ত গোটা কাপড়খানা পুড়িয়েছিলাম আতস-বাজি করে

অন্ধকূপের মন্দ স্মৃতি স্থাপলে, দিলাম ক্রুদ্ধ অভিশাপ,
তোমার হাতে নিইনি সনদ, ক্ষুদ্র লোষও দিইনি তোমার মাপ্
কর্ম্মী তোমায় শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি সঙ্গোপনে আমি,
জানি—তোমার কথার চেয়ে হৃদয়খানা অনেক বেশী দামী।
জানি—তোমার দম্ভ মাঝে, ঊর্দ্ধে তোলার চেষ্টা ছিল নিতি,
বন্ধু তুমি সত্য ছিলে, ভৎ সনা যে ভালবাসার রীতি।
বসুন্ধরায় বাসতে ভাল, ভ্রমণ করার এমন বাতিক কার ?
মরু থেকে মেরুর সীমা, পেরু থেকে মহাচীনের ধার।
পূর্ণ ছিল বক্ষ তোমার অনিবার্য্য বৃটিশ অহঙ্কারে,
গর্ব্ব করার জিনিস ছিলে—তাই ত বুটন কাঁদছে শত ধারে।
আকাশচুম্বী সুদূর-বিথী ছিল তোমার ব্যক্তিত্ব মহান,
লাগতো গোটা জাতির বুকে তোমার বুকের চুম্বকেরি টান।
ভাষায় ছিল উন্মাদনা, জ্ঞানের ছিল সাগর-গভীরতা,
ইংলণ্ডের সে আলোক-গৃহ—কোথায় তুমি,আজকে তুমি,কোথা।
তোমার মত স্মৃতির আদর, পূজ্যপূজা, করতে কজন জানে,
ভাঙ্গার প্রতি এমন প্রীতি, এমন দরদ উথলে কার প্রাণে ?
নষ্ট কীর্ত্তি উদ্ধারিতে প্রাণপণ এমন প্রয়াস ছিল কার ?
এমন কঠোর মিত্র পেলে ভারতবাসী গর্ব্ব করে তার।
স্মৃতিকে বিস্মৃতি হতে রক্ষা করাই কাজ যে ছিল তব,
বাদ পড়েনি কবির ভিটা, সাধুর আসন,অধিক কি আর কব।
ভগ্ন দেউল করলে খাড়া দীন ঘরে চেরাগ দিলে তুমি ;
বর্ব্বরতার হস্ত হতে উদ্ধারিলে পবিত্রতার ভূমি।
তুমি এখন থাকলে হেতায় জীবন ভরে মিটতো আবার সখ,
খাঁটী জিনিস দেখতে পেতে, ছিলে তুমি খাঁটীর উপাসক।
দেখতে পেতে বিরাট পুরুষ খৃষ্ট নূতন গান্ধী মহাত্মায়,
মুগ্ধ হতে সর্ব্বত্যাগী বিত্তহারা 'চিত্ত' মহিমায়।
থাকলে তুমি 'জালিয়া, বাগ' ঘটতো কি না সন্দেহ হয় মোর,
অত্যাচারী সৈন্য তরে রোধ করিলে দরবারেরি দোর।
ভারতবাসীর জাগরণে সত্য তুমি হতে আনন্দিত,
তুমি ছিলে কোবিদ কবি, ছিলে মহা মনস্তত্ত্ববিদ।
রূপ-পূজারি, স্মৃতির কাঙ্গাল, ভিক্টোরিয়া সৌধ তোমায় দান ;
তুমি চকোর দিন করেছ ইদের চাঁদের প্রেম-পিয়ালা পান।
দূর অতীতের পাগল মধুপ, কোন্ অমরায় আজকে গেলে উড়ি,
লক্ষ বুকের পারিজাতে তোমার স্মৃতি রাখবে অমর করি।

তর্পণ

(লাইকা ও তরুতীর্থের লেখিকা ৺ হেমনলিনী দেবীর সাম্বৎসরিক দিনে)

শ্রীনিরুপমা দেবী

আজি ধরা ত্যজিতেছে পুরাতন বৎসর-নির্ম্মোক
তোমার তর্পণ তরে আজি মোরা ত্যজি মোহ শোক !
জীর্ণ দেহ উপহার তুলে দিয়ে বসন্তের করে
নব দেহ লভিয়াছ গত মধু-মাধবের বরে।
ত্যজি মহা শোক-ছিন্ন শীর্ণ দেহ হ'য়ে লব্ধকাম
প্রিয় পুত্র ভ্রাতা ভগ্নী সাথে আজি লভিছ বিশ্রাম।
হে প্রেমিক, হে পাগল, হে সাধক, হে অখ্যাত কবি,
ওগো অনুরাগী যোগী, ধরণীর রূপ রস স'বি
প্রাণ-পাত্রে পূর্ণ করি ঊর্দ্ধে ধরি করেছ আরতি
যাঁহার উদ্দেশে সদা প্রিয় মাঝে যাঁহার মূরতি
হেরিতে চেয়েছ, আজি সেই প্রিয় প্রিয়তমে তব
লভিতে পেরেছ কিগো নবেন্দ্রিয়ে অনুভব নব ?
এ মহা ঘূর্ণার মাঝে যেই নীড়ে বাঁধিলে আশ্রয়
সেই "প্রেম সুন্দরের" পেলে কোন নব পরিচয় ?
আজি বাৎসরিকে তব তোমারি প্রার্থিত এ তর্পণ
বহু স্মৃতি-গীতি-সিক্ত করি তোমা করি সমর্পণ !
যাদের সংযোগ ছিল তব নব যোগের সহায়
ধরণীর বক্ষ হ'তে তুলি আজ নিবেদি তোমায় !
লও এ চাঁদের হাসি, এ আলোক, এ ছায়ার খেলা,
চারু চম্পকের গন্ধ, বেল যুঁই মল্লিকার মেলা !
'ললিত' ঝঙ্কার মাঝে লহ প্রভাতের নব হাসি,
সাঁঝের আকাশ-তলে শোন এই পুরবী উদাসী !
নাও গান, গীতি-প্রাণ, সুর-শুদ্ধ সঙ্গীতের বশ !
সাহিত্য-রসের হংস, কাব্যামোদী, পিও তার রস।
আনন্দের উপাসক প্রীতিবান্ হে সুহৃদ্-প্রিয়,
আরো যা বেসেছ ভাল মর্ত্ত হ'তে তুলে আজ নিও।

সাময়িকী

এই মাসের 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদ-পটে যাঁহার প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল, তাঁহার নাম ও পরিচয় বাঙ্গালা দেশে কাহারও অজ্ঞাত নহে,—তিনি ঋষিকল্প, স্বধর্ম্মানুরাগী, মহানুভব, সাহিত্য-রথী ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। বাঙ্গালা দেশের সৌভাগ্য, বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, তাঁহার ন্যায় মনস্বী, তেজস্বী মহাত্মা এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দেবোপম প্রতিকৃতি দ্বারা প্রচ্ছদ-পট অলঙ্কৃত করিয়া 'ভারতবর্ষ' ধন্য হইল।

এবারকার 'সাময়িকী'র প্রথম কথা বাঙ্গালা দেশের মন্ত্রী-সমস্যা। এ সমস্যা মিটিয়া গিয়াছে, অন্ততঃ এক বৎসরের জন্য মন্ত্রীদিগের অন্তর্ধান হইয়াছে, এ কথা নিশ্চিত। পাঠক-পাঠিকাগণ সংবাদ পত্রে পড়িয়াছেন যে, বাঙ্গালার গবর্ণর বাহাদুর ফেব্রুয়ারী মাসের গোড়ায় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যদিগের নিকট পত্র প্রচার করেন যে, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশন হইবে, এবং সেই অধিবেশনে সদস্যগণকে অভিমত প্রকাশ করিতে হইবে, তাঁহারা বর্ত্তমান বৎসরের জন্য মন্ত্রী চান কি না। এই কথা জানিতে পারিলে বজেটে মন্ত্রীদিগের বেতনের বরাদ্দ করা যাইবে। তদনুসারে ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অধিকাংশ সদস্যের মতে মন্ত্রী নিয়োগই স্থির হয় ; অবশ্য স্বরাজী দল তখনও এ নিয়োগের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। যখন মন্ত্রী নিয়োগ স্থির হইল, তখন বজেটে তাঁহাদের বেতনেরও বরাদ্দ হইল ; এবং গবর্ণর বাহাদুর তখন শ্রীযুক্ত নবাব নবাব আলী চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাজা মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, এই দুই জনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন।

তখনই কিন্তু অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন যে, বজেট বিতর্ক সময়ে যখন মন্ত্রীদিগের বেতনের কথা উঠিবে, তখন হয় ত একটা গোলমাল হইতে পারে ; গবর্ণমেণ্টের মনোনীত মন্ত্রী দ্বয় ধোপে টিকিবেন কি না, এ কথা লইয়া তখন হইতেই জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৫ দিন মন্ত্রীত্ব করিবার পর ব্যবস্থাপক সভায় যখন তাঁহাদের বেতন মঞ্জুরীর কথা উঠিল, তখন মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বরাজী দল ত পূর্ব্বাপরই মন্ত্রী-নিয়োগের বিরুদ্ধে ছিলেন, এবার অন্যান্য দলের অনেকেও স্বরাজী দলের সহিত যোগ দিলেন ; যাঁহারা ১৭ই ফেব্রুয়ারী মন্ত্রী-নিয়োগ প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও কয়েকজন স্বরাজ-পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করা হইবে না। তাঁহাদেরই জয় হইল। বেতন যখন মঞ্জুর হইল না, তখন ১৫ দিন অবৈতনিক মন্ত্রীত্ব করিয়া মন্ত্রীদ্বয় পদত্যাগ করিলেন ; গবর্ণর বাহাদুরও 'হস্তান্তরিত' বিভাগ পুনরায় 'হস্তগত' করিলেন ; এক বৎসরের জন্য 'ডু-ইয়ার্কি'র অবসান হইল। ততঃ কিম্ ?

এখন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'ততঃ কিম্ ?—তাহার পর কি হইবে ? মন্ত্রীরা গেলেন, গবর্ণমেণ্ট সমস্ত বিভাগের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, ব্যবস্থাপক-সভা যদিও ডিস্‌মিস্ হয় নাই, কিন্তু না থাকিবারই সামিল ; কারণ, হস্তান্তরিত বিভাগগুলির কার্য্য-পরিচালনের ভারই তাঁহাদের হস্তে ছিল। তাহাই যখন থাকিল না, গবর্ণমেণ্টই যখন সকল কাজ, সকল ব্যবস্থা করিবেন, তখন ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজনাভাব। চারি বৎসর পূর্ব্বে যে ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইত, বিগত বৎসরের শেষ কয়েক মাস যে ভাবে কার্য্য পরিচালিত হইয়াছে, এখন তাহাই হইবে। এখন, যাঁহারা এই দ্বৈত-শাসন অচল করিয়া দিলেন, তাঁহারা কি করিবেন ? সে সম্বন্ধে ত কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাইতেছে না। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, দেশের নেতৃবৃন্দ পল্লী-সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রভৃতি হিতকর কার্য্যে তাঁহাদের শক্তি নিয়োগ করিবেন এবং তাহার জন্য চাঁদাও সংগৃহীত হইতেছিল। তাহার পর এত দিনের মধ্যে নেতৃগণ ত তাঁহাদের বর্ণিত কার্য্যে অবতীর্ণ হইলেন না ; এমন কি, তাহার একটা খসড়াও জন-সাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন না। তাঁহারা বক্তৃতার মুখে যে সমস্ত সংস্কারের কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে প্রভূত অর্থবল ও একনিষ্ঠ জনবল থাকার প্রয়োজন। তাহার ত কোন আয়োজন দেখিতেছি না।

কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সদস্য-নির্ব্বাচন তিন বৎসর অন্তর হইয়া থাকে ; কিন্তু আইন-অনুসারে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন প্রতি বৎসরেই হওয়ার বিধান আছে। তদনুসারে সে দিন বর্ত্তমান বর্ষের মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন সে দিনকার মিউনিসিপাল সভায় হইয়া গিয়াছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় এ বৎসরের জন্যও মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন এবং বিগত বৎসরের ডেপুটী মেয়র মিঃ সুরওয়ার্দ্দী মহোদয় এবারও ডেপুটী মেয়র থাকিলেন। কলিকাতার করদাতাগণ এই নির্ব্বাচনে আনন্দিত হইবেন ; কারণ দেশবন্ধু ও সুরওয়ার্দ্দী সাহেব বিগত বৎসর যে ভাবে কার্য্য-পরিচালন করিয়াছেন, তাহাতে সকলেই একবাক্যে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছেন।

এবার দিল্লীর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটী অতি সুন্দর প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। সকলেই জানেন যে, মুসলমান ধর্ম্মের বিধান এই যে, কেহ সুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, সুদ গ্রহণ করায়ও। এই কারণে, উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় একজন মুসলমান সদস্য প্রস্তাব করিয়াছেন যে, অনেক মুসলমান গবর্ণমেণ্টের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে অল্প-বিস্তর টাকা জমা রাখেন; কোম্পানীর কাগজও কাহারও কাহারও আছে। কিন্তু ধর্ম্মের বিধান অনুসারে তাঁহারা সুদ গ্রহণ করিতে পারেন না। মুসলমান সদস্য মহোদয় প্রস্তাব করিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্ট যখন সুদ দেওয়ার নিয়ম আছে, তখন সে নিয়মের অন্যথাচরণ হইতে পারে না; মুসলমানগণের প্রাপ্য সুদ বৎসরান্তে হিসাব করিয়া যাহা হইবে, তাহা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করা ঠিক। সকলেই এ প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে বলা হইয়াছে যে, এ বিষয়ে দেশের মুসলমানগণের সমবেত মত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাহারই জন্য এ প্রস্তাব বিগত অধিবেশনে মুলতবী আছে। আমাদের বিশ্বাস, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণ কেহই এ প্রস্তাবের বিরোধী হইতে পারেন না; এবং এই প্রস্তাব গৃহীত হইলে আলিগড় মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ের একটী পথ উন্মুক্ত হইবে।

এবারকার বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিশেষ সংবাদ আমরা পত্রস্থ করিতে পারিতেছি না, কারণ ২৭শে ও ২৮শে চৈত্র সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের দিন, তৎপূর্ব্বেই আমাদের কাগজ ছাপা শেষ হইবে। তবে, বিভিন্ন বিভাগের সভাপতিগণ সম্বন্ধে একটু রদ-বদল হইয়াছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি, পূর্ব্বে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে, ইতিহাস বিভাগের সভাপতি হইবেন, দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়। এক্ষণে স্থির হইয়াছে যে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিভাগের সভাপতি হইবেন। দর্শন বিভাগেও সভাপতি বদল হইয়াছে; পূর্ব্ব-নির্ব্বাচিত সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় তাঁহার পরিবর্ত্তে বোলপুর বিশ্বভারতীর সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় দর্শন শাখার সভাপতি হইয়াছেন। মূল সভাপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথই স্থির আছেন; সাহিত্য-বিভাগের সভাপতি ও সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত শরৎ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই আছেন এবং বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয়ই আছেন। মুন্সীগঞ্জের অনতিদূরস্থ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপালে একটী পুরাতন পুষ্করিণী খনিত হইতেছে। সাহিত্যিকগণ নিশ্চয়ই রামপালে যাইয়া খনন কার্য্য দেখিয়া আসিবেন। শুনিলাম, খনন কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই, কেবল একটা ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাটের অংশ বাহির হইয়াছে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এই খনন কার্য্য হইতেছে।

সাহিত্য-সংবাদ

ডাঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ কৃত মার্চ্চেণ্ট অব ভিনিসের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৲।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী প্রণীত দানের মর্য্যাদা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল; মূল্য—২৲।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত নূতন উপন্যাস সত্যবালা প্রকাশিত হইল; মূল্য—১৷৷০।

প্রোফেসার জে চৌধুরী প্রণীত কান্তলালের কলিকাতা দর্শন প্রকাশিত হইল; মূল্য ১৲।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ গুপ্ত প্রণীত বেড়াল-ঠাকুরঝি প্রকাশিত হইয়াছে; মূল্য—১৷০।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত স্বপ্নময়ী প্রকাশিত হইল; মূল্য—৸৶০।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মোগল বিদুষী'র পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—দশ আনা মাত্র।

Publisher—Sudhanshusekhar Chatterjea.
of Messrs. Gurudas Chatterjea & Sons,
201, Cornwallis Street, CALCUTTA.

Printer—Narendranath Kunar,
The Bharatvarsha Printing Works,
203-1-1, Cornwallis Street. CALCUTTA.



পূর্ণিমা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর মিত্র

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

COLOURED ILLUSTRATION